সেবা প্রকাশনী

কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ৪০

রকিব হাসান
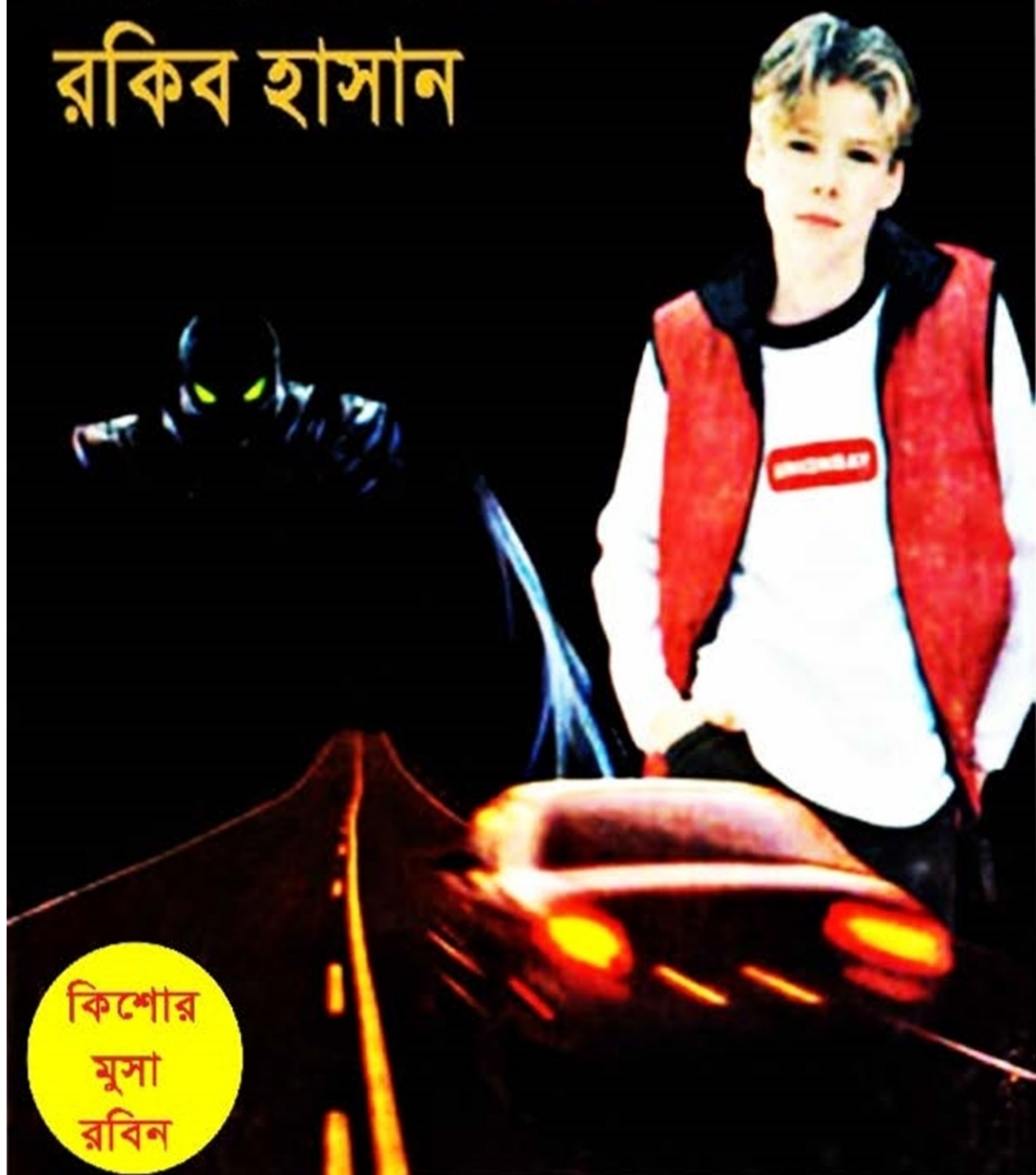
কিশোর
মুসা
রবিন

ভলিউম ৪০

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
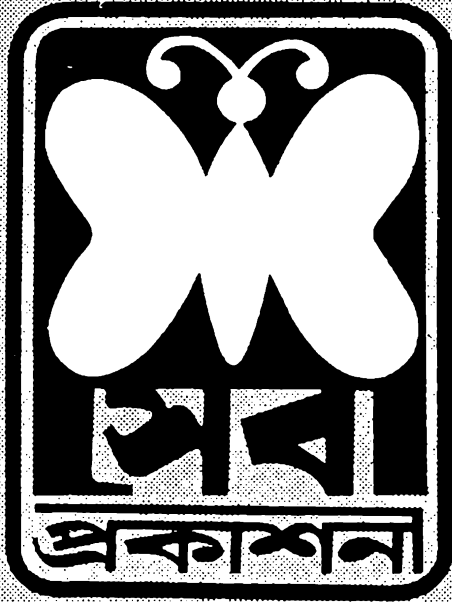
চুয়াল্লিশ টাকা

ISBN 984-16-1426-X

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ২০০০

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
মোবাইল ০১১-৯০-৪৯০০৩০
জি পি. ও বক্স ৮৫০
E-mail. sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রূম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল. ০১৭১৮-১৯০২০৩

Volume-40
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১	(তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)	৫৭/-
তি. গো. ভ. ১/২	(ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো)	৫৭/-
তি. গো. ভ. ২/১	(প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ২/২	(জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৩/১	(হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩/২	(কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৪/১	(ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪/২	(ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৫	(ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ৬	(মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৭	(পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ৮	(আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ)	৫০/-
তি. গো. ভ. ৯	(পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১০	(বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১১	(অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১২	(প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ১৩	(ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৪	(পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	৫৫/-
তি. গো. ভ. ১৭	(ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৫০/-
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ২১	(ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	৫০/-
তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ২৭	(ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মুলা)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৩৯/-

তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৫৪/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৫	(নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৬	(টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৩৯	(বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪২	(এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৫১	(পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫২	(উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৩	(মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৪	(গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৫	(রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫৬	(হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেট্রনিক আতঙ্ক)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৭	(ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৫৮	(মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৫৯	(চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬০	(ভুটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, ভুটকি শত্রু)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬১	(চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬২	(যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬৩	(ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৬৪	(মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৬৫	(বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৬	(পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৭	(ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৮	(টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+ভুটকি গোয়েন্দা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৯	(পাগলের গুপ্তধন+দুখী মানুষ+মমির আর্তনাদ)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৭০	(পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৭১	(পিশাচবাহিনী+রত্নের সন্ধানে+পিশাচের থাবা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৭২	(ভিনদেশী রাজকুমার+সাপের বাসা+রবিনের ডায়েরি)	৪১/-

অভিশপ্ত লকেট

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

গ্রীনহিলস। বড়দিনের ছুটি।

বিছানায় শুয়ে আছে মুসা। অস্থির ভঙ্গিতে পাশে রাখা বালিশের ওপর ফেলছে ডান হাতটা, আবার তুলছে, আবার ফেলছে। এ ভাবে পড়ে থাকতে ভাল লাগছে না ওর। ছটফট করছে।

পাশের বিছানায় শুয়ে আছে ওর খালাত বোন ফারিহা। তারও একই অবস্থা। সেও ছটফট করছে, গড়াগড়ি করছে বিছানায়।

ফারিহার বাবা-মা জরুরী কাজে ইউরোপ গেছেন। এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে পারেন না, ঘুরে বেড়াতে হয় অনেক জায়গায়। তাতে মেয়ের পড়ালেখার ক্ষতি হয়। ওর থাকার জন্যে একটা স্থায়ী বাসস্থান দরকার। তাই মুসাদের বাড়িতে রেখে গেছেন। গ্রীনহিলসের স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়েছে ওকে।

মুসা আর ফারিহা, দুজনেরই সর্দি লেগেছে খুব। তাই ঘর থেকে বেরোনো একেবারে মানা। কঠোর আইন জারি করে দিয়েছেন মুসার আম্মা মিসেস আমান, যতক্ষণ না অসুখ পুরোপুরি ভাল হয়, বাগানে বেরোনোও নিষেধ।

'রবিন আর কিশোর আজ এখনও আসছে না কেন?' ঘড়ির দিকে তাকাল ফারিহা। এই নিয়ে অন্তত পঞ্চাশ বার হয়ে গেল তাকানো।

'আসবে কি!' খসখসে গলায় বলল মুসা, 'যে হারে তুষার পড়ছে, ঘর থেকে বেরোনোই মুশকিল।'

'আর কি কপাল দেখো, এ সময় বিছানায় পড়ে আছি আমরা! বাইরে বেরোলে এই তুষারের মধ্যে কি মজাটাই না করতে পারতাম!'

মুসা আর ফারিহা অসুস্থ হয়ে পড়ায় অন্য দুই গোয়েন্দাও বিপদে পড়ে গেছে। দুজনকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে কোথাও যেতে মন চায় না। তাই সকাল হলেই চলে আসে মুসাদের বাড়িতে, সারাদিন আড্ডা মারে, গল্পগুজব করে, দিনটা কাটিয়ে রাতে ফিরে যায় যার যার বাড়ি।

বাইরে কুকুরের ডাক শোনা গেল।

লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল ফারিহা। 'ওই যে, এসে গেছে!'

ঘরে ঢুকল টিটু, কিশোর আর রবিন।

ফারিহার দিকে তাকাল রবিন, 'কেমন আছ?'

'ভাল না,' জবাব দিল ফারিহা। হাত বাড়াল কিশোরের কুকুরটার দিকে, 'আয়, টিটু। তুই পাশে থাকলে অনেকটা ভাল লাগে।'

'খেঁক, খেঁক,' করে বার দুই হাঁক ছাড়ল টিটু। মোচড় দিয়ে কিশোরের কোল থেকে নেমে গিয়ে লাফিয়ে উঠল ফারিহার বিছানায়।

কম্বলের নিচে ওকে টেনে নিল ফারিহা।

জোরে জোরে কয়েকবার হাঁচচো হাঁচচো করল মুসা। 'রোগে তো মারবে না, মারবে আসলে বিছানায়। মাকে কিছুতেই বোঝানো যায় না। এ ভাবে শুয়ে থাকলে ভাল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। মরতে লাগবে বড়জোর তিনদিন। আর মরে ভূত হতে দিন সাতেক।'

'ভূত বলে কিছু নেই,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। 'সুতরাং ওই দুর্ভাবনা বাদ।'

'আছে,' মুসা বলল।

'নেই!'

'আমি বললাম আছে!'

'নেই!'

'আছে!' ঝটকা দিয়ে বিছানায় উঠে বসল মুসা। 'আমি নিজে ভূতের খপ্পরে পড়েছিলাম।'

'তুমি তো কতবারই পড়লে। তারপর ভূত খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় অন্য কিছু। ভূত জিনিসটা চোখের ভুল।'

'সব সময় বোধহয় তা নয়,' মুসার বিছানার পাশে বসল রবিন। 'কারণ ভূতের খপ্পরে আমিও পড়েছি।'

'দেখো,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল কিশোর, 'ভূত বলে কোন কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, এমন কিছু ঘটনা ঘটে পৃথিবীতে যার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। সেগুলো অমীমাংসিত রহস্য হিসাবে থেকে যায়।'

'তর্ক করাটা তোমার স্বভাব!' রেগে গেল মুসা। 'আমি বলছি আমি নিজে পড়েছি ভূতের খপ্পরে। বিশ্বাস না হলে ফারিহাকে জিজ্ঞেস করে দেখো।'

টিটুকে আদর করতে করতে ফারিহা বলল, 'মুসা ঠিকই বলেছে। আমিও তার সঙ্গে ছিলাম। সত্যিই ভূতের পাল্লায় পড়েছিলাম আমরা।'

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল কিশোর, 'আসলেই ভূত, না অন্য কিছু?'

'আসলেই ভূত।'

'কি করে বুঝলে?'

'বোঝাবুঝির আবার কি আছে? নিজের চোখে দেখেছি। আমাকে তো মেরেই ফেলেছিল আরেকটু হলে।' হাত বের করে দেখাল ফারিহা, 'দেখো, ভাবতেই গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেছে!'

কৌতূহল হলো কিশোরের। 'কোথায় দেখেছ ভূতটাকে?'

'জায়গা চিনে লাভ?' মুসা বলল, 'সূত্র খুঁজে রহস্য সমাধানের চেষ্টা করতে চাও? ভূত নয় প্রমাণ করবে? লাভ হবে না। ওটা আসলেই ভূত ছিল। কোচ রনসনের মত লোকও বিশ্বাস না করে পারেনি।'

অবিশ্বাসীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর, 'যত যা-ই বলো, আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবে না।'

রবিন বলল, 'কিশোর, ভূতে বিশ্বাস আমিও করি না। কিন্তু একবার এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল, যেটার কোন ব্যাখ্যা আজও খুঁজে পাই না আমি।'

'কোথায় ঘটেছিল?'

'ইনডিয়ানদের গোরস্থানে। ভয়ঙ্কর এক কবরখানার মধ্যে। একটা বিশাল গুহায় ছিল সেনেকা ইনডিয়ানদের কবর। আজও আছে…'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' হাত তুলল কিশোর, 'এ ভাবে নয়। গোড়া থেকে শুরু করো…'

'মুসারটা আগে শুনি,' বলল রবিন। 'ভূতের কথা সে-ই প্রথম তুলল যখন…কি বলো?'

মাথা কাত করল কিশোর, 'আমার আপত্তি নেই। আগে আর পরে, শুনলেই হলো।' মুসার দিকে ফিরে বলল, 'বলে ফেলো তোমার পিশাচ কাহিনী। শুনে আজ অন্তত একটা ভুল ভাঙুক আমার, যে ভূত সত্যি আছে পৃথিবীতে!'

দুই

ঘটনাটা ঘটেছিল মিডলেকে—মুসা বলল। নতুন গেছি আমরা ওখানে। বাবা-মা দুজনেই চাকরি নিয়েছে। থাকার জন্যে বাড়ি পাওয়া মুশকিল। অনেক কষ্টে যে বাড়িটা জোগাড় করল বাবা, ওটা অতিরিক্ত পুরানো। প্রচুর মেরামত দরকার। লোক দিয়ে করানো যায়, কিন্তু খরচ বেশি বলে বাবা-মা ঠিক করল মেরামতটা নিজেরাই সেরে নেবে। চাকরি করে সময় পাওয়া যায় না, তাই রাতে আর সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কাজটা সারতে হবে। আমি কিছু কিছু সাহায্য করতে চাইলাম, এই যেমন দেয়ালগুলোতে রঙ করা, মাটি দিয়ে মেঝের গর্ত ভরাট করা, এ সব। কিন্তু নষ্ট করে ফেলতে পারি এই ভয়ে একা আমাকে করতে দিল না মা। বলল, যা করার ওদের সামনে করতে হবে।

ঘরের অভাবে একটা বেডরুমে দুটো খাট পাশাপাশি পাতা হলো, আমার আর ফারিহার থাকার জন্যে। মা বলল, যতদিন আরেকটা বেডরুম মেরামত না হয়, ততদিন আলাদা ঘর পাব না আমরা।

বাড়িটা আমার খারাপ লাগেনি। শান্ত জায়গা। বড় শহরের হই-চই নেই। পেছনে কিছুটা দূরে ছোটখাট একটা পাইন বন। তাতে প্রচুর পাখি। কেউ শিস দেয়, কেউ সুরেলা গলায় গান গায়। ঝোপের ভেতর চলেফিরে বেড়ায় নানা জাতের বুনো জানোয়ার। প্রথম যেদিন বাড়িটাতে উঠলাম, বাবার ধারণা হলো, ওই বনে র‍্যাকুন তো আছেই, দু'একটা হরিণেরও সাক্ষাৎ মিলতে পারে।

একটা সুইমিং পুলও ছিল বাড়ির পেছনে। কিন্তু শুরুতে ওতে নামতে পারিনি। আগের বাসিন্দারা এমন অবস্থা করে রেখে গেছে যে নামার কোন উপায় ছিল না। পরিষ্কার করে সারিয়ে-সুরিয়ে নিতে অনেক সময় দরকার, কয়েক মাসের আগে সেটা সম্ভব নয়। সাঁতার তখন আমার কাছে নেশার মত হয়ে গেছে। এর আগে যে শহরে ছিলাম, সেখানে একটা টীমে দারুণ নাম করেছিলাম। মিডলেকেও টীম আছে, তাতে যোগদানেরও ইচ্ছে, কিন্তু পুল ছাড়া প্র্যাকটিস করব কোথায়, ভেবে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

সমস্যাটার সমাধান করে দিল ফারিহা। আমরা মিডলেকে যাওয়ার পাঁচ দিনের দিন বনের ভেতর একটা পুরানো পুকুর আবিষ্কার করল সে। বাবা-মা অফিসে চলে গেলে খুশিমনে বনের ভেতর বেড়াতে গিয়েছিলাম দুজনে। বুনো জাম ছিঁড়ে খেতে খেতে আমার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল ফারিহা, হঠাৎ চিৎকার করে ডাকতে লাগল। আমি ভাবলাম কোন জন্তু-জানোয়ার দেখেছে। দৌড়ে গিয়ে পুকুরটা দেখে তো হতবাক। এমন জায়গায় এমন একটা পুকুর পাওয়া যাবে কল্পনাই করিনি। খুব খুশি হলাম। বাড়ি গিয়ে সাঁতারের পোশাক পরে এসে তখুনি ঝাঁপিয়ে পড়লাম পানিতে। ফারিহাও নামল আমার সঙ্গে। অঘটনটা ঘটে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

পানিতে দাপাচ্ছি আমরা। এক সময় আমার সামনে থেকে ডুব দিল ফারিহা। মাটি কতটা নিচে দেখার জন্যে সোজা নিচে নেমে গেল সে। আমিও ডুব দিলাম ওর খানিক পরে।

ভাগ্যিস দিয়েছিলাম! নইলে সেদিনই মারা পড়ত ও। তলায় নেমে দেখি পুকুরের নিচে জন্মে থাকা জলজ লতায় জড়িয়ে গেছে। ছাড়ানোর জন্যে ছটফট করছে, পারছে না। জীবন্ত প্রাণীর মত লতাগুলো জড়িয়ে ধরে রেখেছে ওকে। যতই টানছে, হাতে, পায়ে, কোমরে, আরও শক্ত হয়ে আটকে যাচ্ছে। গগলসের ওপাশে বড় বড় হয়ে গেছে ওর চোখ, তাতে আতঙ্ক। ঠোঁটের ফাঁক থেকে বাতাস বেরিয়ে বুদ্বুদ হয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে ফুসফুসের বাতাস। বুঝতে পারলাম, জলদি ওকে ওপরে নিয়ে যেতে না পারলে দম আটকে মারা যাবে ও।

লতা ছেঁড়ার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। এত শক্ত আর পিচ্ছিল, পিছলে গেল হাত। আরও নিচে লতার সাদা সাদা গোড়াগুলো দেখা যাচ্ছে। নেমে গিয়ে দুহাতে মুঠো করে ধরে, কাদায় পা ঠেকিয়ে গায়ের জোরে দিলাম টান।

শেকড় ছিঁড়ে উপড়ে এল গোড়া। কাদা উঠে ঘোলা হয়ে গেল পানি। কোনদিকে তাকালাম না আর। ফারিহাকে জাপটে ধরে প্রাণপণে ওপরে উঠতে শুরু করলাম। মাথা তুলেই কাশতে লাগল ও। শক্ত করে ধরে রাখলাম যাতে ডুবে না যায়। কান্নার মত স্বর বেরোল ওর গলা দিয়ে। তীরের দিকে ঠেলে নিয়ে সাঁতরাতে লাগলাম। তুলে আনলাম পানি থেকে।

তীরে বসে কাঁদতে লাগল ও। কেমন বিমূঢ় হয়ে গেছে। যেন বুঝতে পারছে না কোথায় আছে। ওর হাতে-পায়ে জড়ানো ছেঁড়া লতাগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, যে ভাবে পেঁচিয়েছে না কেটে খোলা যাবে না। ওঠার জন্যে ওর হাত ধরে টানলাম। আশ্চর্য! নাড়া লাগতে আপনাআপনি খুলে পড়তে লাগল লতাগুলো। বাহুতে লাল লাল দাগ পড়ে গেছে, কতটা শক্ত হয়ে পেঁচিয়েছিল বোঝা যায়। এত তাড়াতাড়ি ঢিল হয়ে গেল কিভাবে? লতার গায়ের সবুজ পিচ্ছিল পদার্থ লেগে আছে জায়গাগুলোতে।

রোদের মধ্যেও কেঁপে উঠল ও, যেন প্রচণ্ড শীতে। একটা তোয়ালে ফেলে দিলাম ওর কাঁধে। ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিতে বললাম।

আস্তে করে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলাম। ভয় পাচ্ছি, আবার না কেঁদে ওঠে। কান্নাটা অদ্ভুত। ফারিহা সাধারণত ওরকম করে না, ছিঁচকাঁদুনে স্বভাব নয় ওর।

আমার হাত কাঁপছে, দেখতে দিলাম না ওকে। জিজ্ঞেস করলাম, 'বাড়ি যাবে?'

আমার দিকে তাকাল ও। চোখে বিচিত্র দৃষ্টি। তাকিয়ে থাকতে পারলাম না আমি, চোখ সরিয়ে নিলাম। খসখসে গলায় জানতে চাইল, 'কাল কি আবার আসব সাঁতার কাটতে?'

'আসব। তবে লতার কাছে আর যাওয়া চলবে না।'

'আরও যাই! মাথা খারাপ!'

'গেলে মরবে।'

'যাব না।'

'ঠিক আছে।'

তোয়ালেটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। হাঁটতে শুরু করলাম পুকুর পাড়ের রাস্তা ধরে। কাঁচা রাস্তাটা চলে গেছে বনের ভেতর দিয়ে। আমাদের বাড়ির পাশ কেটে চলে গেছে সোজা। সেটা থেকে আরেকটা সরু রাস্তা বেরিয়ে গিয়ে ঢুকেছে আমাদের পেছনের আঙিনায়।

আমার পেছন পেছন আসতে লাগল ফারিহা। হঠাৎ অস্ফুট একটা শব্দ করে উঠল। ফিরে তাকিয়ে দেখি গাছের শেকড়ের মধ্যে কি যেন খুঁজছে ও। হাতের তালুতে নিয়ে দেখতে লাগল জিনিসটা। কাদা লেগে আছে।

'কি ওটা?' জিজ্ঞেস করলাম।

তোয়ালের কোনা দিয়ে মুছতে মুছতে ফারিহা জবাব দিল, 'গুপ্তধন।'

'দেখি?'

বাড়িয়ে দিল ফারিহা।

একটা নেকলেস। কাদা আর পিচ্ছিল সবুজ পদার্থ মাখামাখি হয়ে থাকায় বোঝা মুশকিল কি ধাতু দিয়ে তৈরি। মনে হলো, রূপার জিনিস। পানিতে ডুবে থেকে চেনটা কালচে-সবুজ হয়ে গেছে। গোল একটা লকেট ঝুলছে মাঝখান থেকে। গায়ে কিছু খোদাই করা আছে। কিন্তু নকশা না লেখা, কাদার জন্যে বোঝা গেল না।

জানতে চাইলাম, 'পেলে কোথায়?'

'পুকুরে। পানির নিচে, শ্যাওলার মধ্যে।'

'ও, এটা তুলতে গিয়েই লতায় আটকেছিলে। গাধা কোথাকার! ওরকম ঝুঁকি কেউ নেয়? আরেকটু হলেই তো মরতে আজ।'

'আরও কতবারই তো কত পুকুরে সাঁতার কেটেছি। লতা যে ওরকম করে জড়িয়ে ধরে, জানতাম নাকি?'

'জড়িয়ে ধরে মানে?'

'তাই তো। লকেটটা দেখে নিচু হয়ে তুলে নিলাম। চারপাশ থেকে জ্যান্ত প্রাণীর মত লতাগুলো এগিয়ে এসে প্রথমে হাত পেঁচিয়ে ধরল আমার। তারপর পা আর কোমর। কত টানাটানি করলাম, একটুও ঢিল করতে পারলাম না। উফ্, কি ভয় যে পেয়েছি না!'

'সে তো দেখেইছি।' পানির নিচে ওর আটকা পড়ার দৃশ্যটা মনে করে গায়ে কাঁটা দিল আমার। বকা দিলাম, 'খবরদার, পানির নিচে ওরকম বোকামি করতে

যাবে না আর।'

'সত্যি বলছি, বোকামি করিনি। লতাগুলো এসে পেঁচিয়ে না ধরলে…'

ধমক দিয়ে বললাম, 'লতা কখনও নিজে এগিয়ে আসে না। জটলার মধ্যে নামলে তো শরীরে পেঁচাবেই। শোনো, এ কথা মাকে বোলো না। তাহলে আর যেতে দেবে না ওই পুকুরে। সাঁতার কাটার এখানেই ইতি। সারাটা গরমকাল আর পানিতে নামা চলবে না।'

'জানি। বলব না।'

আবার এগোলাম বাড়ির দিকে। পথের দুধারে পাইন গাছ আর ঝোপঝাড়। ডালপাতার ফাঁক দিয়ে আমাদের বাড়িটার সামান্যই চোখে পড়ে। চলতে চলতে হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে নিতে লাগলাম বুনোজাম।

পেছনের আঙিনা দিয়ে বাড়িতে না ঢুকে ঘুরে গ্যারেজের কাছে চলে গেলাম। সামনের ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে। বয়েস আমার সমানই হবে। রোগা শরীর। লম্বা, কোঁকড়া, বাদামী চুল পনিটেল করে বাঁধা। লাল একটা সাইকেলে বসে আছে। অন্য মেয়েদের সঙ্গে দুদিন ওকে আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে দেখেছি।

'হাই,' আমাদের দেখে হাত তুলল ও।

'হাই,' জবাব দিলাম।

ফারিহা কিছু বলল না। পকেট থেকে ঘরের দরজার চাবি বের করে ওর হাতে দিয়ে বললাম ভেজা জামাকাপড় পাল্টে আসতে।

'এই এলাকায় নতুন এলে বুঝি,' আলাপ জমানোর জন্যে বলল মেয়েটা। হাত তুলে কিছুদূরে রাস্তার অন্যপাশে একটা সবুজ বাড়ি দেখিয়ে বলল, 'ওটা আমাদের বাড়ি। আমার নাম ডরোথি ম্যাকানন।'

'আমি মুসা, মুসা আমান। ঘরে গেল যে, ও আমার খালাত বোন, ফারিহা।'

'তোমাদের দুজনের নামই জানি,' হেসে বলল ডরোথি। 'তোমার আম্মাকে নাম ধরে ডাকতে শুনেছি সেদিন। তুমি খুব ভাল সাঁতারু, তাই না?'

'খারাপ না। তুমি?'

'চার বছর ধরে সুইমিং টীমে আছি। অনেক রিবন আর মেডেল পেয়েছি।'

আমিও অনেক পেয়েছি। বললাম না ডরোথিকে। শুধু জানালাম, 'আগের স্কুলে থাকতে আমিও টীমে ছিলাম।'

'আমাদের টীমে আসবে? আজ রাতে প্র্যাকটিস আছে আমাদের। আমার বিশ্বাস কোচ রনসন নিয়ে নেবেন তোমাকে।'

'গরমকালে প্র্যাকটিস করো নাকি তোমরা?'

'সারা বছরই করি। আসবে? আমার আম্মার গাড়িতেই যেতে পারবে। ইচ্ছে করলে তোমার বোনকেও সঙ্গে নিতে পারো।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে জবাব দিলাম, 'ঠিক আছে।'

'তাহলে ওকথাই রইল। সাড়ে পাঁচটায় চলে এসো আমাদের বাড়িতে। চলি। দেখা হবে।'

সাইকেলের প্যাডালে চাপ দিল ডরোথি। গেট দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। আমি

ঢুকলাম ঘরে। ফারিহাকে জানালাম খবরটা। খুশিতে লাফিয়ে উঠল সে। মিডলেকে সুইমিং টীমে যোগ দিতে পারব জেনে আমারও খুশি লাগল। টীমটা ভাল হলে তো কথাই নেই। আগের শহরের মতই এই শহরটাও তাহলে প্রিয় হয়ে উঠবে আমার কাছে।

তিন

'জোরে, মুসা! আরও জোরে!'

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে তীরে দাঁড়ানো ছেলেমেয়েরা। কানের কাছে পানির শব্দ। আরও জোরে পানি কেটে ছোটার চেষ্টা করলাম। এর চেয়ে জোরে সাঁতরানোর সাধ্য আর আমার নেই। পুলের শেষ প্রান্তটা দ্রুত এগিয়ে আসছে চোখের সামনে। একবিন্দু গতি কমালাম না। হাত লম্বা করে থাবা দিয়ে, পানিতে লাথি মেরে প্রাণপণে এগিয়ে চললাম। হাতে ঠেকল কঠিন টাইলস। দুহাত বাড়িয়ে পুলের কিনার আঁকড়ে ধরে শরীরটা টেনে তুললাম ওপরে। কিনারে বসে আঙুল দিয়ে ঠেলে চোখের সামনে থেকে কপালে তুলে দিলাম গগলস।

স্টপওয়াচের দিকে তাকিয়ে বিমল হাসি ফুটল কোচ রনসনের মুখে। আমার দিকে যখন ফিরলেন, হাসিটা মুছে গেছে মুখ থেকে। 'তোমার বয়েস কত, মুসা?'

'বারো।'

'সত্যি তো?'

মিথ্যে বলতে যাব কেন? ডরোথির দিকে তাকালাম। চোখ টিপে আমাকে চুপ থাকতে বলল সে। পরে আমাকে বলেছে, কোচের কোন দোষ নেই। আমার শরীর-স্বাস্থ্য দেখলে বারোর বেশিই মনে হয়। যাই হোক, আমাকে আর ফারিহাকে এখানে আনার পর কোচের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ডরোথি তাঁকে বলেছে আমরা টীমে ঢুকতে চাই।

বিশালদেহী লোক কোচ ওয়ারনার রনসন। হালকা নীল চোখের দৃষ্টি এতই তীক্ষ্ণ, সরাসরি তাকালে মনে হয় ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নিচ্ছেন। হেসে আমার সঙ্গে হাত মেলালেন। ফারিহার দিকেও হাসিমুখে তাকালেন। প্রথমে তার টেস্ট নিলেন।

অত ভাল সাঁতরাতে পারে না ফারিহা। তবে ফিফটি মিটার সাঁতারে উতরে গেল। সময় যা নিল, টীমে ঢোকার জন্যে যথেষ্ট। এরপর আমার দিকে নজর দিলেন তিনি। ফিফটি মিটারের দুটো টেস্ট দিতে হলো আমাকে—একটা ব্রেস্টস্ট্রোক, আরেকটা ফ্রিস্টাইল। দুটোতেই খুব ভালভাবে উতরে গেলাম। এরপর একশো মিটার ফ্রিস্টাইল। এতটাই ভাল করলাম, সন্দেহ জাগিয়ে দিলাম কোচের। সেজন্যেই আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে তিনি জানতে চাইলেন, আমার বয়েস সত্যি বারো, না আমি মিথ্যে বলছি।

তাঁর চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে আস্তে করে বললাম, 'আমার বয়েস বারোই, স্যার, মিথ্যে বলছি না।'

আস্তে মাথা ঝাঁকালেন কোচ। একদল ছেলেমেয়ে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমাদের। ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই সামারে আরও বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে তোমাদের। মুসার রেজাল্টে আমি সন্তুষ্ট। তোমাদেরও ওরকম করতে হবে। হাণ্ড্রেড মিটারে আমাদের সর্বোচ্চ রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে ও।' আবার আমার দিকে তাকালেন তিনি, 'ওয়েলকাম টু দি মিডলেক টীম, মুসা। আমি চাই, তুমি আরও ভাল করো।'

'চেষ্টা করব, স্যার। আপনি দোয়া করবেন।'

তিনি বললেন, 'প্র্যাকটিস হবে প্রতি হপ্তায় সোম, বুধ, আর শুক্রবার। সন্ধ্যা ছটায়।'

সেদিন ভালই চলল আমাদের প্র্যাকটিস। মিডলেক ছোট শহর। সুতরাং একেবারে নিচের ক্লাস থেকে শুরু করে হাই স্কুলের ছাত্র, সবাইকে নিয়ে মাত্র একটা সুইমিং টীম করা গেছে। ফারিহার চেয়ে ছোট সাঁতারু টীমে তেমন ছিল না। ওর বয়েসী ছিল ছয়জন। ওদের সঙ্গে খাতির করতে ওর সময় লাগল না।

আমার বয়েসী ছেলেমেয়ে ছিল অনেক। বেশির ভাগই ওরা ভাল, আমার সঙ্গে আন্তরিক, কেবল দুজন বাদে। ওরা দুজন টীমে আমার অস্তিত্বই যেন মেনে নিতে পারল না। নতুন কাউকে জায়গা দিতে অরাজী। অবশ্য সবখানেই এ রকম দু'চারজন থাকে। ওদের এই ভাবসাবকে গুরুত্ব দিলাম না আমি। আমার দরকার সবার সঙ্গে প্র্যাকটিস করা, তাই করতে লাগলাম। সাঁতারের প্র্যাকটিস খুব কঠিন কাজ। কিন্তু ব্যাপারটাকে খেলাচ্ছলে নিলাম, অতটা কঠিন আর লাগল না।

শাওয়ারে গোসল করে কাপড় বদলানোর জন্যে প্র্যাকটিসের পর লকার রুমে গেলাম আমরা। ছেলেদের রুমটা পুরানো, সুযোগ-সুবিধা তেমন নেই। নিজের তোয়ালেটাও সঙ্গে নিতে হয়। তবে তাতে গোসলের জন্যে গরম পানির ব্যবস্থা আছে।

শাওয়ার থেকে বেরিয়ে দেখি দুটো ছেলে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। একজন রয়েছে বেশ খানিকটা দূরে, সুতরাং ওর দিকে নজর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম না। অন্য ছেলেটা একেবারে আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। আমার চেয়ে লম্বা, খাটো করে ছাঁটা লাল চুল, মুখভর্তি লাল তিল। চোখ দুটো ওর হালকা ধূসর, এতটাই হালকা যে প্রায় রঙহীন মনে হয়।

পাশ কেটে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। আমার পথরোধ করল সে।

'এ টীমে কেউ চায় না তোমাকে, ব্ল্যাকি,' বলল ও।

রাগ লাগল। আমার গায়ের রঙ কালো হতে পারে, তাই বলে ব্ল্যাকি বলে টিটকারি দেয়ার কোন অধিকার নেই ওর। শীতল কণ্ঠে জবাব দিলাম, 'কোচ রনসন চান।'

'নিজেকে খুব জাঁহাবাজ ভাবো, তাই না?'

মুচকি হেসে বললাম, 'নিজেকে কি ভাবি না ভাবি সেটা তোমাকে বলতে যাব কেন?'

ঘুসি মারার জন্যে হাত তুলল ও। কোচকে আসতে দেখে থেমে গেল। পিছিয়ে গেল এক পা। চাপা গলায় শাসাল, 'তোমার কানের পর্দা আমি ফাটিয়ে দেব,

ব্ল্যাকি।'

ওর মুখের ওপর ব্যঙ্গ করে হাসলাম। বলতে ইচ্ছে করল—ওসব টেলিভিশনের ডায়লগ আমার ওপর ঝাড়তে এসো না। কোচ চলে আসাতে পারলাম না।

কাপড় পরে ফারিহাকে খুঁজতে বেরোলাম। পুলের খানিক দূরে ওকে পেলাম। ওর কয়েকজন বন্ধুকে লকেটটা দেখাচ্ছে। ওদের বোঝানোর চেষ্টা করছে, ওটা জলদস্যুদের জিনিস। গুপ্তধন। পেয়ে যাওয়াতে বেশ গর্বিত। সঙ্গীরাও মুগ্ধ হয়ে চোখ বড় বড় করে দেখছে। হারটা গলায় পরে সবাইকে দেখাল ও, কেমন কেউকেটা লাগছে ওকে। মনে মনে হাসলাম। আমি জানি ওটা জলদস্যুর জিনিস নয়। কিন্তু কাউকে কিছু বললাম না।

বাইরে গাড়ি নিয়ে আমাদের অপেক্ষা করছেন ডরোথির আম্মা। বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল। প্রথমে দু-এক ফোঁটা, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই একেবারে ঝমঝম করে। গাড়িতে উঠে বসলাম আমরা। স্টার্ট দিয়ে টান দিলেন তিনি। হঠাৎ সামনে চলে এল একটা সাইকেল। ঘ্যাচ করে ব্রেক কষলেন তিনি। সীটবেল্ট পরে আছি আমরা। তারপরেও সাংঘাতিক ঝাঁকুনি লাগল। বেল্ট না থাকলে সামনে ছিটকে পড়তাম। সাইকেলে বসা ছেলেটার চুল লাল। সেই বদমাশটা, লকার রুমে যে আমাকে ঘুসি মারতে চেয়েছিল। ও এ ভাবে গাড়ির সামনে পড়ল কেন, বুঝলাম না।

ডরোথিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ছেলেটা কে?'

'আয়ান ওয়েফার। ওর সাঁতারের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছ তুমি, মুসা, অতএব সাবধান। এর আগে আর কেউ পারেনি। ওর কাছাকাছি চলে এসেছিল একটা ছেলে, তাতেই রেগে গিয়ে পিটিয়ে তাড়িয়েছে ছেলেটাকে। আর তুমি তো ব্রেক করেছ। তোমাকে ছাড়বে না ও। গাড়ির সামনে পড়ে এই হুমকিই দিয়ে গেল।'

'কোচ সেই ছেলেটাকে যেতে দিলেন কেন?'

'তিনি জানেন না। কেউ তাঁকে জানাতে সাহস পায়নি। আয়ানকে সবাই ভয় পায়।'

'মার খেয়েও ছেলেটা কোচের কাছে নালিশ করেনি?'

মাথা নাড়ল ডরোথি, 'না। আমার সামনে ঘটনাটা ঘটলে কোচকে বলে দিতাম, এরপর যা হয় হত। আমি ওকে ভয় পাই না। প্রমাণ ছাড়া কাউকে শাস্তি দেন না কোচ রনসন। পুলিশের লোক তো, ডিটেকটিভ সার্জেন্ট।'

'তারমানে আয়ানের বিরুদ্ধে যতক্ষণ না কিছু প্রমাণ করা যাচ্ছে, ও নির্দোষ?'

'অনেকটা সেরকমই। ওর থেকে দূরে থেকো তুমি।'

'আমি ওকে কেয়ার করি না।' বললাম বটে, কিন্তু আমি জানি আমাকে না খোঁচালে আমি লাগতে যাব না। অহেতুক ঝগড়া করার মানসিকতা আমার নেই। তা ছাড়া একজন ভাল সাঁতারুর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে টীমের ক্ষতি করারও কোন ইচ্ছে ছিল না আমার।

বাড়ির গেটে আমাদের নামিয়ে দিলেন ডরোথির আম্মা।

আমাদের টীমে নির্বাচিত হওয়ার খবর মা আর বাবাকে জানালাম। দুজনেই খুশি হলো। আইসক্রীম খাওয়াতে নিয়ে গেল আমাদের। জলদস্যুর গুপ্তধন পাওয়ার

এতবড় সংবাদটা কিছুতেই খালাকে না বলে পারল না ফারিহা। তবে পুকুরে ডুবে যে মরতে বসেছিল, সেকথাটা চেপে গেল ও।

রাতে যখন ঘুমাতে গেলাম, তখনও বৃষ্টি পড়ছে। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল ফারিহা। আমি জেগে রইলাম। আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম। মনে এসে ভিড় করতে লাগল সারাদিনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। একদিনে অনেক ঘটনা। জট পাকিয়ে ফেলছে মাথার মধ্যে।

ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্ন দেখলাম জলজ লতা, কাদায় ঘোলা হয়ে থাকা পুকুরের পানি, জলদস্যু, আয়ান ওয়েফার...

ঘুম ভেঙে গেল ফারিহার চিৎকারে। বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে আমার। চোখ মেলে দেখি অন্ধকার। প্রথমে মনে হলো, এটাও বোধহয় দুঃস্বপ্ন। উঠে আলো জেলে দিয়ে গিয়ে বসলাম ওর বিছানায়। আমাকে আঁকড়ে ধরে কাঁদতে শুরু করল ও। অবাক কাণ্ড! এতটা ভীতু তো ও নয়? পুকুরে লতায় জড়ানোর পর থেকেই কেমন যেন হয়ে গেছে। ওর পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, 'ও কিছু না। খারাপ স্বপ্ন দেখেছ। শান্ত হও।'

ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল ও। ওর বুকে লকেটটা অস্পষ্ট দেখতে পেলাম। চামড়ার ওপর যেন গোল একটা বড় ছিদ্র হয়ে আছে। আমাকে ছেড়ে দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'আবার লতায় জড়িয়ে ধরেছিল আমাকে। দম আটকে মারা যাচ্ছিলাম। তুমি ছিলে না ওখানে।'

'স্বপ্নে ওরকম দেখেই মানুষ। আজ দিনের বেলা যা ঘটেছে, মাথায় ছিল তো তোমার, সেটাই দেখেছ। ভয় পেয়েছ। তবে আমার মনে হয় না বাস্তবে আর ওরকম কিছু ঘটবে। শুয়ে পড়ো।'

মাথা ঝাঁকাল ফারিহা। কিন্তু শুলো না। ডালে ডালে বাড়ি খেয়ে ফিরছে দমকা বাতাস। জানালার কাঁচে আঘাত হানছে বৃষ্টি। সেদিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল ও, 'দেখো! দেখো!'

ঝটকা দিয়ে ফিরে তাকালাম। কিছু দেখলাম না। কেবল কাঁচ বেয়ে সর্পিল রেখায় নেমে যাচ্ছে বৃষ্টির পানি। বাইরে ক্রমাগত যেন হাত নেড়ে চলেছে গাছের ডালপালাগুলো।

'কই, কিছু না তো। শুধু বৃষ্টি।'

'কিন্তু আমি দেখেছি। কে যেন দাঁড়িয়েছিল। মনে হলো একটা ছেলে। চিনতে পারিনি।'

'কেউ নেই।'

'আমি দেখেছি!'

উঠে গিয়ে জানালা খুললাম। দেখার জন্যে মুখ বের করে দিলাম বাইরে। মুহূর্তে ভিজে গেল ঘাড়, মাথা, চুল। এপাশ ওপাশ তাকিয়ে কাউকে দেখলাম না। জানালা বন্ধ করে দিয়ে ওর দিকে ফিরে কিছুটা কঠোর কণ্ঠেই বললাম, 'কেউ নেই। ও তোমার চোখের ভুল। দুঃস্বপ্ন থেকে জাগলে ওরকম উল্টোপাল্টা দেখেই মানুষ।'

ওর কথায় অটল রইল ফারিহা, 'আমি দেখেছি!'

'না, দেখোনি।'
'দেখেছি!'
হাল ছেড়ে দিলাম। তর্ক করে আর লাভ নেই। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওখানে শুতে ভয় লাগছে?'
'লাগছে।'
'আমার কাছে শোবে?'
'না।'
'তাহলে শুয়ে পড়ো। এত রাতে কথা বলছি শুনলে মা এসে বকা দেবে।'
আলো নিভিয়ে ফিরে এলাম নিজের বিছানায়। পাঁচ মিনিট পর বিছানা থেকে নেমে এসে আমার পাশে শুয়ে পড়ল ও। অন্ধকারে মুচকি হাসলাম। মিনিটখানেকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। আমার ঘুম এল না। তাকিয়ে রইলাম জানালার দিকে। কাঁচ বেয়ে এঁকেবেঁকে নেমে যাচ্ছে পানির ধারা। বাইরে ঝোড়ো বাতাসের তীক্ষ্ণ চিৎকার, যেন ভয়ঙ্কর কোন প্রেতের আর্তনাদ। অজান্তে গায়ে কাঁটা দিল আমারও।

চার

চমৎকার চলছিল আমাদের প্র্যাকটিস। পঞ্চাশ আর একশো মিটার ফ্রিস্টাইলে সময়ের কোন হেরফের হচ্ছিল না আমার, একজায়গায় স্থির; পঞ্চাশ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে উন্নতি হচ্ছিল। তবে এতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। কারণ পাঁচশো মিটার ফ্রিস্টাইলে অংশ নেয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম।
ভাল শিক্ষক কোচ রনসন। কার কোনটা দোষ, ঠিক ধরে ফেলেন। ফারিহার কয়েকটা দোষ দেখিয়ে দিয়ে খুব দ্রুত তাকে শুধরে নিতে লাগলেন। বেশ উন্নতি হলো ওর।
ততদিনে মিডলেকের,অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে। ডরোথির কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আমারও খাতির হলো। ফারিহাও তার সমবয়েসী বন্ধু পেয়ে গেছে, সুতরাং সর্বক্ষণ আমার সঙ্গে থাকাটা বন্ধ হলো। সব ঠিকঠাক চলছিল, কেবল আয়ান ওয়েফার বাদে। সে এমন কাণ্ড শুরু করল, প্র্যাকটিস করতে যেতেই অস্বস্তি লাগল আমার।
সত্যি, একটা যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়াল ছেলেটা। একশো মিটার সাঁতারে তখনও তার চেয়ে এগিয়ে আছি আমি। এটা সে সহ্য করতে পারছিল না কিছুতে। ভালমত প্র্যাকটিস করে উন্নতির চেষ্টা করলেই পারত। কিন্তু তা সে করত না। বরং যাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করত, তাকেই সরানোর জন্যে পাগল হয়ে উঠত। আমাকে টীম থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল সে। আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল। আমার গগলস, তোয়ালে লুকিয়ে রাখল, শুকনো কাপড় শাওয়ারের নিচে ফেলে ভিজিয়ে দিল, আমি গোসল করার সময় আচমকা গরম পানির নব ঘুরিয়ে পুরো

বাড়িয়ে দিল। যতভাবে অত্যাচার আর বিরক্ত করা সম্ভব, কোনটাই বাদ দিল না। হঠাৎ করে পা বাড়িয়ে দিয়ে দুবার আছাড় খাইয়েছে আমাকে, ধাক্কা দিয়ে একবার পুলে ফেলে দিয়েছে। সেটা দেখে ফেলেছিলেন কোচ। ধমক খেয়ে সাবধান হয়েছে আয়ান। তাঁর সামনে আর কোন শয়তানি করেনি।

আমার চেয়ে বড় হলেও ঘুসি মেরে ওর দাঁত কটা ফেলে দেয়ার ইচ্ছেটা আমি চাপা দিয়েছি কোচের কথা ভেবে। তিনি যে রকম রাগী মানুষ, মারামারি করলে উচ্ছৃঙ্খলতার অভিযোগে বলা যায় না আমাকে টীম থেকে বেরও করে দিতে পারেন। বাধ্য হয়ে আয়ানের অত্যাচার সহ্য করতে লাগলাম। জিনিসপত্র এমন জায়গায় সরিয়ে রাখতে লাগলাম, যেন সে হাত দিতে না পারে। যতটা সম্ভব দূরে রইলাম ওর কাছ থেকে। ওর ভয়ে প্র্যাকটিস করতে যেতে খারাপ লাগলেও যাওয়া বন্ধ করলাম না। জেদ চেপে গেছে। প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি, যত যা-ই করুক, টীম থেকে বের হব না আমি।

আয়ানও নিশ্চয় বুঝে ফেলেছিল সেটা। অন্য বুদ্ধি করল সে। আমাকে সরাসরি খোঁচানো বন্ধ করে দিল। একদিন প্র্যাকটিসের জন্যে কাপড় বদলাচ্ছিল, শুনতে পেলাম ফারিহার চিৎকার। দৌড়ে বেরোলাম লকার রুম থেকে। দেখি ফারিহার একটা জুতো পুলের পানিতে ছুঁড়ে ফেলছে আয়ান।

জিভ দিয়ে চুক-চুক শব্দ করল ও। 'আহ্‌হা, চেঁচাও কেন, খুকি। যাও, তুলে নিয়ে এসো। দেখি কেমন সাঁতার শিখেছ,' বলে ফারিহাকে পুলের কিনারে ঠেলে নিয়ে গেল। পানিতে ফেলে দেবে।

আর সহ্য করতে পারলাম না। মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেল। কোচ কি করবেন, সেই পরোয়া আর করলাম না। ছুটে গিয়ে দাঁড়ালাম ওর পেছনে। ডাকলাম, 'আয়ান!'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল। কিন্তু বলতে দিলাম না। বুকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মেরে ফেলে দিলাম পানিতে। দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, 'যা, জুতো তুলে আন্!'

হেসে উঠল কাছে দাঁড়ানো ছেলেমেয়েরা। আমি হাসলাম না। আয়ানও না। কে একজন কানের কাছে বলে উঠল, 'বাঁচতে চাইলে পালাও!'

আমি তখন মরিয়া। নড়লামও না। গ্যাঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখতে চাই ও কি করে। কতখানি ক্ষমতা!

পুল থেকে উঠে এল আয়ান। ঘুসি মারল পেটে। দম আটকে গেল আমার। শ্বাস নিতে পারলাম না। পড়ে গেলাম চিত হয়ে। আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। দমাদ্দম ঘুসি মারতে লাগল শরীরের যেখানে সেখানে। নির্বিবাদে মার খাচ্ছি আর হাঁ করে দম নেয়ার চেষ্টা করছি আমি। শ্বাস নিতে না পারলে শক্তিও পাব না, পাল্টা আঘাতও করতে পারব না।

অবশেষে আবার স্বাভাবিক হয়ে এল নিঃশ্বাস। ও মারছে এলোপাতাড়ি, আমি বেশ সময় নিয়ে নিশানা করে ধাঁ করে নাকে মারলাম এক ঘুসি। পরক্ষণে দেখলাম নাক দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে ওর। ঘুসি মেরে ও আমার এক চোখ ফুলিয়ে দিল। আমিও শোধ নিলাম। আবার ঘুসি মারল সে। কিন্তু লাগাতে পারল না। অবাক হয়ে

দেখলাম শূন্যে উঠে যাচ্ছে ও।

শার্টের কলার চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে আমার ওপর থেকে ওকে সরিয়ে নিলেন কোচ। আমাকে টেনে তুললেন। দুজনের মাঝে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। কঠোর দৃষ্টিতে তাকালেন আমাদের দিকে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে নাকের রক্ত মুছছে আয়ান। আমি চুপ। আমার পাশে এসে দাঁড়াল ফারিহা। চোখ লাল। রাগে অন্ধ হয়ে গেছে। সুযোগ দিলে খামচি মেরে আয়ানের দুই চোখ কানা করে দিতেও দ্বিধা করবে না।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইলেন কোচ।

আমার আর আয়ানের ওপর দৃষ্টি ঘুরছে তাঁর। জবাব দিলাম না। আশা করলাম, তিনি দেখেই অনুমান করে নিন। ফারিহাও চুপ করে রইল। কিন্তু ডরোথি আর মুখ বন্ধ রাখতে পারল না।

'ফারিহার জুতো পানিতে ছুঁড়ে ফেলেছিল আয়ান,' বলে উঠল সে। জ্বলন্ত চোখে ওর দিকে তাকাল আয়ান। কিন্তু তোয়াক্কা করল না ডরোথি। 'ফারিহাকেও ফেলে দিতে যাচ্ছিল। মুসা বাধা দিয়েছে।'

আয়ানের দিকে ফিরলেন কোচ। চিৎকার করলেন না। ধমকও দিলেন না। শীতল কণ্ঠে আদেশ দিলেন, 'জুতো তুলে আনো।'

প্রতিবাদ করার সাহস পেল না আয়ান। ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে। ফারিহার জুতো তুলে এনে রাখল কোচের সামনে।

ফারিহাকে জুতো তুলে নিতে বলে আমার দিকে তাকালেন কোচ। 'সাত দিনের জন্যে তোমাকে টীম থেকে বরখাস্ত করা হলো।'

মেনে নিয়ে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালাম কেবল। তর্ক করতে গেলেই শাস্তির পরিমাণ বেড়ে যাবে। যে কঠোর তিনি, আমাকে টীম থেকে বের করে দিলেও অবাক হতাম না তখন। কিন্তু এবারেও চুপ থাকল না ডরোথি। আমার পক্ষ নিয়ে বলল, 'এটা ঠিক হলো না, স্যার। ও ওর ছোটবোনকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। সেটা কি অন্যায়?'

ফিরে তাকালেন কোচ। চোখ সরিয়ে নিল ডরোথি। আয়ানের দিকে ফিরলেন তিনি। 'তোমাকে পনেরো দিন।'

'কিন্তু, স্যার...'

'তিরিশ দিন করে দেব কিন্তু! আমি কিছু দেখি না ভেবেছ? মুসা ঢোকার পর থেকেই ওর পেছনে লেগেছ তুমি। বাড়ি গিয়ে ভাল করে ভাবো। খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব আনতে না পারলে আর এসো না এখানে। আমি টীমের উন্নতি চাই, ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চাই। এখানে কোন রকম শয়তানির সুযোগ দেব না আমি। ভাল হতে পারলে এসো, নইলে এসো না। বুঝেছ?'

এমনিতেই লাল, আরও লাল হয়ে গেল আয়ানের মুখ। পারলে ওখানেই আমাকে খুন করে। কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব নয়, তাই চোখের দৃষ্টিতে ভস্ম করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাল।

'কি, বুঝেছ?' আবার জিজ্ঞেস করলেন কোচ।

'হ্যাঁ।'

'গুড। যাও এখন।'

কোচের মুখে মুখে কথা বলার সাহস করল না আর আয়ান। ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে গটমট করে চলে গেল লকার রুমের দিকে। যাওয়ার বেঞ্চ থেকে ছোঁ মেরে কার যেন একটা তোয়ালে তুলে নিয়ে গেল।

কোচ ডাকলেন, 'মুসা?'

কোচের দিকে মুখ তুলে তাকালাম। বকা শোনার জন্যে তৈরি। কিন্তু আর বকলেন না তিনি। শান্তকণ্ঠে বললেন, 'শোনো, এখানে কেউ যদি কোন গোলমাল করতে চায়, আমাকে বলবে, আমি বিচার করব। মারামারি করা ভদ্রলোকের কাজ নয়।'

মাথা ঝাঁকালাম, 'ইয়েস, স্যার।'

ঝগড়া করতে আমারও ভাল লাগে না। মারামারি তো আরও খারাপ লাগে। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে শয়তানি করবে, আমাকে জ্বালাবে, আমার ছোটবোনকে অপমান করবে, সেটা সহ্য করতে পারব না। তবে কোচকে বললাম না সেকথা।

কাপড় বদলানোর জন্যে ফারিহা আর আমি লকার রুমে গিয়ে ঢুকলাম। আয়ান নেই। চলে গেছে। তবে যাওয়ার আগে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে, আমার সঙ্গে তার বিবাদের অবসান হয়নি। আমার শার্ট, জুতো আর জিমনেশিয়াম ব্যাগ নিয়ে গিয়ে ফেলে রেখেছে শাওয়ারের নিচে। চাবি ঘুরিয়ে পানি বন্ধ করে দিলাম। সরিয়ে আনলাম ব্যাগ আর জুতো। শার্টটা চিপে পানি ঝরাতে লাগলাম।

ককিয়ে উঠল ফারিহা, 'মুসা!'

ফিরে তাকিয়ে দেখি ও কাঁদো কাঁদো হয়ে গেছে। হাত তুলে দেখাল ওর জিনিসগুলোরও একই অবস্থা করেছে আয়ান। কি আর করব? শাওয়ার বন্ধ করে ওগুলো সরাতে ওকে সাহায্য করলাম।

আচমকা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ফারিহা, 'চোর! চোর কোথাকার! আমার জিনিসটা নিয়ে গেছে! ওই শয়তানটা ছাড়া আর কেউ না!'

জানতে চাইলাম, 'কি নিয়েছে?'

'আমার গুপ্তধন!'

পাঁচ

আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল আমার রাগ। আয়ানকে আমি ছাড়ব না। ভেবেছে কি? যা খুশি করবে ও, আর সবাই মুখ বুজে সহ্য করবে? জাহান্নামে যাক টীম। কোচ আমাকে বের করে দিলে দেবেন। ওর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া আমাকে করতেই হবে। ওর মত দশটা আয়ানকেও পরোয়া করি না আমি আর।

রাত হয়ে গেছে। ওর পিছু নেয়ার তখন সময় নেই। ফুঁসতে ফুঁসতে বাড়ি ফিরে গেলাম।

একটা চোখের চারপাশ নীল হয়ে আছে আমার। কি ঘটেছে, ফারিহাই বলল

বাবা-মাকে। বাবা কিছু বলল না, তবে মা রেগে গেল ভীষণ। কোচের সঙ্গে দেখা করে আয়ানের বাবা-মার কাছে বিচার দেয়ার কথা বলল। বাবা বাধা দিল। বলল, দরকার নেই। বিচার যা করার কোচই করেছেন। আর কিছু করতে গেলে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

লকেট চুরির কথা মাকে বলল না ফারিহা। আমি নিষেধ করেছি। ওকে কথা দিয়েছি, আমিই ওটা আয়ানের কাছ থেকে এনে দেব। নিজেদের ঝগড়া নিজেরা না মিটিয়ে বাবা-মার সাহায্য চাওয়াটা আমার কাছে কাপুরুষতা মনে হয়।

পরদিন সকালে উঠেই সাইকেল নিয়ে বেরোলাম ওর খোঁজে। ফারিহা সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, নিলাম না। বাড়িতে থাকতে বললাম। কিন্তু ডরোথিকে ঠেকাতে পারলাম না। ও আমার সঙ্গে চলল।

ও যাওয়াতে খুশিই হয়েছি। আয়ানকে আমি একাই শায়েস্তা করতে পারব, কিন্তু ওর বাসা কোথায়, কোনখানে পাওয়া যাবে জানতাম না। সে-ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারবে ডরোথি। মিডলেকে জন্ম ওর। ওখানকার প্রতিটি রাস্তা, প্রতিটি এলাকা চেনা। আয়ানদের বাড়ি চেনে।

ডরোথি সঙ্গে না গেলে আয়ানের ঠিকানা বের করতেই হয়তো আমার সারাদিন লেগে যেত। শহরের আরেক ধারে থাকে ওরা। আমাদের বাড়িটার মতই ওদের বাড়ির পাশেও পাইনের জঙ্গল রয়েছে। মেইন রোড থেকে কাঁচা রাস্তা নেমে গেছে।

সোজা আমাকে ওদের বাড়ির কাছে নিয়ে গেল ডরোথি।

আয়ানকে দেখলাম না। আঙিনায় ছোট একটা মেয়েকে খেলা করতে দেখল ডরোথি। ছোট একটা প্ল্যাস্টিকের বালতি নিয়ে খেলছে মেয়েটা। ওটা দিয়ে মাথা ঢেকে রেখেছে। ওর চুল লাল কিনা দেখা গেল না।

কাছে গিয়ে দাঁড়াল ডরোথি। জিজ্ঞেস করল, 'আয়ান কি তোমার ভাই?'

মেয়েটা মাথা ঝাঁকাল।

'ঘরে আছে?' জানতে চাইল ডরোথি।

মাথা নাড়ল মেয়েটা।

'কোথায় আছে জানো?'

আবার মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা। ঝাঁকি লেগে মাথা থেকে খুলে পড়ে গেল বালতি। ওর চুলও আয়ানের মত লাল।

'কোথায়?'

বালতিটা গড়িয়ে গেল বালির ওপর দিয়ে। তাকিয়ে দেখল মেয়েটা। তোলার চেষ্টা করল না। বলল, 'দোকানে গেছে। ওই ওদিকে।'

আমার দিকে তাকিয়ে ডরোথি বলল, 'চলো। দোকানটা আমি চিনি।' মেয়েটাকে বলল, 'তুমি খুব লক্ষ্মী মেয়ে। বাই-বাই।'

হাত নাড়ল মেয়েটা, 'বাই।'

আমাকে নিয়ে বড় রাস্তায় ফিরে এল ডরোথি। মাইলখানেক দূরে বড় একটা দোকান আছে। ও ধারণা করল, আয়ান ওখানেই গেছে। আমাকে ওখানে নিয়ে চলল। যে রাস্তা দিয়ে গেলাম, বাড়ি ফিরলে ওটা ধরেই আসতে হবে আয়ানকে।

সুতরাং দোকান থেকে যদি বেরিয়েও আসে, আমাদের সামনে ওকে পড়তেই হবে।

কিন্তু অন্য রাস্তা দিয়ে বেরোল আয়ান। ইচ্ছে করে আমাদের দেখা দিতে না চাইলে ওকে দেখতে পেতাম না। পাশের একটা গলির মুখ থেকে ডাকল, 'আই, ব্ল্যাকি!'

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে ফিরে তাকালাম। সাইকেলের প্যাডাল ঘুরিয়ে মেইন রোডে উঠে এল ও। হাত তুলে নাড়ল। দেখলাম, ওর হাতে ঝুলছে লকেটসহ সেই চেনটা। খিকখিক করে হেসে জিজ্ঞেস করল, 'এটা খুঁজছ?'

'দাও ওটা, আয়ান!'

'নাও না। পারলে এসে নিয়ে যাও।' বলেই সাইকেলের প্যাডালে চাপ দিল সে। দ্রুত ছুটতে শুরু করল।

আমি আর ডরোথি পিছু নিলাম ওর। আমাদের সাইকেল দুটোও নতুন। ওরটার চেয়ে খারাপ না। কিন্তু ওর পা আমাদের চেয়ে লম্বা, প্যাডালে চাপ পড়ছে বেশি, সুতরাং আমাদের চেয়ে গতি বেশি। বেশি আগে যেতে পারল না, তবে আমরাও তার কাছাকাছি যেতে পারলাম না।

ওর বাড়ির কাছে বলে এলাকাটা ওর মুখস্থ। রাস্তা থেকে নেমে লোকের বাড়ির ভেতর দিয়ে, গাছপালার পাশ কাটিয়ে, কখনও বা বনের ভেতর দিয়ে দ্রুত ছুটতে লাগল। আমাকে খেপানোর জন্যে মাঝে মাঝেই লকেটটা তুলে দেখায়। ওকে পেটানোর জন্যে পাগল হয়ে গেলাম, কিন্তু ধরতেই পারছি না।

মিনিট বিশেক একনাগাড়ে ছুটলাম আমরা। যতই সময় যাচ্ছে, ততই আমি খেপছি। আকাশ কালো করে মেঘ জমেছে। অন্ধকার বাড়ছে ক্রমেই। বাজ পড়ল কাছেই কোথাও। বৃষ্টি শুরু হলো। সাইকেল চালানো থামল না আমাদের। বৃষ্টি তো বৃষ্টি, তুষারপাত হলেও থামতাম না তখন। একটাই ভাবনা, আয়ানকে ধরতে হবে।

রাস্তা ভিজে পিচ্ছিল হয়ে গেল। পিছিয়ে পড়ল ডরোথি। আমার গতি কমল না। বাড়াতেও পারলাম না, তবে আয়ানের কাছে চলে যেতে শুরু করলাম। ওর গতি কমে যাচ্ছে। ও সেটা বুঝতে পারছে। লকেটটা দোলানোর চেষ্টা বাদ দিয়ে গতি বাড়ানোর দিকে নজর দিল। লাভ হলো না। দাঁতে দাঁত চেপে প্যাডেল করছি। আমি ওকে ধরবই। কেড়ে নেব লকেটটা। তার জন্যে যদি মাথা ফাটাফাটি করতে হয়, তাও করব।

বিদ্যুৎ চমকাল। এতই কাছে, মনে হলো তীব্র নীল আলোর শিখা ঝিলিক দিয়ে গেল একেবারে চোখের সামনে। বিকট শব্দে বাজ পড়ল। যেন বোমা ফাটল মাথার ওপর। আয়ানের সামনে একটা গাড়ি পড়ল হঠাৎ। চিৎকার দিয়ে হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে সামলানোর চেষ্টা করল সে। ব্রেক কষল ড্রাইভার। রাস্তায় ঘষা খেয়ে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলল চাকা। আয়ানও চিৎকার করে উঠল আবার। তার সামনের চাকা গুঁতো খেল গিয়ে গাড়ির গায়ে। হ্যাণ্ডেলের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে রাস্তায় পড়ল সে।

আমি নড়লাম না। কোন্ সময় সাইকেল থামিয়ে দিয়েছি, নিজেও বলতে পারব না। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে মাথা। পানি গড়িয়ে নামছে

গাল বেয়ে। কিন্তু মোছার জন্যে হ্যাণ্ডেল থেকে হাত সরালাম না। রাস্তায় পড়ে থাকা আয়ানের দিকে তাকিয়ে আছি। চিত হয়ে পড়ে চিৎকার করছে ও। হাতে-পায়ে রক্ত। দাঁড়াতে পারছে না। অকেজো হয়ে গেছে পা।

আমার পাশে এসে দাঁড়াল ডরোথি। সাইকেলটা প্রায় মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দৌড় দিল একটা বাড়ির দিকে। দরজায় থাবা মারতে মারতে সাহায্যের জন্যে চিৎকার করে লোক ডাকতে আরম্ভ করল।

আমি তেমনি স্থির বসে আছি সাইকেলে। ডরোথি কি করছে দেখার জন্যেও মুখ ফেরালাম না। গাড়ি থেকে নেমে এসেছে এক মহিলা। আয়ানের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। নরম সুরে কথা বলতে লাগল ওর সঙ্গে। নড়াচড়া করলে বেশি ব্যথা পাবে এ জন্যে চুপ করে শুয়ে থাকতে বলল ওকে।

চিৎকার থামিয়ে দিয়েছে আয়ান। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে এখন।

ফিরে এসে আমার পাশে দাঁড়াল ডরোথি। আমার মনে হলো কয়েক যুগ পার হয়ে গেল, কিন্তু ও আমাকে বলল মাত্র কয়েক মিনিট পেরিয়েছে। পুলিশ এল। হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স এল। কি জানি কেন ওদের বেশি কাছে যেতে সাহস হলো না আমার। যেখানে সাইকেল থামিয়েছিলাম সেখান থেকেই ওদের কাজকর্ম দেখতে লাগলাম। কথা শুনতে পাচ্ছি।

আয়ানের পায়ে স্প্লিন্টার বেঁধে দিলেন ডাক্তার। ব্যথা কমানোর ইঞ্জেকশান দিলেন। স্ট্রেচারে তোলা হলো ওকে। হাত আর পায়ের বহু জায়গায় চামড়া ছিলে গেছে। একটা পায়ের হাড় ভেঙেছে। খারাপই লাগল ওর জন্যে। ওকে ধরে পেটাতে চেয়েছিলাম বটে, কিন্তু অতটা আঘাত পাক, এত ক্ষতি হোক তা চাইনি।

ডাক্তার যখন তাঁর কাজ করছেন, পুলিশ তখন কথা বলছে আয়ানের সঙ্গে। দুর্ঘটনাটা কি করে ঘটল জানতে চাইছে।

'রাস্তার মাঝখানে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল,' আয়ান বলল।

'আমি তো কাউকে দেখিনি,' গাড়ি থেকে নেমে আসা মহিলা বলল।

'ছিল! আমি স্পষ্ট দেখেছি!' জোর দিয়ে বলল আয়ান। 'একটা সাত-আট বছরের ছেলে। আগে দেখিনি। বিদ্যুৎ চমকাতেই দেখি একেবারে সাইকেলের চাকার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।'

অবাক হয়ে গেলাম। কি বলছে আয়ান? রাস্তায় কোন ছেলেকে দেখতে পাইনি আমিও। রাস্তার মাঝখানে তো নয়ই, দুই পাশেও কোনখানে নয়।

আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল একজন পুলিশ অফিসার। আমার আর ডরোথির দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটতে দেখেছ তোমরা?'

আমরা দুজনেই মাথা ঝাঁকালাম।

'রাস্তায় কোন ছেলেকে দেখেছ?' আবার জিজ্ঞেস করল অফিসার।

'না,' জবাব দিলাম, 'কাউকে দেখিনি। হঠাৎ করে গাড়িটাকে দেখলাম। অকারণেই সেদিকে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে দিয়ে গিয়ে ধাক্কা লাগাল আয়ান। ইচ্ছে করলে পাশ কাটাতে পারত। এমন কাণ্ড করল, যেন মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল ওর।'

আমার কথা শুনতে পেল আয়ান। চিৎকার করে উঠল, 'আমি বলছি ছিল!

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল! সাইকেলের চাকার সামনে পড়ল বলেই তো ওকে বাঁচাতে গিয়ে ধাক্কা খেলাম আমি!'

'কিন্তু আর কেউ তো দেখেনি,' শান্তকণ্ঠে ওকে বলল অফিসার। 'তুমি শুধু একাই দেখলে?'

'কেন দেখল না জানি না!' চেঁচিয়ে বলল আয়ান। 'তবে আমি দেখেছি! আমি কি গাধা নাকি মরার জন্যে ইচ্ছে করে গিয়ে গাড়ির ওপর পড়ব?'

'নিশ্চয় ভুল দেখেছ। অ্যাক্সিডেন্টের আগে ওরকম হতে পারে।'

'না, আমি ঠিকই দেখেছি!'

ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল অফিসার। ডাক্তারের নির্দেশে স্ট্রেচার তুলে নিয়ে গেল অ্যাম্বুলেন্সের দুজন লোক। আয়ান তখনও চিৎকার করে বলছে, রাস্তার মাঝখানে একটা ছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে ও। আনমনে মাথা নাড়তে লাগল অফিসার। আরেকজনকে বলতে শুনলাম, 'মাথায় লেগেছে বোধহয় ছেলেটার। প্রলাপ বকছে সেজন্যে।' ওই মুহূর্তে আমারও মনে হয়েছিল, ওরকমই কিছু ঘটেছে আয়ানের।

ছাতে বসানো আলো ঘোরাতে ঘোরাতে সাইরেন বাজিয়ে রওনা হয়ে গেল অ্যামবুলেন্স। মহিলার দিকে নজর দিল পুলিশ। কয়েক মিনিট কথা বলল তার সঙ্গে। বুঝতে চাইল গাড়ি চালানোর মত অবস্থা আছে কিনা মহিলার। তাকে গ্রেপ্তার করল না, জরিমানাও নয়। দোষটা পুরোপুরি আয়ানের। ইচ্ছে করে সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে গিয়ে গাড়ির ওপর পড়েছে।

রাস্তায় পড়ে আছে সাইকেলটা। বেঁকেচুরে শেষ। মেরামতের অবস্থা নেই। ওটাতে আর চড়তে পারবে না আয়ান। দুর্ঘটনার প্রমাণ হিসেবে ওটা পিকআপে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ।

সবাই চলে গেলে আয়ান যেখানে পড়ে গিয়েছিল, সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। নিচের দিকে তাকালাম। মিনিটখানেক পর রাস্তার আশপাশে খুঁজতে শুরু করলাম। লকেটটা আয়ানের হাতে ছিল। দুর্ঘটনার সময় নিশ্চয় হাত থেকে পড়ে গেছে। আর পড়লে এখানেই আশপাশে কোথাও রয়েছে।

কিন্তু রাস্তায় পেলাম না ওটা। ধাক্কা লেগে ও যখন পড়ে যায়, ওর হাত থেকে উড়ে গিয়ে রাস্তার পাশে একটা বাড়ির লনে পড়েছে জিনিসটা। নিচু হয়ে তুলে নিতে গেলাম।

মনে হলো কেউ যেন আমার পাশে এসে দাঁড়াল। চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম, খালি পা। জুতো-স্যাণ্ডেল কিছু নেই। চেহারা দেখার জন্যে মুখ ঘুরিয়ে তাকালাম।

কেউ নেই!

আশ্চর্য! এইমাত্র তো দেখলাম! গেল কোথায়? চারপাশে তাকালাম। কাউকে দেখতে পেলাম না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ডরোথি। আর কোন লোক নেই আশপাশে। ও আমার কাছে আসেনি। তা ছাড়া ওর পায়ে জুতো আছে। কাকে দেখলাম তাহলে?

লকেটটা তুলে পকেটে রেখে ফিরে গেলাম ডরোথির কাছে। কি দেখেছি

বললাম না ওকে। বললে হয়তো ভাববে আমিও প্রলাপ বকছি আয়ানের মত। সাইকেলটা তুলে নিলাম।

ফেরার পথে তেমন কথা বললাম না আমরা। আসলে পারলাম না। বলার মত মনের অবস্থা ছিল না আমাদের। কারণ আরেকটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল সেদিন। রাস্তার মোড় পেরোতেই দেখি ঝলমল করছে রোদ। সূর্য বেরিয়ে এসেছে। ঝড়বৃষ্টির চিহ্নমাত্র নেই।

ছয়

হারটা ফেরত পেয়ে খুব খুশি ফারিহা। আমি ওর হাতে ওটা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে গলায় পরে ফেলল। পাওয়ার পর থেকে ওটা গলায় পরে থেকেছে ও, কেবল সাঁতার প্র্যাকটিসের সময় বাদে। পুলে নামার আগে ওটা রেখে যেতে বাধ্য করতাম আমি। সাঁতারের সময় ওধরনের কিছু পরা থাকলে ঝামেলা বাধিয়ে অন্যমনস্ক করে দিতে পারে, তাতে আসল কাজের অসুবিধে হয় বলে আমার ধারণা। যাই হোক, লকার রুমে ওটা খুলে রেখে সাঁতার কাটতে গেলেও অন্য সব সময় পরে থাকত ফারিহা, এমনকি ঘুমানোর সময়ও।

আমার ভয় ছিল আবারও দুঃস্বপ্ন দেখবে ও। কিন্তু প্রথম দিনের পর আর দেখল না। জিজ্ঞেস করেছি। বলল, দুঃস্বপ্ন দেখে না, বরং দেখে সে খুব ভাল সাঁতারু হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে কেউ পারে না। লকেটটা গলায় পরে থাকাতে পানির নিচেও দম নিতে পারে। ঘুমের মধ্যেই কে যেন ধারণা দিয়েছে ওকে, ওটা জাদুর লকেট, অনেক ক্ষমতা ওটার।

লকেটটা আয়ানের কাছ থেকে ফেরত আনার পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমাকে জিজ্ঞেস করল ফারিহা, বনের ভেতরের পুকুরে সাঁতার কাটতে যাব কিনা। প্রায় 'না' বলে ফেলেছিলাম। ওখানে যাওয়ার আর কোন প্রয়োজন ছিল না আমার। সাঁতার প্র্যাকটিসের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলে স্কুলের পুলে যেতে পারি। তবে অবশ্যই শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর।

কিন্তু চাপাচাপি করতে লাগল ফারিহা। দুপুরের দিকে শেষে বলতে বাধ্য হলাম, ঠিক আছে; যেতে পারি, তবে সাঁতার কাটা চলবে না। আমাকে কথা দিতে হবে, সে পানিতে নামতে পারবে না। ভয় দেখানোর জন্যে বললাম, নামলে লতাগুলো আবার তাকে পেঁচিয়ে ধরবে না, তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

ভেবেচিন্তে রাজি হয়ে গেল ফারিহা। বলল, ঠিক আছে, পানিতে নামবে না। বুনোজাম পেড়ে খাবে। পুকুরের পাড়ে বসে থাকবে। বনের পাখি আর জন্তু-জানোয়ার দেখবে। দেখার অনেক কিছুই আছে, আর বোকার মত বাধা দিলাম না আমি। অনুভব করছি, রহস্যের জট হয়তো এভাবেই খুলবে।

দুপুরে খাওয়ার পর ওকে নিয়ে রওনা হলাম। পুকুরটার পাড়ে গিয়ে দেখি একটা ছেলে পানিতে সাঁতার কাটছে। প্রায় ফারিহারই বয়েসী। কালো চুল। কালো

চোখ। পানিতে ভিজতে ভিজতে চামড়া নীলচে হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ নেমেছে বোধহয়।

ওকে দেখেই পানিতে নামার আবদার ধরল ফারিহা। নামবে না—বাড়ি থেকে কথা দিয়ে এসেছে যে, ভুলেই গেল। ওর বয়েসী একটা ছেলের সঙ্গে নামতে চাইছে বলে আমিও বিশেষ বাধা দিলাম না। তবে লতাগুলোর কাছে যেতে নিষেধ করে দিলাম।

নেমে গেল ফারিহা। ওকে দেখে এগিয়ে এল ছেলেটা। আমিও নামলাম। ফারিহার কাছাকাছি রইলাম। লতার ভয় আমার তখনও যায়নি। ফারিহাকে যদি আবার ধরে, ওকে ছাড়িয়ে আনার জন্যে তৈরি রইলাম।

'হাই,' ছেলেটাকে বলল ফারিহা, 'আমি ফারিহা। ও আমার ভাই, মুসা। তুমি কে?'

'আমি আকু,' ছেলেটা বলল।

'শুধু আকু?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত আরেকদিকে তাকিয়ে রইল ছেলেটা। যেন মনে করার চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'আকিয়ানো কোলম্যান।'

'এদিকেই থাকো?'

'এখন আর থাকি না।'

'বিদেশী বলেই তো মনে হচ্ছে তোমাকে। এখানে কারও বাড়িতে বেড়াতে এসেছ বুঝি?

আবার ভাবল আকু। জবাবটা এমন ভাবে দিল, হ্যাঁ-না কিছু বোঝা গেল না।

'সাঁতার তো ভালই কাটো। কোনও টীমে আছ?'

বুঝতে পারল না যেন আকু। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'উঁ!'

'কোন্ টীমে?'

আনমনে মাথা নাড়ল আকু।

'তারমানে কোন টীমে নেই?'

হাত নেড়ে প্রশ্নটা যেন উড়িয়ে দিয়ে আকু বলল, 'এসো, সাঁতার কাটি। সাঁতার কাটতে ভাল লাগে।'

আমার দিকে তাকাল ফারিহা। বললাম, 'খবরদার! ভুলেও বেশি পানিতে যেয়ো না।'

ভাব হয়ে গেল দুজনের। পানিতে দাপাদাপি করে খেলতে শুরু করল। নেমেই যখন পড়েছি, আমি ভাবলাম চুপচাপ দাঁড়িয়ে না থেকে একটু প্র্যাকটিস করি। সাঁতরে চললাম বেশি পানির দিকে। মাঝে মাঝে চোখ ফিরিয়ে দেখি, ফারিহা আর আকু কি করছে। গভীর পানির দিকে যাচ্ছে কিনা।

না, যাচ্ছে না। লতার কথা মনে আছে ওর। সেদিকে যাচ্ছে না আর। নিশ্চিন্ত হয়ে আমি আমার কাজে মন দিলাম। পুকুরটা বড়। ফ্রীস্টাইল প্র্যাকটিস করা সুবিধে। পঞ্চাশ আর একশো মিটারে যথেষ্ট উন্নতি করেছি, পাঁচশো মিটার প্র্যাকটিস করা দরকার।

পাঁচশো মিটার মাপার কোন ব্যবস্থা নেই পুকুরে। যা করার আন্দাজে করতে

হবে। কিংবা আরেক কাজ করা যায়, যত দ্রুত সম্ভব সাঁতরে যেতে হবে, শরীরের শক্তিতে যতক্ষণ কুলায়। তা-ই করলাম।

সাঁতরানোর সময় এত বেশি শব্দ হয় যে বাইরের অন্য শব্দ তেমন শোনা যায় না। কানে এলেও বিকৃত হয়ে আসে, স্পষ্ট হয় না। এ জন্যেই ঝগড়াটা কখন শুরু করল ওরা জানতে পারলাম না। অদ্ভুত একটা ভয় ধরানো অনুভূতি আমাকে থামিয়ে দিল হঠাৎ করে, কেন এ রকম হলো বলতে পারব না। ফিরে তাকালাম।

লকেটটা নিয়ে ঝগড়া বাধিয়েছে ওরা। বার বার খামচি মেরে ধরার চেষ্টা করছে আকু, ঝটকা দিয়ে গলা সরিয়ে নিচ্ছে ফারিহা। ধরতে দিচ্ছে না।

'ওটা আমার!' চিৎকার করে বলল আকু। 'দাও আমাকে!'

'তোমায় হয় কি করে?' সমান তেজে চিৎকার করে উঠল ফারিহা। 'আমি ওটা পেয়েছি।'

'পেলেই কি তোমার হয়ে গেল নাকি? ওটা আমার জিনিস। দাও বলছি!'

'না!'

ফারিহার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আকু। খামচি মারতে গেল। মুখ সরিয়ে নিল ফারিহা। ওকে ঠেকানোর চেষ্টা করতে লাগল। মনে হলো পানির জন্যে সুবিধে করতে পারছে না দুজনের কেউই। ক্ষিপ্র হতে পারছে না। ওদের কাণ্ড দেখে অবাক হলাম, বিশেষ করে ফারিহার, কারণ মোটেও হিংসুক নয় ও। এ ভাবে ঝগড়া করে না কারও সঙ্গে।

যেখানে ছিলাম সেখানেই রয়ে গেলাম আমি। ওদের ঝগড়া থামানোর জন্যে এগোলাম না। কি করে, দেখতে লাগলাম। আশা করলাম, আপনাআপনি থেমে যাবে।

কিন্তু থামল না। হিংস্র হয়ে উঠল আকু। ফারিহার গলা জড়িয়ে ধরে ওর মাথা পানির নিচে ঠেসে ধরল। একটা সেকেণ্ড যেন পাথর হয়ে গেলাম আমি। বোবা হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওদের দিকে।

ফারিহাকে টেনে নিয়ে পানির নিচে চলে গেছে আকু। তোলপাড় হচ্ছে ওখানকার পানিতে। বুদ্বুদ উঠছে। ওদের দেখতে পাচ্ছি না। ওপরে ভেসে ওঠার অপেক্ষা করছি।

উঠল না ওরা। বরফ হয়ে জমে গেছে যেন আমার হাত-পা। নড়াতে পারছি না। নড়ানোর জন্যে রীতিমত লড়াই করতে হলো। সাঁতরাতে শুরু করলাম। ভয় পেয়ে গেছি। নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, ও কিছু না। বাচ্চাদের ঝগড়া। এখুনি ভেসে উঠবে ওরা। কিন্তু মন কথা শুনল না আমার। বুকের মধ্যে এত বেশি লাফাতে শুরু করল হৃৎপিণ্ডটা, শ্বাস নিতে পারলাম না ঠিকমত। মনে হচ্ছিল, পানি নয়, আঠাল কাদার ওপর দিয়ে সাঁতরানোর চেষ্টা করছি। ওদের কাছে কোনদিনই পৌঁছুতে পারব না।

কিন্তু পারলাম। ঘোরের মধ্যে যেন অবশেষে পৌঁছে গেলাম সেই জায়গাটায়, ওরা যেখানে তলিয়ে গেছে। মাথা নিচু করে ডুব দিলাম। কয়েকটা সেকেণ্ড কিছুই চোখে পড়ল না। কেবল জলজ লতা, আগের বার যেখানে আটকেছিল ফারিহা, তারচেয়ে অনেক বেশি ঘন এখানে। তারপর দেখতে পেলাম ওকে। হাত-পা ছুঁড়ে,

পানিতে লাথি মেরে, ভেসে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। চোখে আতঙ্ক। এত লতা থাকা সত্ত্বেও আগের বারের মত পেঁচিয়ে ধরেনি ওকে। কিসে আটকাল, বুঝতে পারলাম না। আকুকে দেখতে পেলাম না।

ফারিহার হাত ধরে টান দিলাম। নড়াতে পারলাম না। মনে হলো নিচ থেকে কিছু একটা টেনে ধরে রেখেছে ওকে, নামিয়ে নিতে চাইছে। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না আমার। ক্ষণিকের জন্যে দিশেহারা হয়ে গেলাম। কি করব বুঝতে পারছি না। ফুসফুসের বাতাস ফুরিয়ে আসছে ওর। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। আরেকটু নিচে নেমে ওর কোমর জড়িয়ে ধরে, পানিতে প্রাণপণে লাথি মেরে ওপরে ওঠার চেষ্টা করলাম।

যেটাই ধরেছিল ওকে, হয়তো ভাবল তখনকার মত ফারিহাকে মাপ করে দেয়া যাক, কিংবা বুঝতে পারল ওকে না নিয়ে উঠব না আমি, তাই ছেড়ে দিল। পানির ওপর ভেসে উঠলাম আমরা। কাশতে আরম্ভ করল ফারিহা। ভাল লক্ষণ। তার মানে দম নিতে পারছে ও। কিন্তু জ্ঞান আছে কিনা বোঝা গেল না। ঢিল হয়ে আছে শরীর।

ওর দুই হাত আমার গলায় পেঁচিয়ে নিয়ে ওকে সহ সাঁতরাতে শুরু করলাম। অগভীর পানিতে পৌঁছলাম। পায়ে মাটি ঠেকল আমার। শক্ত হয়ে গেল ফারিহার শরীর। দুহাতে আমার গলা আর দুই পা দিয়ে কোমর জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল।

পানি থেকে উঠে এসে মাটিতে শুইয়ে দিলাম ওকে। আমাকে ছাড়তে চাইল না ও। কিন্তু বসে থাকলে চলবে না আমার। আকুকে খুঁজতে হবে। তাকে দেখা যাচ্ছে না। তখনও ভেসে ওঠেনি।

যে জায়গাটাতে ডুবেছিল ওরা, আবার গিয়ে ডুব দিলাম ওখানে। ওকে দেখলাম না। কয়েকবার করে ডুব দিয়ে একেবারে তলায় গিয়ে খুঁজলাম। পেলাম না ওকে। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। পেলেও আর লাভ নেই। শেষ হয়ে গেছে নিশ্চয় ও।

উঠে এলাম ওপরে। তখনও ফোঁপাচ্ছে ফারিহা। তবে কাশি বন্ধ হয়েছে।

আকুর লাশ তোলার জন্যে লোক দরকার। ডেকে আনতে হবে গিয়ে। কিন্তু ফারিহাকে ফেলে যেতে পারছি না। উবু হয়ে বসলাম ওর পাশে। ডাকলাম, 'ফারিহা?'

আমার দিকে তাকাল ও। কান্না থামানোর চেষ্টা করল।

'আকু ডুবে গেছে। লোক ডেকে আনতে হবে। তুমি হাঁটতে পারবে?

মাথা ঝাঁকাল ফারিহা।

ওর হাত চেপে ধরে টেনে তুললাম। বনের ভেতর দিয়ে রওনা হলাম আমাদের বাড়ির দিকে। কিছুদূর এগিয়ে দৌড়াতে শুরু করলাম। ভেবেছিলাম, ফারিহা বোধহয় পারবে না। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে আমার সঙ্গে ছুটতে লাগল সে। ওর হাত ছাড়লাম না। দুর্বল শরীরে দৌড়াতে গিয়ে পড়ে যেতে পারে।

পুলিশকে ফোন করলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে পুলিশ, অ্যামবুলেন্স আর দমকল বাহিনীর লোক এসে হাজির হলো। বনের ভেতর গাড়ি ঢোকানোর মত কোন পথ নেই। সুতরাং হেঁটে যেতে হলো সবাইকে। পথ দেখিয়ে ওদের নিয়ে গেলাম

পুকুরটার পাড়ে।

পুলিশের সঙ্গে এসেছেন কোচ রনসন। পুকুর পাড়ে এসে কোন কথা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন মনে করলেন না। কাপড় খুলে নেমে গেলেন পানিতে। ডুব দিয়ে খুঁজতে শুরু করলেন। আরও কয়েকজন পুলিশ আর দমকল বাহিনীর লোক তাঁর সঙ্গে নামল। তীরে দাঁড়ানো একজন অফিসারকে আমি পুরো ঘটনাটা খুলে বললাম। তবে কিছু কিছু ব্যাপার চেপে গেলাম। যেমন, পানিতে সাঁতার কাটার সময় আমার অদ্ভুত অনুভূতি, কিংবা অদৃশ্য কিছুর ফারিহার পা টেনে ধরে রাখার কথা। বললে ওরা বিশ্বাস করত না, বরং পাগল ভাবত আমাকে। ভাবত, ভয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার, আয়ানের মত।

ঘণ্টাখানেক ধরে পুকুরে খোঁজাখুঁজি করল ওরা। কিন্তু আকুকে পাওয়া গেল না। সবার শেষে পানি থেকে উঠলেন কোচ রনসন। খুলে রাখা শার্টটা দিয়ে গায়ের পানি মুছে আমার আর ফারিহার পাশে বসলেন। বললেন, 'কি হয়েছিল, সব খুলে বলো।'

অফিসারকে যা যা বলেছিলাম, তাঁকেও সেসবই বললাম, কিছু কথা বাদ দিয়ে। কথার মাঝখানে আচমকা শিউরে উঠল ফারিহা। চিৎকার করে উঠল। তাড়াতাড়ি ওর শরীরে তোয়ালে জড়িয়ে দিলেন কোচ। আমাদের প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনলেন তিনি, সরাসরি তাকিয়ে, সব সময় যা তিনি করে থাকেন। আমাদের কথা শেষ হলে জিজ্ঞেস করলেন, 'আকুর পুরো নামটা জানো? ওর বাবা-মাকে খবর দিতে হবে।'

'আকিয়ানো কোলম্যান,' আমি বললাম।

বরফের মত শীতল হয়ে গেল কোচের চোখ দুটো। এমন ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালেন, যেন দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ মানুষ আমি। কঠিন গলায় বললেন, 'আকিয়ানো কোলম্যান?'

এ ভাবে বদলে গেলেন কেন তিনি, বুঝতে পারলাম না। তবে তাঁর দিকে তাকাতে সাহস হলো না আর। ভয়ে ভয়ে বললাম, 'তাই তো বলল। ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

উঠে দাঁড়ালেন কোচ। তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। কাঁপছেন। কিন্তু কথা যখন বললেন, কণ্ঠস্বর শান্ত, 'মুসা, তুমি একটা অত্যন্ত খারাপ ছেলে। তোমাকে আর ফারিহাকে টীম থেকে বাদ দিলাম আমি, চিরকালের জন্যে।'

ভাবনা গুলিয়ে গেল আমার। কিছুই মাথায় ঢুকল না। এ ভাবে খেপে গেলেন কেন কোচ? জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল। কথা জোগাল না মুখে। অনেক চেষ্টার পর জোর করে শুধু বলতে পারলাম, 'কেন?'

'তুমি জানো, কেন।'

বড়দের এ রকম রহস্য করে কথা বলা আমার ভাল লাগে না। মাথা নেড়ে বোঝালাম, জানি না। ফারিহা এতটা ঘাবড়ে গেছে, মাথাও নাড়তে পারল না।

'জানো না, না?' কোচ বললেন। 'যতই সাধু সাজার ভান করো না কেন, আর বিশ্বাস করতে পারছি না তোমাকে। কথাটা কোথায় শুনেছ, এ রকম মজা করার ইচ্ছেই বা কেন জাগল, বুঝলাম না। প্রয়োজনও নেই। মিথ্যে কথা বলে

পুলিশকে ভোগানোর জন্যে তোমাকে অ্যারেস্ট করলাম না, তবে তোমার বাবাকে আমি সব জানাব। বিচার যা করার তিনিই করবেন।'

'কি-ক্কি বলছেন...' তোতলাতে শুরু করলাম। 'আমি মি-মি-মি-মিথ্যে বলতে যাব কেন?'

ভাবসাব দেখে মনে হলো চড় মেরে বসবেন কোচ। মুঠো হয়ে গেল হাতের আঙুল, মুখ টকটকে লাল। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আকিয়ানো কোলম্যান নিখোঁজ হয়েছে পাঁচ বছর আগে।'

'নিখোঁজ?'

'এমন ভঙ্গি করছ যেন কিছুই জানো না?'

'না, স্যার, সত্যি জানি না! খোদার কসম!'

আমার কথায় কান দিলেন না কোচ। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলেন।

সাত

পাঁচ বছর! আকু নিখোঁজ হয়েছে পাঁচ বছর আগে! বিশ্বাস করতে পারলাম না। অসম্ভব! এ হতে পারে না। এতকাল আগে ও হারিয়ে গিয়ে থাকলে কিছুতেই ওকে দেখতে পাওয়ার কথা নয় আমাদের। পুকুরে যাকে দেখেছি, সে নিখোঁজ হওয়া আকু হতে পারে না। সে অন্য ছেলে। এক নামে কি দুজন থাকতে পারে না? একটা ব্যাপার অবশ্য হতে পারে, পুকুরে যাকে দেখেছি সেও জানে হারানো ছেলেটার কথা, মজা করার জন্যে মিথ্যে করে ওই নাম বলেছে আমাদের।

কোচ রনসন বাবার সঙ্গে দেখা করে সব বলে দিলেন। বাবার চেয়ে বেশি রেগে গেল মা। কোচের কথা বিশ্বাস করল। অনেক বকাবকি করল আমাকে আর ফারিহাকে। কোনভাবেই তাকে বোঝাতে পারলাম না যে আমরা মিথ্যে বলিনি। বড়রা এমনই। নিজেরা যেটাকে ঠিক বলে মনে করে, ভুল হলেও সেটাই ঠিক, হাজার বলেও তাদের ধারণা পাল্টানো কঠিন। হাল ছেড়ে দিলাম। শাস্তি ঘোষণা করল মা—পুরো এক মাস বাড়ির সীমানার বাইরে কোথাও যেতে পারব না আমরা। জেলখানা। পুকুরে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য মানা না করলেও যেতাম না। পুকুরে যাওয়ার ইচ্ছে একেবারে দূর হয়ে গিয়েছিল আমাদের। তখন বরং ভেবে আফসোস হচ্ছিল—কোন কুক্ষণে যে পুকুরটা চোখে পড়েছিল ফারিহার!

জীবনে অত খেপিনি আমি। জ্বালা করছিল মাথার মধ্যে। বার বার মনে হতে লাগল, আমাদের ওপর অন্যায় করা হয়েছে। ভীষণ অন্যায়। সত্যি কথা বলতে গিয়েছিলাম, যা করা উচিত সেটা করতে গিয়েছিলাম, অথচ মিথ্যে দোষ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে আমাদের ঘাড়ে। একমাসের জেলখানাই একটা বিরাট শাস্তি, তার ওপর অকারণে টীম থেকে বের করে দেয়া—সহ্যের বাইরে! আমাদের কপালে আরও খারাবি আছে। যখনই অন্য ছেলেমেয়েরা শুনবে মিথ্যে কথা বলার অপরাধে টীম থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, আমাদের সঙ্গে মেশা বন্ধ করে দেবে ওঁরা।

কোচ ওদের ধারণা দেবেন, আমরা আয়ানের চেয়ে খারাপ। ওরাও সেটা বিশ্বাস করবে। একঘরে করবে আমাদের। মিডলেকে বাস করাই মুশকিল হয়ে যাবে।

মনকে এই ভেবে সান্ত্বনা দিলাম, আমাদের চেয়েও আকুর ভাগ্য খারাপ। পুকুরে ডুবে মারা গেল সে। অথচ কেউ বিশ্বাস করবে না সেকথা। কেউ আর খুঁজতে যাবে না। ওর লাশটাও তুলে আনা হবে না। নিখোঁজদের তালিকায় নাম উঠবে ওর।

সত্যি কি ওর নাম আকিয়ানো? হলেই বা কি? ও তখন মৃত। মৃত মানুষের নাম যাই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ওর লাশটা অন্তত তুলে আনা উচিত ছিল। সংকারের ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু কি ভাবে? আমার একার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। ফুলে যদি ভেসে ওঠে, তাহলে একটা কথা।

চকিতে আশার আলো ঝিলিক দিয়ে গেল মনে। ফুলে যদি ভেসে ওঠে! হ্যাঁ, তাহলে আমরা যে মিথ্যে বলিনি এটা প্রমাণ হয়ে যাবে। কিন্তু কখন ভাসবে? যদ্দূর শুনেছি, পানিতে মরা মানুষ ভেসে উঠতে কয়েক ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। কিন্তু পরক্ষণে আরেকটা কথা ভেবে দমে গেলাম। যদি পানির নিচে কোন কিছুতে আটকে গিয়ে থাকে?

ভাগ্যের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে সেরাতে ঘুমাতে গেলাম। পরদিন সকালে বাবা-মা অফিসে চলে গেল। সিঁড়িতে বসে বসে পড়ার চেষ্টা করছি, কিছুতেই বইয়ে মন বসছে না, এই সময় সাইকেল চালিয়ে এল ডরোথি। ঘরে বসে ছবি আঁকছে ফারিহা। আমার যেমন বই পড়তে ভাল লাগছে না, ওরও তেমন ছবি আঁকতে ভাল লাগছে না। কিন্তু কি করব? বাড়ির সীমানা থেকে আমাদের বেরোনো নিষেধ। আগের দিনের ঘটনার পর লুডু-কেরম কিছু খেলতেও বিরক্ত লাগছে।

ডরোথিকে দেখে খুশি হলাম। বললাম, 'বেশিক্ষণ এখানে থাকা চলবে না তোমার। কারও সঙ্গে কথা বলাও মানা আমাদের। মা মানা করে দিয়েছে। জেলের শাস্তি।'

আমার কথায় কান দিল না ডরোথি, 'কাল কি ঘটেছে, শুনেছি।'

'কোথায়? পত্রিকায়? হেডিং কি? মিডলেকে নবাগত ছেলের পুলিশের সঙ্গে রসিকতা?'

'তুমি রেগে আছ। শান্ত হও। পত্রিকায় দেয়নি। আম্মার কাছে শুনেছি। আমার আম্মা দমকল অফিসে চাকরি করে। তোমার সঙ্গে আমাকে মিশতে মানা করে দিয়েছে।'

'তা তো দেবেই! জানতাম!' ঠাস করে বইটা বন্ধ করলাম। 'কিন্তু আমি কিছু করিনি!'

'আম্মা বলল, করেছ।'

'ভুল বলেছেন! সবাই ভুল করছে! একটা কথাও বানিয়ে বলিনি আমরা। একটা ছেলের সঙ্গে সত্যি দেখা হয়েছে পুকুরে। ডুবে মারা গেছে ও। নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম, প্রথমে বলল আকু। ভাল নাম জিজ্ঞেস করায় বলল আকিয়ানো কোলম্যান।'

'কিন্তু আকিয়ানো তো...'

'জানি, বলবে পাঁচ বছর আগে নিখোঁজ হয়েছে।' ডরোথির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমিও ভাবছ আমরা মিথ্যে কথা বলেছি?'

মাথা নাড়ল ডরোথি, 'ভাবলে তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে আসতাম না।'

'আকিয়ানোকে তুমি চিনতে?'

'চিনতাম, তবে খাতির ছিল না। আমি ওর চেয়ে ছোট ছিলাম। ও পড়ত থার্ড গ্রেডে, আমি সেকেণ্ড। সুইমিং টীমে ছিল ও। তখন ওর বয়েস আট। ওই বয়েসেই খুব ভাল সাঁতরাতে পারত।'

আট! যে ছেলেটাকে পুকুরে দেখেছি ওর বয়েসও আট! জিজ্ঞেস করলাম, 'কোচ রনসন ওকে চিনতেন?'

'হ্যাঁ। আকু নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার পর অনেক খোঁজাখুঁজি করেছেন। কেসটার দায়িত্ব তাঁর ওপরই দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পাওয়া যায়নি ওকে। আম্মা বলে, এ কারণে একটা অপরাধবোধ রয়ে গেছে তাঁর মনে। তোমার ওপর এ জন্যেই এতটা খেপে গিয়েছেন। তিনি ভেবেছেন, তাঁর দুর্বলতাটা জেনে গিয়ে রসিকতা করেছ তুমি।'

'কিন্তু সত্যি বলছি, আমি রসিকতা করিনি। কালকের আগে আমি আকুর নামই জানতাম না।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি। শান্ত হও।'

যাক, একজন অন্তত আমাকে বিশ্বাস করেছে। অনেক প্রশ্ন ভিড় করে এল মনে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আকু দেখতে কেমন ছিল?'

'কালো চুল। কালো চোখ। সুন্দর চেহারা। ভাল স্বাস্থ্য।'

মিলে যায়। পুরোপুরি মিলে যায় আগের দিনে দেখা ছেলেটার সঙ্গে। এ কি ভূতুড়ে কাণ্ড! বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না। বাবা-মা প্রায়ই বলে, ভূত বলে কিছু নেই। কিন্তু আমার ধারণা, আছে। এতকাল ধরে এত লোকে যখন বিশ্বাস করে এসেছে, কিছু না কিছু একটা নিশ্চয় আছে। আলোচনার খাতিরে ফারিহাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ডরোথি, কালকের ছেলেটা কে বলো তো? আকিয়ানো কোলম্যান?'

'ভূত ভাবছ নাকি?'

'ভাবছি। হতে পারে না?'

'ভূত বলে কিছু নেই।'

'অনেকেই বলে সেকথা। কিন্তু নিজের চোখে যা দেখলাম অবিশ্বাস করি কি ভাবে?'

যা যা ঘটেছে, সব খুলে বললাম ওকে। আমার অদ্ভুত অনুভূতির কথা, পানির নিচে অদৃশ্য কিছু ফারিহাকে টেনে ধরে রাখার কথা, কিছুই বাদ দিলাম না ডরোথির কাছে।

চুপচাপ শুনল ও। আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল না, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে এমন ভঙ্গি করল না। বরং ভয় ফুটতে দেখলাম ওর চোখে। বলল, 'যদি তাই হয়, ওটা আকুর ভূত হয়, ফারিহার দিকে নজর দিল কেন?'

'বুঝতে পারছি না।'

'আচ্ছা, লকেটটা নিতে চেয়েছে বললে, ওটার জন্যে নয় তো?'

তাই তো! এ কথাটা তো মনে হয়নি! আস্তে মাথা ঝাঁকালাম, 'হতে পারে। কাল ওটা কেড়ে নিতে চেয়েছিল আকু। বার বার বলছিল, ওটা ওর। ফারিহা দিতে চায়নি বলেই ঝগড়া বাধিয়েছে। ওকে টেনে নিয়ে গেছে পানির নিচে। দাঁড়াও, ভালমত দেখা দরকার ওটা।'

উঠে গিয়ে ফারিহার কাছ থেকে নিয়ে এলাম লকেটটা। প্রথমে দিতে চাইল না। কিন্তু কেন দেখতে চাইছি যখন খুলে বললাম, এক মুহূর্ত দেরি না করে খুলে দিল। পিতল পালিশের শিশি আর ন্যাকড়া নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

শক্ত হয়ে লেগে থাকা কালো-সবুজ পদার্থগুলো ঘষে সরাতে সময় লাগল। তিনজনে মিলে ঘষলাম আমরা। পুরোপুরি সাফ করলাম ময়লা।

হাতের তালুতে রেখে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বলল ডরোথি, 'সুইমিং মেডাল। এ রকম জিনিস দেখেছি আমি।'

ও ঠিকই বলেছে। আমিও দেখেছি। লকেটের একপিঠে খোদাই করে আঁকা রয়েছে পানিতে একজন সাঁতারুর ছবি। অন্য পিঠে লেখা আকিয়ানো কোলম্যানের নাম।

'লকেটটা আকুরই,' ডরোথি বলল। 'মিথ্যে বলেনি ও।'

'মুসা,' ভয় পেয়ে গেছে তখন ফারিহা, 'পুকুরের ছেলেটার কথা বলছে?'

'আমি জানি না। হতে পারে। সেজন্যেই নেয়ার জন্যে এত চাপাচাপি করছিল।'

'তাহলে ওর জিনিস ওকে দিয়ে দেব। আমি আর চাই না এটা।'

'দেব, তবে কোচ রনসনকে এটা দেখানোর পর। চিরকাল তাঁর কাছে মিথ্যেবাদী হয়ে থাকতে চাই না।'

'চলো তাহলে এখনই যাই। টীম থেকে তাড়িয়ে দিল। ঘরে আটকে থাকতে হচ্ছে। এই শাস্তি আর ভাল লাগছে না।'

ডরোথি বলল, 'তোমাদের তো বেরোনো নিষেধ। আমি বরং নিয়ে গিয়ে দেখাই তাঁকে।'

'না,' আমি বললাম, 'তোমাকে আর বিপদে ফেলতে চাই না। আমি নিজেই যাব। আমরা যে মিথ্যে বলিনি তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করব। পারলে তুমি বরং আরেকটা কাজ করে দাও যদি সাহস হয়।'

'কি?'

'সাইকেল নিয়ে গিয়ে চট করে দেখে এসো একবার, কোন লাশ ভেসেছে কিনা।'

'যদি না ভাসে?'

'তাহলে শিওর ওটা ভূত, আর কোন সন্দেহ থাকবে না।'

'ওটা ভূতই,' ফারিহা বলল। 'লকেটটা এখুনি পুকুরে ফেলে দিয়ে আসা উচিত। আকুকে আর কষ্ট দেয়ার কোন মানে হয় না।'

'দেব। ভূত হলে তবে।'

পুকুরে গিয়ে দেখে এল ডরোথি। ওর সাহসের প্রশংসা করতে হবে। ওই বনের

মধ্যে একা একটা পুকুর পাড়ে গিয়ে লাশ ভেসে থাকতে দেখার কথা ভাবলেই গা ছমছম করে, তার ওপর রয়েছে ভূতের ভয়।

নিরাপদেই ফিরে এল সে। জানাল, কোন লাশ দেখতে পায়নি। আমি জানতাম, পাবে না, তবু পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে পাঠিয়েছিলাম ওকে।

আট

রাতে ছাড়া দেখা করা যাবে না কোচের সঙ্গে। তাঁর অফিস কোথায় জানি না। দেখা করতে হলে স্কুলে যেতে হবে, যেখানে সুইমিং প্র্যাকটিস হয়। তখন বাড়ি ফিরে আসবে মা। তাকে জানিয়ে যাওয়া যাবে না। যেতে দেবে না। তাকে না জানিয়ে গোপনে যেতে হবে।

সুতরাং সন্ধ্যায় খাওয়ার পর মা-বাবা যখন কাজে ব্যস্ত হলো, আমাদের বেডরুমের জানালা গলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলাম আমি। বাড়ি থেকে স্কুল বেশ খানিকটা দূরে, পাঁচ মাইল। তবে সাইকেলে চেপে যেতে বেশি সময় লাগে না। তাড়া ছিল বলে আমার লাগল আরও কম।

ভেতরে ঢুকলাম না। বলা যায় না কি মেজাজে আছেন কোচ। আমাকে দেখলে হয়তো চিৎকার শুরু করবেন। ঘাড় ধরে বেরও করে দিতে পারেন টীমের ছেলেমেয়েদের সামনে। অত অপমান সইতে পারব না। তা ছাড়া আর কেউ লকেটটার কথা জানুক, তাও চাই না। ডরোথি কথা দিয়েছে, কাউকে বলবে না। ওকে বিশ্বাস করি আমি।

পার্কিং লটে অল্প কয়েকটা গাড়ি। বেশির ভাগই পুলে প্র্যাকটিস করতে আসা ছেলেমেয়েদের বাবা-মার। কোচ রনসনের গাড়িটা খুঁজে বের করে ওটার কাছে লুকিয়ে রইলাম। চোখ সুইমিং পুলের দিকে। কারা কারা ঢুকছে-বেরোচ্ছে সব দেখতে পাচ্ছি।

প্র্যাকটিসের পর বেরিয়ে আসতে লাগল ছেলেমেয়েরা। যারা সাইকেলে করে এসেছে, যার যার সাইকেল নিয়ে চলে গেল। যারা বাবা-মায়ের সঙ্গে এসেছে, তারা গাড়িতে করে গেল। কেউ দেখতে পেল না আমাকে।

সবার শেষে বেরোলেন কোচ। সব সময় তাই করেন। ভাল করে দেখে নেন, কেউ ভেতরে রয়ে গেল কিনা। সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে কিনা। খুব গোছানো স্বভাবের লোক তিনি। কড়া নজর।

গাড়ির কাছে এসে দাঁড়ালেন। চাবি বের করলেন পকেট থেকে। দরজা খোলার জন্যে তালায় চাবি ঢুকিয়েছেন, এই সময় ডাকলাম, 'স্যার?'

চমকে গেলেন তিনি। হাত চলে গেল কোমরের কাছে। তবে হোলস্টার নেই ওখানে। সাঁতারের ট্রেনিঙের সময় ইউনিফর্ম পরে আসেন না, রিভলভারও রেখে আসেন। আমার তখন মনে হলো, আনেননি, ভাল করেছেন, নইলে হয়তো গুলি খেয়ে মরতে হত আমাকে। মনে মনে গাল দিলাম নিজেকে—আমি একটা গাধা!

চুপি চুপি একজন পুলিশ অফিসারের পেছনে গিয়ে ওভাবে চমকে দেয়াটা মোটেও ঠিক হয়নি।

ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। বরফের মত শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি চাই?'

'আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে এনেছি, স্যার।'

পকেট থেকে লকেটটা বের করে তাঁর হাতে দিলাম। উল্টেপাল্টে দুটো পিঠই দেখলেন তিনি। আলোর নিচে নিয়ে খোদাই করা নামটা দেখলেন। মুখ তুলে তাকালেন আমার দিকে, 'কোথায় পেলে?'

'আমি না, ফারিহা পেয়েছে। পুকুরে, পানির নিচে। আকিয়ানো কোলম্যানের লকেট।'

'এটা পেয়েই শয়তানিটা করেছ? বানিয়ে বলেছ সব?'

'না, স্যার, সত্যি বলছি, একটা কথাও বানিয়ে বলিনি! সব সত্যি। প্রমাণ করতে পারব। আপনি বুঝতে পারছেন না? আকু এটা ফেরত চাইছে। ওই পুকুরের মধ্যেই থাকে ও। কাল ফারিহাকে এই লকেটের জন্যেই চুবিয়ে মারতে চেয়েছে।'

'পুকুরে কেউ নেই!' ধমকে উঠলেন কোচ। আবার মুঠো হয়ে গেছে হাতের আঙুল। 'কাল তোমার সামনেই প্রচুর খোঁজাখুঁজি করেছি, দেখেছ। খুঁজেছি পাঁচ বছর আগেও, যখন আকিয়ানো নিখোঁজ হয়েছিল।'

'কিন্তু ওর লকেট পাওয়া গেছে পুকুরে...'

'তাতে কি? সাঁতার কাটতে গিয়ে হারিয়েছিল হয়তো। গলা থেকে খুলে পড়ে গিয়েছিল। এতে প্রমাণ হয় না যে ওই পুকুরে ডুবেই মারা গেছে ও, ওর প্রেতাত্মা এখনও ঘুরে বেড়ায় পুকুরের পানিতে, মানুষ নামলে চুবিয়ে মারতে চায়। ভূত বলে কিছু নেই!'

'কিন্তু...'

'কোন কিন্তু নেই!' লকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কোচ। 'আকিয়ানো কোলম্যানের কথা মন থেকে দূর করো। টীমে ফিরে আসার কথা ভুলে যাও। আর কোন আশা নেই, অন্তত আমি যতদিন এই টীমের কোচ। যাও, বাড়ি যাও। কোনদিন এখানে আসবে না আর। তোমার মুখ দেখতে চাই না আমি।'

গাড়িতে উঠে চলে গেলেন তিনি। পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপর লকেটটা খুঁজতে লাগলাম। বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হলো না। চাঁদের আলোয় চকচক করছে ওটার রূপালী পিঠ। তুলে নিয়ে পকেটে ভরে বাড়ি রওনা হলাম। আমাকে ঢুকতে দেখে ফেলল মা। শাস্তির মেয়াদ আরও সাতদিন বাড়িয়ে দিল। তাতে কোন রকম প্রতিক্রিয়া হলো না আমার। অধিক শোকে পাথর হয়ে গেছি তখন আমি। একটা চাপা যন্ত্রণা গুমরে ফিরতে লাগল মনের মধ্যে।

ঘরে ঢুকে দেখলাম ফারিহা ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাকলাম না ওকে। এত রাতে জাগানোর কোন প্রয়োজন নেই। যা বলার কাল সকালেও বলতে পারব। নিজের বিছানায় বসে লকেটটা হাতের তালুতে রেখে দেখতে লাগলাম। জিনিসটা সুন্দর। আমার হলেও কাউকে দিতে চাইতাম না। কেউ নিয়ে গেলে কেঁদে আনার চেষ্টা

করতাম। তবে এর জন্যে কাউকে চুবিয়ে মারতে যেতাম না, এটা ঠিক। কিংবা গাড়ির নিচে ফেলেও মারার চেষ্টা করতাম না।

ওই মুহূর্তে মনে হলো, আকুই আয়ানকে গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে মারতে চেয়েছিল। রাস্তার ওপর সাইকেলের সামনে এমন করে এসে দাঁড়িয়েছিল যাতে হ্যাণ্ডেল ঘোরাতে বাধ্য হয় সে। গুঁতো খায় গাড়ির গায়ে। লকেটটা ফেরত পাওয়ার জন্যে খুন করতে দ্বিধা নেই আকুর। তখন পর্যন্ত কাউকে করতে পারেনি যদিও। নেহায়েত ভাগ্য ভাল বলে বেঁচে গেছে ফারিহা আর আয়ান। ওটা না পেলে আরও কি করবে আকু, কে জানে! ভূতের কোন বিশ্বাস নেই। যা খুশি করে বসতে পারে। সুতরাং দেরি না করে, আরও ভয়াবহ কোন বিপদ ঘটে যাওয়ার আগেই কাল সকালে গিয়ে ওর লকেটটা ফেরত দিয়ে আসতে হবে, ভাবলাম। পারলে তখনই যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অত রাতে আর বেরোতে ইচ্ছে করল না। এমনিতেই কোচের দুর্ব্যবহারে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে আছে। তার ওপর রাতের বেলা বনের ভেতর দিয়ে একটা ভূতুড়ে পুকুরে যাওয়ার সাহসও করে উঠতে পারছিলাম না।

আমার বিছানার পাশে একটা উঁচু তাক আছে। ওপরের অংশটা ছাতের ফুট দুয়েক নিচে। ওখানে কফির টিনে ভরে পেরেক রেখে দিয়েছে বাবা। নিরাপদে রাখার জন্যে লকেটটা সেই টিনে রেখে দিলাম। শুধু যে নিরাপত্তার জন্যে ওখানে রাখলাম তা নয় ওটার দিকে তাকাতেও তখন অস্বস্তি লাগছিল। থাক, আড়ালেই থাক।

শুয়ে পড়লাম বিছানায়। চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগলাম। ইস্, আবার যদি টীমে ফিরে যেতে পারতাম! কোনভাবে যদি কোচকে বিশ্বাস করাতে পারতাম আমি মিথ্যে বলিনি!

বৃষ্টি পড়তে লাগল। ঘুমিয়ে পড়লাম।

নয়

'ভূত বলে কিছু নেই!'

লকেটটা ছুঁড়ে পানিতে ফেলে দিলেন কোচ রনসন। টুপ করে তলিয়ে গেল ওটা।

চিৎকার করে কাঁদতে লাগল ফারিহা। কেঁদে কেঁদে বলল, 'আমার লকেট! আমি নিজের হাতে দিতে চেয়েছিলাম আকুকে!'

হেসে উঠল আয়ান। ঠেলতে ঠেলতে ফারিহাকে নিয়ে চলল পানির কিনারে। খিকখিক করে হেসে বলছে, 'যাও না, নিজেই তুলে আনো না ওটা পানি থেকে খুকি।

অসহায় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ফারিহা। কিন্তু আমি কিছু করতে পারছি না। নড়তে পারছি না, শব্দ করতে পারছি না।

এক ধাক্কা মেরে ওকে পানিতে ফেলে দিল আয়ান। কোনমতে সোজা হলো ফারিহা। তীরের দিকে না এসে গভীর পানির দিকে সাঁতরে চলল। লকেটটা যেখানে ডুবেছে সেখানে পৌঁছে থামল। ডুব দিল ওটা তুলে আনার জন্যে।

আমি অপেক্ষা করছি, অপেক্ষা করছি, কিন্তু উঠে আর আসছে না ফারিহা।

'কোচ, স্যার,' অনেক চেষ্টায় কথা ফুটল আমার মুখে, 'কোচ, ও মারা যাচ্ছে! চুবিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে আমার বোনটাকে!'

আমার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কোচ রনসন, 'পুকুরে কেউ নেই।'

'ফারিহা আছে! ফারিহা! ফারিহা!'

একটিবারের জন্যেও ঘুরে তাকালেন না তিনি। ফারিহাকে সাহায্য করতে গেলেন না। আমি যেতে পারি, কিন্তু পানিতে নামতে ভয় লাগছে। সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে শেষে পা বাড়ালাম। ফারিহাকে মরতে দিতে পারি না। পানিতে পা রাখলাম। এক পা, দু-পা করে নামতে নামতে হাঁটু পানি, কোমর পানি, শেষে বুক পানিতে নেমে গেলাম। ডুব দিয়ে সাঁতরাতে লাগলাম। চোখ খোলা রেখেছি। আশপাশে নিচে তাকিয়ে খুঁজছি ফারিহাকে।

ওই তো! ওই যে! দেখতে পেলাম ওকে। অসংখ্য লতা ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ধরেছে, টেনে রেখেছে নিচের দিকে। দ্রুত সাঁতরে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার হাতে-পায়ে লতার ছোঁয়া লাগছে, পিচ্ছিল সবুজ পদার্থ লেগে যাচ্ছে। কোন দিকে নজর নেই আমার। একমাত্র চিন্তা, কি করে ফারিহাকে বাঁচাব। এগিয়ে যেতে লাগলাম ওর আরও কাছে যাতে হাত চেপে ধরে টান দিতে পারি।

সামনে পড়ল আয়ান। চোখ খোলা, মুখ হাঁ করা। লতার দঙ্গলে আটকা পড়ে দমবন্ধ হয়ে মারা গেছে ও। ঠেলা দিয়ে ওকে সরিয়ে সাঁতরে এগোলাম ফারিহার দিকে। কিন্তু সরে গেল ও। কিসে যেন হ্যাঁচকা টান মেরে ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিল। ছুঁতে পারলাম না। লকেটটা ওর গলায় ঝুলছে। আমাকে কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল। কিন্তু কথা বলতে পারল না পানির জন্যে। বুদ্বুদ বেরিয়ে ওপর দিকে উঠে গেল। আরও শক্ত করে পেঁচিয়ে ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর লতাগুলো। এই সময় ওর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল আকু। আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসল।

'ওই লকেট আমার!' শুনতে পেলাম আকুর চিৎকার। 'তুমি ওটা চুরি করেছ! কেড়ে নিয়েছ আমার কাছ থেকে!'

পানিতে লাথি মেরে গতি বাড়িয়ে ফারিহাকে ধরার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। ওকে সরিয়ে নিল আকু। আর বুঝি ওকে বাঁচাতে পারলাম না! বুদ্বুদ বেরোচ্ছে না আর ফারিহার মুখ থেকে। চোখ দুটো খোলা। কিন্তু আমি জানি, দেরি হয়ে গেছে অনেক। বুঝতে পারছি, মারা গেছে আমার ছোট বোনটা। চিৎকার করে উঠতে গেলাম। স্বর বেরোল না। নাকমুখ দিয়ে পানি ঢুকে আমার দম আটকে দিল...

ঝটকা দিয়ে উঠে বসলাম বিছানায়। জোরে জোরে শ্বাস টানছি। চাদরটা পেঁচিয়ে গেছে গায়ে। লাথি মেরে সরালাম। দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম এতক্ষণ।

সকাল হয়ে গেছে। বাইরের গাছপালা আর সবুজ ঘাস চোখে পড়ছে। বৃষ্টি হচ্ছে। পানির ধারা গড়িয়ে নামছে জানালার কাঁচ বেয়ে। ডুবে যাইনি ঠিক, ফারিহাও ডুবে মরেনি, কিন্তু স্বপ্নের ওই ভয়ঙ্কর সেই অনুভূতিটা তখনও দূর হয়নি মাথা থেকে, রয়ে গেছে।

ফারিহার বিছানার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম। ধড়াস করে উঠল বুক। ও নেই বিছানায়। আতঙ্ক এসে আবার চেপে ধরতে চাইল। নিজেকে বোঝালাম ভয় পাওয়ার কিছু নেই। খুব ভোরে ওঠে ফারিহা। বাথরুমে গেছে। নয়তো লিভিং রুম কিংবা রান্নাঘরে। ও বিছানায় নেই বলেই যে সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে এমন ভাবার কোন কারণ নেই।

কিন্তু স্বস্তি পেলাম না। শান্ত হতে পারলাম না। স্বপ্নের রেশ কাটেনি তখনও মগজ থেকে। উঠে গেলাম। লিভিং রুমে পেলাম না ওকে। রান্নাঘরে, এমনকি বাথরুমেও নেই। বাবা-মা চাকরিতে চলে গেছে। ফারিহার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম। সাড়া এল না। বাড়িতে শুধু আমি, একা।

দৌড়ে ফিরে গেলাম আমাদের শোবার ঘরে। খাটের ওপর দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে তাক থেকে নামিয়ে আনলাম কফির টিনটা। বিছানায় ঢেলে দিলাম ভেতরের সমস্ত পেরেক। চাদরের ওপর ছড়িয়ে পড়ল ওগুলো। লকেটটা নেই। অবাক লাগল। এত ওপর থেকে পাড়ল কি করে ফারিহা? ও নিয়ে বেশি ভাবলাম না। পাড়ুক যে ভাবেই, আসল সত্যটা হলো ওটা নেই। লকেটও নেই, সেও নেই। কোথায় গেছে জানি আমি। সেই পুকুরে! আকুর কাছে!

কাপড় বদলানোর সময় নেই। বৃষ্টির মধ্যেই ছুটে বেরোলাম ঘর থেকে। ফারিহার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে দৌড়ে চললাম বনের ভেতরের কাঁচা রাস্তা দিয়ে। জবাব পেলাম না। আরও জোরে ছুটতে লাগলাম। পায়ে জুতো নেই। চোখা পাথর, রাস্তায় পড়ে থাকা শুকনো ডালের মাথা আর পাইন নীডলের খোঁচা লাগছে খালি পায়ে। কেয়ার করলাম না। ব্যথাও লাগছে না। শরীরের সমস্ত বোধশক্তিও যেন নষ্ট হয়ে গেছে প্রচণ্ড ভয়ে।

গাছপালার ভেতর থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে এলাম পুকুর পাড়ে। ফারিহাকে দেখতে পেলাম। পাজামা পরেই চলে এসেছে। গলায় ঝুলছে লকেট। পানিতে নেমে পড়েছে। এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছে গভীর পানির দিকে। সাঁতার কাটছে না। কোমর পানি, বুক পানি, গলা পানি···মাথাও ডুবে গেল পানিতে। কোন খেয়ালই নেই যেন। চিৎকার করে ওর নাম ধরে ডাকলাম। ফিরে তাকাল না। যেন শুনতে পায়নি।

ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম পানিতে। ডুব দিয়ে সাঁতরে এগোলাম। ফারিহা যেখানে তলিয়ে গেছে সেখানে পৌঁছেও ওকে দেখতে পেলাম না। একনাগাড়ে পানিতে আঘাত হানছে বৃষ্টির ফোঁটা। কাদা উঠে ঘোলা করে দিয়েছে পানি। কিছুই দেখা যায় না। সাঁতার কাটার জন্যে সামনে বাড়িয়ে দেয়া আমার হাত দুটো পর্যন্ত ঠিকমত দেখতে পাচ্ছি না।

ভেসে উঠে দম নিয়ে আবার ডুব দিলাম। পাগলের মত হাতড়াতে লাগলাম চারপাশের পানিতে। হাতে লাগল শক্ত কিছু। খামচে ধরে টান দিলাম। ফারিহার

একেবারে মুখের কাছে চলে গেল আমার মুখ। নড়ল না ও। হাঁ করে আছে, স্বপ্নে যেমন দেখেছি। তবে তাতে ভয় নেই। চোখ খোলা, যেন খুলে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছে। লতা পেঁচিয়ে আছে সারা গায়ে। টান দিয়ে সরানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু লতা ছিঁড়ল না।

আরও নিচে নেমে গিয়ে আগের বারের মতই হ্যাঁচকা টানে গোড়া উপড়ে আনার চেষ্টা করলাম। কাজ হলো না। অনেক টানাটানি করেও একটা লতা ছিঁড়তে পারলাম না। দম ফুরিয়ে গেল। ভেসে উঠে দম নিয়ে আবার ডুব দিলাম। সারাক্ষণ আমার একটাই দুর্ভাবনা, ফারিহা আটকে আছে লতার মধ্যে। ওকে বাঁচাতে পারব না। ও মারা যাচ্ছে।

নিচে নেমে ফারিহাকে ধরে ঝাঁকুনি দিলাম। ওকে জাগানোর চেষ্টা করলাম। কোন ভাবান্তর হলো না ওর। একই ভাবে শরীর ঢিল দিয়ে ঝুলে আছে পানিতে। জ্যান্ত সাপের মত ওর গলা পেঁচিয়ে ধরেছে লতাগুলো, ওকে শ্বাসরোধ করে মারতে চলেছে। ওগুলোর মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে টেনে ছেঁড়ার চেষ্টা চালালাম। কোন লাভ হলো না। একটা লতাও ছিঁড়তে পারলাম না। আমার আঙুলও পেঁচিয়ে ফেলে চাপ দিতে আরম্ভ করল ওগুলো।

আমার পা পেঁচিয়ে ধরল লতা। বাহু পেঁচাতে শুরু করল। ঝটকা দিয়ে এদিক ওদিক সরিয়ে হাত দুটো মুক্ত রাখতে পারলাম, কিন্তু পা আটকে ফেলেছে। আটকাক। পরে দেখা যাবে কি করতে পারি। আগে ফারিহাকে মুক্ত করা দরকার। ওর হাতে পেঁচানো লতাগুলো দুদিক থেকে চেপে ধরে টেনে ছিঁড়তে চাইলাম। সেই আগের মত অবস্থা। একটা লতাও ছিঁড়ল না। ফারিহার বুকে লকেটটা দুলছে অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

লকেট! বিদ্যুতের মত ভাবনাটা ঝিলিক দিয়ে গেল মাথায়। ওই লকেটটাই চায় আকু, ফারিহাকে নয়! ওটা ওকে দিয়ে দিলেই···

আমাকে ফারিহার কাছ থেকে টেনে সরিয়ে নিতে শুরু করেছে লতাগুলো। থাবা মেরে ধরার চেষ্টা করলাম লকেটটা। ফসকে গেল। আবার থাবা মারলাম। আঙুলে বাঁধতেই আরেকটু বাড়িয়ে চেপে ধরলাম।

ঠিক এই সময় চোখে পড়ল আকুকে!

আমাদের সঙ্গেই আছে ও, এতক্ষণ দেখিনি। ফারিহার পেছনে ওর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে আছে, স্বপ্নে যেমন দেখেছিলাম। ও নড়ছে না। তবে লতাগুলো যে ওর ইচ্ছেতেই কাজ করছে, সেটা বুঝতে পারছিলাম। চিৎকার করছে না ও। কথা বলার জন্যে মুখ খুলছে না। কিন্তু আমার কানের মধ্যে টেলিফোন রিসিভারের শব্দের মত কে যেন বলে গেল, 'ওটা আমার!'

লকেটটা ধরে হ্যাঁচকা টান মারলাম। ছিঁড়ল না। আবার টানলাম। ছিঁড়তেই হবে। আবার, আবার। ছিঁড়ে গেল চেন। পানির মধ্যেই আমার হাতটাকে টেনে এনে যতটা জোরে সম্ভব ছুঁড়ে দিলাম আকুর দিকে। ওকে ভেদ করে চলে গেল ওটা। পানিতে যেন কেবল ওর ছবিটা রয়েছে, দেহ নেই। দুলে দুলে নেমে গেল নিচের দিকে, আলতো করে গিয়ে পড়ল নিচের কাদায়। অবাক কাণ্ড! একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে পানি। কাদা নেই। সব দেখতে পাচ্ছি। চিৎকার করে বলার

চেষ্টা করলাম, 'তোমার জিনিস তুমি পেয়েছ! ফারিহাকে ছেড়ে দাও এবার, আকু!'

অদৃশ্য হয়ে গেল সে। মুহূর্তে ঢিল হয়ে গিয়ে আমাকে আর ফারিহাকে ছেড়ে দিল লতাগুলো। ওকে নিয়ে ভেসে উঠলাম। গলা জড়িয়ে ধরে ঠেলে নিয়ে সাঁতরাতে লাগলাম তীরের দিকে। ডাঙায় তুলে চিত করে শোয়ালাম। নিঃশ্বাস বন্ধ।

পানিতে ডুবে অচেতন হয়ে যাওয়া মানুষের ফুসফুসে কি ভাবে কৃত্রিম পদ্ধতিতে অক্সিজেন দিতে হয়, স্কুলে শিখেছি। ওর ঠোঁট ফাঁক করে আগে দেখে নিলাম মুখে কোন জিনিস আটকে আছে কিনা। তারপর দুআঙুলে নাক টিপে ধরে মুখে মুখ লাগিয়ে জোরে ফুঁ দিতে লাগলাম। একই সঙ্গে চাপ দিতে লাগলাম বুকে। ফুঁ-চাপ, ফুঁ-চাপ, চলল এ ভাবে। কতক্ষণ দিয়েছি, মনে নেই। মরিয়া হয়ে গেছি আমি। বাঁচাতেই হবে ওকে। মরতে দেয়া চলবে না।

পানি বেরোতে শুরু করল ওর মুখ থেকে। উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে পিঠে চাপ দিলাম। গলগল করে পানি বেরোতে লাগল ওর মুখ দিয়ে। কেশে উঠল ও। আরও কিছু পানি বেরোল পেট থেকে। দম নিতে শুরু করল ও।

'মুসা!' বলেই আবার কাশতে লাগল। আমার গলা জড়িয়ে ধরল।

আমিও ওকে জড়িয়ে ধরলাম।

ওভাবেই বসে রইলাম দুজনে। কতক্ষণ, জানি না।

বৃষ্টি তখন থেমে গেছে।

দশ

ফারিহাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। প্রথম ফোন করলাম হাসপাতালে, অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে, তারপর বাবাকে। কি ঘটেছে, বললাম। আমার তখনও ভয় ছিল, দম নিতে পারছে বলেই যে ঠিক হয়ে গেছে ফারিহা, তা নয়; ওর ফুসফুসে আরও পানি থাকতে পারে। ওগুলো বের না করা পর্যন্ত নিরাপদ নয়।

অ্যাম্বুলেন্স এসে ফারিহাকে নিয়ে গেল। আমি গেলাম সঙ্গে। মা আর বাবা ওখানে দেখা করল আমাদের সঙ্গে।

এক্স-রে করা হলো ফারিহার। আরও কিছু পরীক্ষা করে ডাক্তার রায় দিলেন, ও ঠিকই আছে। তবু বাড়তি সতর্কতা হিসেবে একটা দিন ওকে হাসপাতালে রেখে দিতে চাইলেন। অন্তত রাতটা। গোলমাল কিছু হলে, তখনই হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

রাতে আমি রয়ে গেলাম ওর সঙ্গে। অনেক কথা জিজ্ঞেস করলাম। পুকুরে যাওয়ার কথা মনে করতে পারল না ও। ডাক্তার বললেন, ওটা ওর সাময়িক স্মৃতিভ্রংশ, অনেকক্ষণ পানিতে ডুবে থাকার কারণে হয়েছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমি নিশ্চিত যে আকুই ওর ওপর ভর করেছিল, ওকে দিয়ে লকেটটা পাড়িয়েছিল, ওকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল পুকুরে। এ কারণেই কিছু মনে

করতে পারেনি ফারিহা। তবে সেকথা বললাম না ডাক্তারকে। বললে আমার কথা বিশ্বাস তো করতেনই না, এমন চোখে তাকাতেন যে রাগ লাগত।

ফারিহা বেঁচে যাওয়াতে এতই স্বস্তি পেয়েছিল মা, যে তার আদেশ অমান্য করে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যেও আর কোন শাস্তি দিল না ওকে। বরং রেগে গেল শহর কর্তৃপক্ষের ওপর ওরকম একটা জলজ উদ্ভিদ বোঝাই পুকুর অরক্ষিত অবস্থায় রেখে দেয়াতে, ছোটদের জন্যে যেটা দারুণ বিপজ্জনক। প্রতিবাদ জানাতে লাগল। পক্ষ নিল শহরের আরও কিছু লোক। সবাই মিলে এমন শোরগোল তুলল, কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলো পুকুরটার একটা ব্যবস্থা করতে।

দুদিন পর দমকল বসিয়ে পুকুরের পানি সেঁচা শুরু হলো। সব পানি সেঁচে ফেলার পর আকিয়ানো কোলম্যানের কঙ্কালটা খুঁজে পেল ওরা। একটা গাছের কাণ্ডের নিচে লতার দঙ্গলের মধ্যে এমন ভাবে ঢুকে আটকে ছিল, পানির মধ্যে দেখা যায়নি। এ কারণেই ওর মৃতদেহ খুঁজে পায়নি পাঁচ বছর আগে যারা খুঁজতে নেমেছিল।

হাড়গুলো ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট ছিল না ও:, তবু ওগুলোরই একটা ময়না তদন্ত করা হলো। ডাক্তার রায় দিলেন, পানিতে ডুবেই মারা গেছে ছেলেটা। খুন করা হয়নি, বা অন্য কোন কারণে নয়।

মিডলেকে তখন থাকেন না আকুর বাবা-মা। অন্য শহরে চলে গেছেন। তাঁদের খবর দেয়া হলো স্থানীয় গোরস্থানে কবর দেয়ার ব্যবস্থা হলো তাকে। বাবা-মার সঙ্গে আমরাও গেলাম। আকুর বাবা-মা অনেক কাঁদলেন। ছেলের লাশটা খুঁজে পেয়েছি বলে ধন্যবাদ দিলেন আমাদের। বার বার বলতে লাগলেন আমরা না থাকলে কোনদিনই খুঁজে পাওয়া যেত না ওটা। কে ফারিহাকে মারতে চেয়েছিল, সেকথা তাঁদের বললাম না। ছেলে মরে ভূত হয়ে গেছে এ কথা শুনলে দুঃখ আরও বাড়ত তাঁদের। মানসিক অশান্তিতে ভু তেন।

দিন সাতেক পর ওই শুকনো পুকুর পাড়ে আবার গেলাম আমি। আমাদের ওপর থেকে শাস্তির আদেশ তুলে নিয়েছে মা, বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে আর আমাদের আটকে থাকতে হয় না, যেখানে ইচ্ছে যেতে পারি। পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে কাদার দিকে তাকালাম। পানি না থাকায় মরে শুকিয়ে যাচ্ছে জলজ লতা আর শ্যাওলা। সবুজ রঙ কালো হয়ে গেছে। কোন্ জায়গায় ডুব দিয়েছিল ফারিহা, মনে আছে আমার। সেদিকে তাকালাম। এর কাছাকাছিই আকুর কঙ্কালটা পাওয়া গেছে। একবার দ্বিধা করে জুতো খুলে নেমে গেলাম কাদার মধ্যে। ঠাণ্ডা, আঠাল কাদায় গোড়ালি ডুবে গেল। টান দিয়ে তুলতে গেলে আটকে ধরে রাখে, তুলে আনলে পচাত পচাত করে শব্দ হয়। শিরশির করে গা।

এগিয়ে চললাম। গিয়ে দাঁড়ালাম সেই জায়গাটায়, যেখানে ডুবেছিল ফারিহা। আশপাশে তাকাতে লাগলাম। প্রথমে কিছু চোখে পড়ল না। শুধু কাদা আর মরা উদ্ভিদ। কিছু মরা ডাল ও গাছের কাণ্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। চোখের কোণে ঝিক করে উঠল কি যেন। মাথা ঘুরিয়ে ভাল করে দেখার চেষ্টা করলাম। ফুট তিনেক দূরে কাদার মধ্যে চকচকে একটু কিছু বেরিয়ে আছে। আঙুল ঢুকিয়ে টেনে তুললাম। খাড়া হয়ে কাদায় গেঁথে ছিল লকেটটা, চেনের বেশির ভাগ কাদার নিচে।

আকুর লকেট। চেনটা ছেঁড়া—আমিই ছিঁড়েছি, মনে আছে। ওটা পকেটে ভরে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

ভাল করে ধুয়ে নিলাম চেন আর লকেট, যাতে একবিন্দু কাদা না থাকে। রান্নাঘরে বসে ছবি আঁকছে ফারিহা। ওকে ডাকলাম না। ও এখন স্বাভাবিক। এমন কিছুর মধ্যে আর ওকে নেয়া উচিত হবে না, যাতে ভয় পায়। এমনিতেই রাতের বেলা ও আকুর ভয়ে অস্থির থাকে।

যা করার আমাকে একলাই করতে হবে। সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে পরে বলা যাবে ওকে। গ্যারেজ থেকে সাইকেল বের করে নিয়ে গোরস্থানে রওনা হলাম। গেটের ভেতর ঢুকে ঘাসের ওপর সাইকেলটা শুইয়ে রেখে পায়ে পায়ে এগোলাম আকুর কবরের দিকে। প্রচুর ফুল পড়ে আছে ওপরে আর আশপাশে। বেশির ভাগই শুকনো। তাজা ফুলও আছে। বোধহয় সেদিনই রেখে গেছে ওর বাবা-মা।

কবরের ওপরের আলগা মাটি বসতে সময় নেবে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। কিছু বললাম না। মরা মানুষের সঙ্গে বলে লাভ নেই। আমার কথার জবাব দিতে পারবে না আকু। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো। এ রকম অনুভূতি আগেও হয়েছে, আয়ান যেদিন অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল সেদিন। মনে হলো কেউ আমার ওপর নজর রাখছে। কিন্তু সেদিন আর ভয় পেলাম না। কারণ অপঘাতে মারা গেলেও তুলে এনে ধর্মীয় মতে কবর দেয়া হয়েছে আকুর লাশ, আচার-অনুষ্ঠান সব করা হয়েছে, নিশ্চয় ওর প্রেতাত্মা বেরিয়ে এসে আর কারও ক্ষতি করতে চাইবে না।

ওর কবরের পাশে বসে পড়লাম। হাত দিয়ে খামচে আলগা মাটি সরিয়ে একটা গর্ত করলাম। পকেট থেকে লকেট আর চেনটা বের করে রেখে দিলাম গর্তে। মাটি দিয়ে আবার ভরাট করে উঠে দাঁড়ালাম। যাক, আর কোন হাহাকার থাকবে না আকুর। মৃতের জগতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবে এখন ও।

'মুসা!'

লাফিয়ে উঠলাম। বোমা ফাটল মনে হলো আমার পেছনে। চমকে ফিরে তাকালাম। দাঁড়িয়ে আছেন কোচ রনসন। হাতে ফুলের তোড়া। সরে তাঁকে জায়গা করে দিলাম।

এগিয়ে গিয়ে ফুলের তোড়াটা কবরের ওপর রাখলেন তিনি, ঠিক যেখানটায় আমি লকেটটা পুঁতেছি তার ওপর। একটা মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে বুঝি প্রার্থনাই করলেন, তারপর পিছিয়ে এসে তাকালেন আমার দিকে। চোখের সেই শীতল কঠিন দৃষ্টি আর নেই। নীল তারায় বিষণ্ণতা।

'তোমার কাছে মাফ চাওয়া উচিত আমার, মুসা,' বললেন তিনি। 'তুমি সেদিন সত্যি কথাই বলেছিলে। রাগের জ্বালায় তোমার কথা আমি শুনতে পর্যন্ত চাইনি। আমি দুঃখিত।'

দারুণ অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। রনসনের মত একজন বড় মানুষ আমার কাছে মাফ চাইছেন, এমন নরম হয়ে কথা বলছেন, লজ্জাই লাগতে লাগল আমার। কথা জোগাল না মুখে। কোনমতে শুধু বললাম, 'আমি কিছু মনে করিনি, স্যার!'

'তোমাকে আর ফারিহাকে টীমে ফিরিয়ে নেয়া হলো। আগামী সোমবারে

প্র্যাকটিস করতে যেয়ো।'

'নিশ্চয় যাব! থ্যাংক ইউ, স্যার!'

আনন্দে অধীর হয়ে ফারিহাকে সুখবরটা দেয়ার জন্যে সাইকেলের দিকে পা বাড়াতে গেলাম, কোচ ডাকলেন, 'মুসা?'

ফিরে তাকালাম।

'মুসা, তোমরা সত্যি আকিয়ানোকে দেখেছ?'

পাগল ভেবে আবার না আমাকে টীম থেকে বাদ দেয়া হয়, মানসিক রোগের ডাক্তারের কাছে পাঠানো হয়, এই ভয়ে মিথ্যে বলতে যাচ্ছিলাম। সেই বিচিত্র অনুভূতিটা হলো আবার। মনে হলো, আকুর আত্মা কষ্ট পাবে। মিথ্যে বলতে পারলাম না আর। বললাম, 'দেখেছি, স্যার।'

মাথা ঝাঁকালেন তিনি। আবার এক মিনিট নীরবে তাকিয়ে রইলেন আকুর কবরের দিকে। তারপর আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে, প্র্যাকটিসে যাওয়ার কথাটা আরেকবার মনে করিয়ে দিয়ে গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। তাঁর কথার জবাব দিলাম আমি। কিন্তু তিনি সেটা শুনলেন বলে মনে হলো না।

বাড়ি ফিরে ফারিহাকে জানালাম আমাদেরকে টীমে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে। খুশিতে ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করল সে। একটু দ্বিধা করে লকেটটা কি করেছি সেকথাও বললাম ওকে। শুনে ক্ষণিকের জন্যে চুপ হয়ে গেল ও। ভয় দেখা দিল চোখের তারায়। তবে বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না সেটা। হাসিমুখে বলল, 'ভাল করেছ। এবার আকুর আত্মা শান্তি পাবে।'

ড্রাইভওয়েতে সাইকেলের বেলের শব্দ শুনলাম। উঁকি দিয়ে দেখি ডরোথি এসেছে। সুখবরটা ওকেও জানানোর জন্যে ছুটে বেরোলাম আমি আর ফারিহা।

এরপর নিয়মিত প্র্যাকটিস করতে গেছি আমরা। সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছি। ওই দুর্ঘটনার পর আয়ানের স্বভাবও ভাল হয়ে গিয়েছিল। মিডলেকে যতদিন ছিলাম, শান্তিতেই ছিলাম আমরা।

মুসার কথা শেষ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। নীরবতা ভাঙল সে-ই। কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন বলো, ভূত আছে কিনা?'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে কিশোর বলল, 'আমি এখনও বলব, নেই।'

'তাহলে ওসব ঘটনা ঘটল কি করে?'

'কোন না কোন ব্যাখ্যা নিশ্চয় আছে।'

'কি ব্যাখ্যা? পানির নিচে যে লতাগুলো পেঁচিয়ে ধরেছিল আমাদের, এ তো আর মিথ্যে নয়?'

'ওটা মনের ভুলও হতে পারে। দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠার পর মগজে এমনিতেই গোলমাল হয়ে ছিল তোমার। পানিতে নেমে ফারিহাকে ডুবে যেতে দেখে প্রচণ্ড ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল তোমার শরীর। টানাটানি করেছ যে বলেছ, সেটা তোমার কল্পনা।'

রেগে গেল মুসা, 'তোমার এ সব যুক্তি আমি কিছুতেই মানতে পারছি না! বাকি সব নাহয় বাদই দিলাম। কিন্তু আকুকে যে দেখেছি আমরা, সেটার কি ব্যাখ্যা?

আমি আর ফারিহা একসঙ্গে কথা বলেছি ওর সঙ্গে। সেদিন তো আর দুঃস্বপ্ন দেখে উঠে যাইনি। মাথা খারাপ ছিল না। দুজনেরই চোখের ভুল বলতে চাও?'

জবাব দিতে পারল না কিশোর। কয়েক মুহূর্ত জানালার বাইরে তাকিয়ে থেকে নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন চিমটি কাটল কয়েকবার। রবিনের দিকে ফিরল, 'হ্যাঁ, বলো। তোমার গল্পটা শুনি এবার।'

শুরু করতে যাচ্ছিল রবিন, এই সময় ঘরে ঢুকলেন মুসার মা। বললেন, 'খাবার রেডি।'

গল্প শুনতে শুনতে কখন যে দুপুর হয়ে গেছে, খেয়ালই নেই ওদের। উঠে দাঁড়াল কিশোর, 'চলো, আগে খেয়ে আসি। তারপর শোনা যাবে।'

*

গ্রেট মুসাইয়োসো

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

এত তাড়াহুড়ো করে গোছাতে হয়েছে, সানব্লক আনার কথাই ভুলে গেছে সে। বাস থেকে নেমে বাস স্টপেজের চার ব্লক দূরের গেটটার দিকে এগোনোর সময় মনে পড়ল তার। মানুষের মনের ব্যাপারটা বড় বিচিত্র। কখন যে কোন কথাটা মনে পড়বে কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল সে। রোদের চিহ্নমাত্র নেই, ভারী মেঘে ঢাকা, অথচ এ সময় মনে পড়ল কিনা রোদ-নিরোধক ক্রীমের কথা। দূর থেকে ভেসে এল বজ্রের গুড়ুগুড়ু শব্দ। বাতাস ঠাণ্ডা। ভেজা ভেজা।

দ্রুত কেটে যাবে ঝড়টা, আশা করল সে। কারণ আগামী দিন খোলার দিন। কাজের শুরু। প্রথম দিনে লাইফগার্ড পোস্টে বসে রোদ উপভোগ করতে চায় সে।

ভারী, কালো ডাফেল ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রেখে সাইনবোর্ডটার দিকে তাকাল সে। প্যাসিফিক সাইড কান্ট্রি ক্লাব।

যাক, পৌঁছে গেলাম, ভাবল সে। আবার এলাম আরেকটা গ্রীষ্মের ছুটি কাটানোর জন্যে।

শার্টের ওপর দিয়েই কাঁধ চুলকাল সে। ব্যাগটা অসম্ভব ভারী। হাতের কাছে নিজের যত জিনিস পেয়েছে, সব ভরেছে। সবই, কেবল সানব্লকের টিউবটা বাদে। পালিয়ে আসতে গেলে এ রকম একটু-আধটু ভুল হয়েই থাকে।

গরমকালের ছুটিটা কাটাবে এখানে। নতুন নতুন মানুষ দেখবে। লাইফগার্ডদের ডরমিটরিটা তার খুব পছন্দ। আরও সাত-আটজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে একত্রে বাস। দারুণ ব্যাপার!

সুইমিং পুলে যাওয়ার সামনের গেটটা বন্ধ। খিল লাগানো। ভারী বোঝা নিয়ে এখন পাশ দিয়ে ঘুরে যেতে হবে তাকে। আবার বজ্রের শব্দ। এবার আরও কাছে। আরও তাড়াতাড়ি হাঁটা দরকার।

উঁচু কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ক্লাব হাউসটার দিকে তাকাল সে। কালো হয়ে আসা আকাশের কারণে কেমন গোমড়ামুখো, কালো লাগছে বাড়িটাকে। রেড উডে তৈরি বিশাল দোতলা বাড়ি। সারি দেয়া অসংখ্য জানালা শূন্য কালো চোখে যেন তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

বাড়িটার পেছনে পলকের জন্যে সুইমিং পুলটা চোখে পড়ল তার। মসৃণ পানিতে ধূসর আকাশের প্রতিফলন। তার ওপাশে টেনিস কোর্ট।

লাইফগার্ড ডরমিটরির ছোট গেস্ট হাউসটা দেখা যাচ্ছে না। ক্লাব হাউসের একটা প্রান্ত আড়াল করে রেখেছে ওটাকে।

মাথার ওপর বিদ্যুৎ ঝিলিক দিল। এত জোরে বাজ পড়ল, চমকে গেল সে।

কাঁধের ওপর ব্যাগটা ফেলে দ্রুত এগোল পাশের গেটের দিকে।

সমস্ত আকাশ জুড়ে সাগরের ঢেউয়ের মত গড়িয়ে চলেছে যেন কালো মেঘ। ওগুলোর বাইরে আকাশের রঙ জন্ডিস রোগীর মত ফ্যাকাসে হলুদ। অদ্ভুত আলো। নিচের ঘাস, বেড়া, বাড়ি কোনটাই রেহাই পায়নি সেই আলোর প্রভাব থেকে, কোনটার আসল রঙই আর বোঝার উপায় নেই।

তাড়াতাড়ি করো জোসেফ, নিজেকে তাগাদা দিল সে, ভিজতে না চাইলে আরও জোরে পা চালাও।

দৌড়াতে শুরু করল সে। কাঁধের বোঝার জন্যে বাঁকা হয়ে গেছে পিঠ।

কপালে পড়ল প্রথম বৃষ্টির ফোঁটাটা। ঠাণ্ডা ফোঁটা। ওপর দিকে তাকাল। আকাশের হলুদ অংশগুলোকে পুরোপুরি কালো মেঘে ঢেকে দিয়েছে এখন। রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি ছুটে গেল। বিকেল বেলাতেও হেডলাইট জ্বালতে বাধ্য হয়েছে।

হাত দিয়ে চোখ ঢেকে ফেলল সে। গাড়িটা না যাওয়া পর্যন্ত সরাল না। তারপর আবার এগোল সাইড গেটের দিকে।

বাতাসে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল কাঁটাতারের বেড়া। বিচিত্র গুঞ্জন তুলল।

ফাঁক দিয়ে গেস্ট হাউসটা চোখে পড়ছে এখন। মূল ক্লাব হাউসের ছোট একটা অংশ ওটা।

কাছেই সুইমিং পুল। পানিতে ঝরে পড়ছে বড় বড় ফোঁটা। গেস্ট হাউসের ভেতরে আলো। জানালায় একটা ছেলের মাথা দেখা যাচ্ছে। পেছন ফিরে আছে ছেলেটা।

কে ও? চিনতে পারল না জোসেফ।

এ বছরের লাইফগার্ড কারা কারা হয়েছে? তার পরিচিত কেউ আছে ওদের মধ্যে? গত বছর যারা ছিল, তাদের কেউ কি এসেছে?

জানালার ছেলেটার লাল চুল। কথা বলার সময় মাথাটা ঝাঁকি খাচ্ছে।

আরেক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল জোসেফের মাথায়। আরেকটা ফোঁটা কাঁধে। টি-শার্টের পাতলা কাপড় ভেদ করে চামড়ায় লাগল।

ব্যাগটা অন্য কাঁধে চালান করে দিয়ে গেটের দিকে ছুটল সে।

তালা দেয়া।

ধাক্কা দিতে লাগল সে। শব্দ হতে লাগল জোরে জোরে। কিন্তু চাপা পড়ে গেল বজ্রপাত আর তুমুল বৃষ্টির শব্দে। বজ্রপাতের শব্দে মাটি কাঁপছে।

বাঁধানো চত্বরে চটর চটর আওয়াজ তুলছে বৃষ্টির ফোঁটা। বাতাসে কেমন মাটি মাটি গন্ধ, ঝড়ের আগে যা হয়। তীক্ষ্ণ ঝাপটা মেরে যাচ্ছে বাতাস। সাঁ-সাঁ করে আসছে একদিক থেকে, উল্টো দিক থেকে ফিরে এসে সেটাই আবার ধাক্কা মারছে।

সে ভাবছে, জানালায় দাঁড়ানো লালচুলো ছেলেটা ফিরে তাকালেই তাকে দেখতে পেত। গেট খুলে দিতে আসত।

আবার গেট ধরে ঝাঁকি দিতে লাগল সে। মনে পড়ল আইডেনটিটি কার্ডের কথা।

দরখাস্ত পাঠিয়েছিল সে। কর্তৃপক্ষ তাকে কাজে বহাল করে কার্ড পাঠিয়েছে।

তাতে অবশ্যই একটা [illegible] সাঁটানো আছে। ছবিটা ভাল না, মানে স্পষ্ট নয়। দেখে সহজে চেহারা বোঝা কঠিন। তবে ভালমত দেখলে মিল পাওয়া যায়।

কার্ডের সঙ্গে একটা চিঠি দিয়েছে ওরা। লিখে দিয়েছে, কোন অসুবিধে নেই, গেটের স্লটে কার্ডটা ঢোকালেই খুলে যাবে ইলেকট্রনিক গেট।

ব্যাগটা নামানো ছাড়া উপায় নেই। মাটিতে নামাল সে। জিপার খুলল। হাত ঢুকিয়ে খুঁজতে লাগল। মনে আছে, সব জিনিসপত্রের একেবারে ওপরেই রেখেছে।

ঝেঁপে নেমেছে এখন বৃষ্টি। বড় বড় ফোঁটা। চত্বরে পড়ে এখন জোরাল শব্দ তুলছে। শার্ট ভিজে যাচ্ছে।

আঙুলে ঠেকল ওর মানিব্যাগ। বের করে আনল। সেটা থেকে বের করে নিল কার্ডটা।

মেইন রোড ধরে আরেকটা গাড়ি ছুটে গেল। মিনিটখানেক ধরে ওটার হেডলাইটের আলোর আওতায় থাকতে হলো ওকে। কার্ড ঢোকানোর জন্যে স্লট-বক্সটা খুঁজতে শুরু করল। গেস্ট হাউসের জানালায় ছেলেটা নড়ছে। আরেকটা ছেলেকে দেখা গেল। সে-ও পেছন করে আছে এদিকে।

অবশেষে বক্সটা খুঁজে পেল জোসেফ। বুক সমান উঁচুতে খুদে একটা লাল আলো জ্বলছে আর নিভছে। ধীরে ধীরে কার্ডটা স্লটে ঢুকিয়ে দিয়ে গুঞ্জন শোনার অপেক্ষা করতে লাগল সে।

কিছুই ঘটল না।

বৃষ্টির বেগ আরও বাড়ল। চত্বরে একটানা আঘাত হেনে ঝমঝম ঝমঝম আওয়াজ তুলছে পানির ফোঁটা।

ভিজে চুপচুপে হয়ে যাচ্ছে সে।

মাথা থেকে পানি ঝেড়ে ফেলল। কার্ডটা স্লট থেকে বের করে উল্টোভাবে ঢোকাল।

একভাবে মিটমিট করছে লাল আলোটা। কোন সাড়া নেই গেটের।

গুঙিয়ে উঠল সে। হলো কি গেটটার?

বৃষ্টির বেগ আরও বেড়েছে। বৃষ্টি সঙ্গে নিয়ে বেড়ার গায়ে ঝাপটা মারছে বাতাস।

পুরো ভিজে গেছে এখন সে। স্লট খোলার চেষ্টা বাদ দিয়ে আবার গেট ঝাঁকানো শুরু করল।

গেস্ট হাউসের জানালায় ছেলে দুটোকে দেখতে পাচ্ছে।

'আই, শুনছ? শুনতে পাচ্ছ?' চিৎকার করে ডাকল সে। 'আই!'

বাতাস আর বৃষ্টির শব্দে চাপা পড়ে গেল ওর ডাক।

'আই, খুলে দাও! আমি ঢুকব!'

বেড়ার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে একটা জিনিসে দৃষ্টি আটকে গেল তার।

সুইমিং পুলের কোনায়।

জিনিসটা কি?

বৃষ্টির চাদরের মধ্যে দিয়ে দেখার চেষ্টা করতে গিয়ে কুঁচকে ফেলল চোখের কোনা।

চিনতে পেরে দম আটকে গেল। একটা ছেলে। মুখ নিচু করে ভাসছে পুলের পানিতে। গায়ে নীল শার্ট। ফ্যাকাসে হাত দুটো নির্জীব ভঙ্গিতে ভেসে রয়েছে নিজের দুই পাশে।

ডুবে যাচ্ছে ছেলেটা।

নাকি ডুবেই গেছে! ডুবে গিয়ে মরে গেছে!

দুই হাতে শীতল বেড়াটা চেপে ধরল সে। ওপরে বৃষ্টির দিকে মুখ তুলে চিৎকার করে উঠল।

দুই

কমনরুমে বসে গেজাচ্ছিল ওরা, এই সময় তুমুল বৃষ্টি শুরু হলো। বিকট শব্দে বাজ পড়ল গেস্ট হাউসের বাইরে। চেঁচিয়ে উঠল রীমা ওয়েলিং। বড় বড় বাদামী চোখ ওর। সোনালি-সাদা চুলের বোঝা।

নামটামগুলোতে এখনও অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি ওরা। কারণ ক্লাবে নতুন এসেছে সবাই। তবে রবির নাম মনে রাখতে অসুবিধে হচ্ছে না কারও। কারণ সে হেড লাইফগার্ড। সবারই মুখস্থ হয়ে গেছে।

রীমার বজ্রপাতের শব্দকে ভয় পাওয়া নিয়ে হাসাহাসি করছে সবাই।

'না, আমি ভয় পাইনি,' ফিসফিস করে প্রতিবাদ করল রীমা, 'চমকে গিয়েছিলাম শুধু।'

কিন্তু পরক্ষণেই আবার যখন বাজ পড়ল, জানালা কাঁপিয়ে দিল, আবার চিৎকার করে উঠল সে। সবার মুখের হাসি দেখে, দুই হাতে নিজের মাথার ঘন চুলে খামচি মারতে মারতে বলল, 'সত্যি কথাটাই বলি, ঝড়-বৃষ্টি ভাল লাগে না আমার।'

সবাই হেসে উঠল। বেঁটে, ছোটখাট শরীরের কিং বার্নার্ড বলল, 'ঝড়ের মধ্যে সাঁতার কাটতে যাওয়া উচিত। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মত বিদ্যুৎ চার্জ করে আনা যাবে শরীরে।'

পচা রসিকতা।

হাসার বদলে গুঙিয়ে উঠল সবাই। শঙ্কিত হলো রবি। সারাটা গরমকাল কাটাতে হবে কিং-এর সঙ্গে। এই রসিকতা চালাতে থাকলে কোনদিন যে ধরে পানিতে চোবানো শুরু করবে! খুনের দায়ে জেলে যেতে হবে শেষে।

জানালার চৌকাঠে ভর দিয়ে দাঁড়াল সে। পেছনে জানালায় আঘাত হানছে বৃষ্টির ফোঁটা। সারা ঘরে চোখ বোলাচ্ছে।

সব ক'টা মেয়েই ঠিক আছে, ভাবল সে।

সবচেয়ে সুন্দরী রীমা। গোলাপি শর্টস, আর নীল স্লীভলেস মিডরিফ পরেছে যে মেয়েটা—সুজি রনসন, সে-ও সুন্দরী। খাটো করে ছাঁটা কালো চুল, চকচকে, মসৃণ। তবে রবির পছন্দ লম্বা চুল। অদ্ভুত নীল চোখ মেয়েটার।

কোণায় দাঁড়ানো ঢেঙা ছেলেটার নামটা বড় খটমটে। জেরাল্ড হেলম

গ্রেজব্রুক। অত জটিল নাম উচ্চারণ করতে গেলে দম আটকে যাবে, তাই সহজ করে নেয় অনেকেই, জেরি বলে ডাকে। জেরিও তাতে খুশি। টম অ্যান্ড জেরি কার্টুনের জেরি হতে আপত্তি নেই তার। মেয়েদের মত লম্বা, সোনালি চুল। শীতল, কালো চোখ। আর খুব লাজুক।

'হেড লাইফগার্ড কি করে হলে তুমি, রবি?' প্রশ্ন করল কিং। হাসছে। 'শক্ত কোন প্রতিযোগিতায় জিতেছিলে নাকি?'

'না,' মাথা নাড়ল রবি, 'বরং প্রতিযোগিতায় হেরেছি।'

অবাক লাগল সবার।

কিছু বলবে মনে হলো কিং। ওর মুখে বিচিত্র হাসি। আরেকটা পচা রসিকতা তৈরি করছে বোধহয় মনে মনে।

গেরি বলে উঠল, 'রবি, ফ্রিজে বিয়ার-টিয়ার কিছু আছে নাকি?'

গেরিকে দেখে খাঁটি লাইফগার্ডের মতই লাগছে। যে কোন ম্যাগাজিনে মডেলের পোজ দিতে পারবে। চমৎকার স্বাস্থ্য। রোদ লাগানো চামড়া। কোঁকড়া সোনালি চুল। কালো চোখ। চোখের কোণে অদ্ভুত ভাঁজ। দিলখোলা হাসি। দেখে মনে হয় না সারা জীবনে কখনও কোন ভারী ভাবনা ভেবেছে, কিংবা দুশ্চিন্তা করেছে। তবে মানুষের মুখ দেখে সব সময় মনের কথা বোঝা যায় না।

রীমার পাশে একটা কাউচে লম্বা হয়ে পড়ে আছে সে। মাথায় লাল রুমাল বাঁধা। জলদস্যু সাজার ইচ্ছে হয়েছে যেন।

ডরমিটরিতে বিয়ার খাওয়া নিষেধ, গেরিকে বলতে যাচ্ছিল রবি, এই সময় কানে এল তীক্ষ্ণ চিৎকার।

ঝট করে সোজা হলো রবি। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল জানালার দিকে। ধাক্কা লাগল কিং-এর সঙ্গে।

শব্দটা বাইরে থেকে এসেছে মনে হলো রবির।

প্রথমে ভাবল ঝড়ের শব্দ। বাতাস তো কত রকম শব্দই করে। নাকি কাঁটাতারে বিড়াল আটকা পড়ে চিৎকার করছে?

আবার শোনা গেল চিৎকার। মানুষের চিৎকার। সন্দেহ রইল না আর।

জানালার কাঁচে পানির কণা লেগে ঘষা কাঁচের মত হয়ে গেছে। ভাল করে দেখার জন্যে হাত দিয়ে মুছে নিল কাঁচ। একটা ছেলেকে দেখল গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে।

চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছে।

বৃষ্টির শব্দে ছেলেটার কথা বোঝা যাচ্ছে না। তবে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না।

'কি ব্যাপার?' রীমার প্রশ্ন।

'কে?' রবি আর কিংকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে মাঝখানে এসে ঢুকল সুজি।

জবাব না দিয়ে দরজার দিকে ছুটল কিং আর রবি। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এল। সাংঘাতিক নামা নেমেছে। ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক, সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে বজ্রপাতের শব্দ। পানি জমে থাকা গর্তে পা পড়ল রবির। ঝপ করে ঠাণ্ডা পানি ছিটকে উঠে এসে লাগল চোখে-মুখে।

চিৎকার করে হাত তুলে কি যেন দেখাচ্ছে ছেলেটা। একটা কথাও বুঝতে

পারল না রবি। ঝড়-বৃষ্টির প্রচণ্ড গর্জন। ভাল ঝড় হচ্ছে।

আগে আগে ছুটছে কিং। রবির কয়েক কদম আগে। পানির মধ্যে ঝপঝপ শব্দ তুলছে জুতো। গলা লম্বা করে গেটের বাইরে ছেলেটার মুখ দেখার চেষ্টা করছে রবি। মাথা থেকে কপাল বেয়ে চোখে পড়ছে পানি।

ভিজে গোসল করে ফেলেছে ছেলেটা। ভীষণ উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

'কি হলো তোমার?' জিজ্ঞেস করল রবি।

চিৎকার করে রবির পেছনে কি যেন দেখাল ছেলেটা।

গেটের কাছে পৌঁছে গেছে রবি, এই সময় চিৎকার করে বলল ছেলেটা, 'একটা ছেলে! সুইমিং পুলে একটা ছেলে ভাসছে! ডুবে মরেছে!'

'কি বলছ?' প্রথমে তেমন প্রতিক্রিয়া হলো না রবির। হাঁ করে তাকিয়ে আছে গেটে দাঁড়ানো ছেলেটার দিকে।

'ছেলে! বুঝতে পারছ না!' চিৎকার করে বলল ছেলেটা। 'সুইমিং পুলে একটা ছেলে পড়ে মরেছে!'

অবশেষে যেন প্রাণ ফিরে পেল রবি। চোখ থেকে পানি মুছে ফেলার চেষ্টা করল।

'ছেলে পড়েছে! ছেলে পড়েছে! সুইমিং পুলে ছেলে পড়ে মরেছে!' বিকৃত স্বরে চিৎকার করেই চলেছে গেটে দাঁড়ানো ছেলেটা।

ফিরে তাকাল রবি। কপালে হাত রেখে বৃষ্টি বাঁচিয়ে দেখার চেষ্টা করল। শেষে দৌড় দিল পুলের দিকে।

দুপদাপ করছে হৃৎপিণ্ডটা। জোরে ছুটতে গিয়ে পিছলে পড়তে পড়তে সামলে নিল কয়েকবার। পেছনে অস্পষ্ট হয়ে আসছে ছেলেটার চিৎকার। মুষলধারে পড়তে থাকা বৃষ্টির জন্যে শোনা যাচ্ছে না।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পুলের ধারে পৌঁছে গেল সে। হাঁপাচ্ছে। অবাক হয়ে ভাবছে, কে? কোন্ ছেলেটা পড়ে মরল? পড়বে কি করে? ক্লাব তো বন্ধ ছিল।

পুলের দিকে তাকাল সে।

চোখ মিটমিট করে চোখের পাতা থেকে পানি সরিয়ে ভালমত তাকাল। পুলের সামনে পেছনে এদিক ওদিক সমস্ত জায়গায় খুঁজল।

কাউকে দেখতে পেল না। কেউ নেই পুলে।

তিন

বিব্রত হলো জোসেফ।

মরমে মরে গেল যেন।

এ কি হলো? নতুন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই এমন একটা কাণ্ড! লাইফগার্ডদের সঙ্গে! কি ভাববে ওরা!

ভেজা চুপচুপে শরীর। ঠাণ্ডায় কাঁটা দিল গা।

রবি আর কিং ওকে কমন রুমে নিয়ে এল। ঠিকমত দম নিতে পারছে না সে। চিৎকার করে করে গলার ভেতরটা চিরে গেছে। খসখসে লাগছে।

উধাও হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে ওর। গলে গিয়ে বৃষ্টির পানির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে।

গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে শার্ট। জুতো ভর্তি পানি।

ব্যাগটা নামিয়ে রাখতে গিয়ে ফসকে গেল। থ্যাপ করে পড়ল ওটা মেঝেতে।

ছেলেদের মত লম্বা চুলওয়ালা ঢেঙা একটা ছেলে হাত বাড়িয়ে পরিচয় দিল, তার নাম জেরাল্ড হেলম গ্লেজব্রুক। তোয়ালে আনতে দৌড় দিল।

কিন্তু জোসেফ তো তোয়ালে চায় না। একটা গর্ত চায়, গভীর গর্ত, যাতে ঢুকে লজ্জা লুকাতে পারে। চিরকালের জন্যে।

'কি হয়েছিল?'

'চিৎকার করেছ কেন?'

'আটকা পড়েছিলে নাকি?'

'কি দেখেছ?'

'এখানে কেন এসেছ?'

'কেউ তোমাকে মারতে এসেছিল?'

প্রশ্নের পর প্রশ্ন যেন তীরের মত এসে আঘাত করতে লাগল তাকে। সবাই উদ্বিগ্ন। আন্তরিক।

বুঝতে পারছে সে। জবাব দিল না। বার বার কেঁপে উঠছে। জবাব দেয়ার অবস্থাই নেই।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের ওপরের পানি মুছে ফেলল। কিন্তু লাভ নেই। মোছার সঙ্গে সঙ্গে চুল থেকে কপাল বেয়ে নেমে আসছে আবার।

'একটা কিছু এনে দাও ওকে,' বলল একজন। 'গরম দুধটুধ, চা বা কফি। মরবে তো।'

'না না, আমি ঠিকই আছি,' কোনমতে কথাটা বলে ফেলল জোসেফ।

বড় একটা তোয়ালে নিয়ে ঘরে ঢুকল জেরি। কাঁধে জড়িয়ে দিল জোসেফের। তোয়ালের একটা প্রান্ত দিয়ে মাথা ঘষে পানি মুছতে শুরু করল জোসেফ।

বুকের মধ্যে এখনও ঘোড়ার মত দৌড়াচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। তবে সে নিজে সহজ হয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

রবি চলে গিয়েছিল। ফিরে এল পোশাক পাল্টে। ভেজা কাপড় খুলে রেখে এসেছে

'কি নাম তোমার?' জিজ্ঞেস করল রবি।

'জোসেফ,' জবাব দিল সে। 'জোসেফ উইনার।'

বাকি সবার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল রবি। একবারেই সবার চেহারা মনে গেঁথে নিয়ে নাম মনে রাখা কঠিন। হয়ে যাবে, ভাবল সে। তবে হ্যাঁ, জেরির নামটা ভুলবে না আর। ঢেঙা ছেলেটা, যে ওকে তোয়ালে এনে দিয়েছে। কালো চকচকে চুলওয়ালা মেয়েটাকেও চিনে ফেলেছে, ওর নাম সুজি। আর, সোনালি চুলওয়ালা মাথায় লাল রুমাল বাঁধা হিরো-টাইপের ছেলেটার নাম···কি যেন?···হ্যাঁ, গেরি

মারকাস–তার নামও ভুলবে না।

সবাই ঘিরে দাঁড়িয়েছে জোসেফকে। যেন সে একটা বিকলাঙ্গ, কিংবা মিউজিয়ামে নিয়ে রাখার মত উদ্ভট কিছু।

'পুলের মধ্যে একটা ছেলে...' রবিকে বোঝাতে গেল সে। কিন্তু থেমে গেল। কি করে বোঝাবে?

মাথা নেড়ে রবি বলল, 'পুলে কি দেখেছ তুমি, কে জানে। আমি তো কয়েকটা পাতা ছাড়া আর কিছু দেখলাম না।'

ঢোক গিলল জোসেফ।

ছেলেটাকে ও স্পষ্ট দেখেছে। নীল শার্ট পরা। মড়ার মত ফ্যাকাসে চামড়া হাত দুটো শরীরের দুই পাশে পানিতে ভাসছিল।

'আ-আ-আমি...' তোতলানো শুরু করল জোসেফ। কান গরম হয়ে যাচ্ছে। 'কি জানি, বৃষ্টির জন্যে ভুলই হয়তো দেখেছি! ছায়াটায়া কিছু। গাধা মনে হচ্ছে এখন নিজেকে।'

'থাক থাক, আমরা কিছু মনে করিনি,' তাড়াতাড়ি বলল রবি। হাসল। হাসিটা সুন্দর। মুখে তিল, লালচুলো ছেলেদের মুখের দিকে তাকাতে পারে না জোসেফ, কিন্তু এই ছেলেটাকে অপছন্দ করল না। হেসে পরিস্থিতিটা সহজ করার চেষ্টা করল, 'গোসল করা দরকার আমার।'

'রসিকতা করছ নাকি?' হেসে বলল কিং।

ভালমত মুখ-মাথা মুছে নিল জোসেফ। বাহু মুছতে শুরু করল। একপ্রান্তের আর্মচেয়ারটায় গিয়ে বসল জেরি জোসেফের দিকে তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। শীতল কালো চোখ, কেমন কঠিন একটা ভঙ্গি মুখে।

'সত্যি কি তুমি পুলে কিছু দেখেছিলে?' ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল একটা মেয়ে। ঝাঁকি দিয়ে চুল নেড়ে আনমনে বিড়বিড় করল, 'কি সাংঘাতিক!'

'গেটে কি করছিলে তুমি?' গেরি জিজ্ঞেস করল। 'ক্লাব তো খুলবে কালকে।'

'সাঁতার কাটার জন্যে অস্থির হয়ে গেছে আরকি,' রসিকতা করল কিং। 'আগেভাগেই চলে এসেছে, ভিড় জমে যাবার আগেই একটু একা একা সাঁতরে নিতে চায়।'

কেউ হাসল না।

'আমি একজন লাইফগার্ড,' জানাল জোসেফ। ভেজা ডাফেল ব্যাগটার দিকে তাকাল। 'লাইফগার্ডের মত আচরণ করিনি আমি, তবে সত্যি আমি লাইফগার্ড।'

'লাইফগার্ড?' হেসে রসিকতা করল জলদস্যু গেরি মারকাস। 'কিন্তু লাইফগার্ডদের তো শরীর ভেজে না। কিসের লাইফগার্ড তুমি?'

'এ বছর আর ক'জন লাইফগার্ড আসবে?' জোসেফ শুনতে পেল, সোনালি-চুল ছেলেটা ফিসফিস করছে সুজির সঙ্গে।

অবাক মনে হলো রবিকে। দেয়াল ঘেঁষে রাখা ডেস্কের কাছে গিয়ে ফাইল ঘাঁটতে লাগল।

'এই যে, লিস্ট পেয়েছি,' একপাতা কাগজ টেনে বের করল সে। ঘুরে দাঁড়িয়ে জোসেফের দিকে তাকিয়ে হাসল। কিন্তু নামগুলোতে চোখ বোলাতে বোলাতে

হাসিটা মুছে গেল তার। 'কি যেন নাম বললে তোমার? 'জোসেফ?'

'জোসেফ উইনার।' অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল, গায়ের পানি ঝরে পানি জমে গেছে পায়ের কাছে। ঘরে গিয়ে পোশাক বদলে আসা দরকার। গায়ের কাপড় থেকে টপটপ ফোঁটা ঝরছে এখনও।

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করছে রবি। হাতটা তুলে দেখিয়ে বলল, 'লিস্টে ওই নামে কেউ নেই। জোসেফ উইনার নেই।'

'বলো কি!' বিস্ময় চাপা দিতে পারল না জোসেফ। চেপে ধরল তোয়ালেটা। চোখ ঘুরিয়ে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'নাহ্, দিনটাই আজ কুফা আমার। যা বলছি, তাতেই গোলমাল!'

'ভুল জায়গায় চলে এসেছ হয়তো,' ঘরের অন্যমাথা থেকে বলল জেরি, 'অন্য কোন ক্লাবে চাকরি হয়েছে তোমার।' রবির দিকে তাকাল। 'নাকি কারও বদলী দেয়া হয়েছে ওকে?'

মাথা নাড়ল রবি, 'না, বদলী-টদলী নয়।'

জোসেফের মনে হলো পেটের মধ্যে খামচি দিয়ে ধরেছে কেউ। 'শিওর, লিখতে ভুল করেছে,' কণ্ঠস্বর শান্ত রাখার চেষ্টা করল সে। 'লিস্টে অবশ্যই আমার নাম থাকার কথা। যদি লাইফগার্ডই না হব আমাকে কার্ড পাঠিয়েছে কেন?'

জিনসের পকেট থেকে কার্ডটা টেনে বের করল সে। পানি লেগে আছে গড়িয়ে পড়ল একটা ফোঁটা।

এগিয়ে এসে কার্ডটা হাতে নিল রবি। চোখের পাতা সরু করে ভালমত দেখার চেষ্টা করল।

'জোসেফ, সত্যি বলছ, এ কার্ডটা তোমাকে পাঠানো হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল জোসেফ, 'হ্যাঁ।'

ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল সে। সমস্ত লাইফগার্ডেরা চুপ, তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ওদের চোখে সন্দেহ।

কার্ডটা আরেকবার দেখল রবি। তাকাল আবার জোসেফের দিকে।

'কি-কি-কি হলো!' তোতলাতে লাগল আবার জোসেফ। 'অমন করে তাকাচ্ছ কেন?'

'জোসেফ,' নরম স্বরে বলল রবি, 'এ কার্ডটা পুরানো। গত বছরের।'

চার

'ঘটনাটা কি? সব উল্টোপাল্টা!' চিৎকার করে উঠল জেরি। জোসেফের জন্যে রীতিমত দুঃখ হচ্ছে তার।

একগাদা পানির মধ্যে বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জোসেফ। কেমন অসহায় ভঙ্গি। মায়াই লাগল জেরির।

দ্বিধাগ্রস্ত জোসেফ। লিস্টে নাম নেই তার। কার্ডটাও এক বছরের পুরানো। ভুল

করে নিশ্চয় পুরানো কার্ড পাঠানো হয়েছে ওকে।

সবাই এমন করে তাকিয়ে আছে জোসেফের দিকে, যেন সে মঙ্গলগ্রহ থেকে নেমে এসেছে। খারাপ লাগাটা ওর স্বাভাবিক। এমনকি রবিও কিছু করছে না যাতে ও একটু সান্ত্বনা পায়।

অবশেষে জেরিই উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে এসে জোসেফের হাত ধরে টান দিল, 'এসো আমার সঙ্গে। আমার ঘরে। ভেজা কাপড়গুলো আগে বদলাও। তারপর কথা।'

কৃতজ্ঞ হয়ে গেল জোসেফ। ভেজা ব্যাগটা নিতে ওকে সাহায্য করল জেরি। হলের দিকে এগোল, যেখান থেকে জেরির ঘরে যাওয়া যায়।

দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল জোসেফ। জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের কেউ কি গত বছর এসেছিলে এখানে?' তীক্ষ্ণ, উঁচু কণ্ঠস্বর। সাংঘাতিক নার্ভাস হয়ে আছে সে। 'সবাই নতুন?'

'সবাই নতুন,' রবি জানাল। লিস্টটা এখনও হাতেই ধরা ওর।

'মহাকাশ থেকে মাটির পৃথিবীতে নতুন নেমে এল আজ জোসেফ,' রসিকতা করল গেরি।

হেসে উঠল সবাই।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ওদের দিকে তাকিয়ে জোসেফ বলল, 'গত বছর আমি এসেছিলাম এখানে। ভাবলাম, কারও মনে থাকলেও থাকতে পারে...'

মাথার লাল রুমালের কোণ ধরে টান দিল গেরি। এগিয়ে এল জোসেফের দিকে। 'গত বছর আমি এসেছিলাম গ্রীষ্মের শেষে। গেস্ট হিসেবে।'

'কে তোমাকে ঢুকতে দিল?' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল কিং।

ওর দিকে তাকালও না গেরি। জোসেফকে বলল, 'কিন্তু তোমাকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'আশ্চর্য!' অবাক হয়ে গেরির দিকে তাকিয়ে আছে জোসেফ। 'তোমার কথাও আমি মনে করতে পারছি না। অথচ ডিউটি তো দিয়েছি ঠিকমতই।'

মাথা নাড়তে লাগল সে। পানির ফোঁটা ঝরে পড়ল।

'যাকগে, ব্র্যান্ডনের সঙ্গে দেখা হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।' লিস্টটা আবার ফোল্ডার ফাইলে রেখে দিল রবি। 'টাইপ করার সময়ই নিশ্চয় ভুলটা করেছে।'

লিওনার্ড ব্র্যান্ডন এই ক্লাবের অ্যাথলেটিক ডিরেক্টর। প্রাণশক্তিতে ভরপুর যুবক। এই ক্লাবে লাইফগার্ডের চাকরির ইন্টারভিউ সে-ই নিয়েছে। অতিরিক্ত ব্যস্ত মানুষ। নানা কাজ। হাজারটা ঝামেলা। এত কাজ একসঙ্গে করতে গেলে একআধটা ভুল হয়েই যেতে পারে।

'কেঁপেই তো মরে যাবে,' জেরি বলল। 'এসো আমার সঙ্গে।'

সরু হলের ভেতর দিয়ে জোসেফকে নিয়ে চলল সে।

কথা বলছে না জোসেফ। চিন্তা করছে কিছু।

কথা বলার জন্যে চাপাচাপি করল না জেরি। জোসেফকে নিজের ঘরে নিয়ে এল।

'নাও, বদলে ফেলো কাপড়গুলো।'

কয়েক টানে গায়ের ভেজা কাপড়গুলো খুলে ফেলে দিয়ে শুকনো জিনস আর গেঞ্জি পরে নিল জোসেফ। তারপর চোখ বোলাল ঘরটায়। দুটো সিঙ্গল বেড, দুটো ছোট ড্রেসার, দুই ধারের দেয়াল ঘেঁষে একটা করে বুকশেলফ, একটা ছোট আর্মচেয়ার আর দুটো ছোট ছোট টেবিল।

জোসেফ যখন কাপড় বদলাচ্ছে, ব্রুটের খাঁচার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে জেরি। ব্রুট হলো ওর পোষা সাদা ইঁদুর। বেড়ানোর সময় ওকে সাধারণত সঙ্গে নেয় না জেরি। এতটা ভালবাসা নেই। কিন্তু এ গ্রীষ্মে বাড়ি খালি, কেউ নেই, বাবা-মা দুজনেই বেড়াতে চলে গেছেন। খাওয়াবে কে? বাড়িতে একা ফেলে আসতে পারেনি তাই ইঁদুরটাকে।

ব্রুটের ছোট্ট কাপে কয়েকটা দানা ফেলে দিল জেরি। তারপর জোসেফের দিকে ঘুরল। 'হলো তোমার? ভাল লাগছে না এখন একটু?'

'লাগছে,' ঠোঁট কামড়ে ধরল জোসেফ, 'কিন্তু মাথায় ঢুকছে না আমার কিছু। সত্যি সত্যি পুলের মধ্যে একটা ছেলেকে ভাসতে দেখলাম।' কল্পনায় ভেসে উঠল আবার ছেলেটা।

'আলোর কারসাজি হতে পারে,' জেরি বলল। 'আলো-আঁধারির মধ্যে এমনিতেই হাজার রকম ছায়া দেখা যায়, তার ওপর হয়েছে ঝড়। হয়তো কোন কিছুর ছায়া পড়েছিল পানিতে…'

'আমার কার্ডটাই বা এক বছরের পুরানো কেন?' বাধা দিয়ে বলল জোসেফ। জেরির কথা কানে গেছে বলে মনে হলো না। নিজের চিন্তায় ডুবে আছে।

ভেজা কাপড় বদলানোর সময় আই-ডি কার্ডটা বের করে ড্রেসারের ওপর রেখেছিল। তুলে নিয়ে পকেটে ভরল।

'আর আমার নামই বা লিস্টে নেই কেন? আমাকে চাকরিতে নেয়া হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর কার্ড পুরানো হওয়াটাও আমার ভুল নয়।'

'মিস্টার ব্র্যান্ডন এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে,' সান্ত্বনার সুরে বলল জেরি।

কমন রুম থেকে উচ্চকিত হাসির শব্দ ভেসে এল। কোন ধরনের জন্তুর ডাক ডেকে উঠেছে গেরি, তাতেই এই হাসির হুল্লোড়।

হাসি থামলে সুজির গলা শোনা গেল। জোসেফকে নিয়ে কি যেন একটা মন্তব্য করল। আবার হেসে উঠল সবাই।

চট করে জোসেফের দিকে তাকাল জেরি। জোসেফ শুনল কিনা দেখল।

কিন্তু বোঝা গেল না কিছু। নিজের চিন্তায় ডুবে আছে জোসেফ।

'চলো,' জোসেফকে ডাকল সে, 'জিনিসপত্রগুলো এখানেই থাক।'

মাথা ঝাঁকাল জোসেফ। দুজনে ফিরে এল আবার কমনরুমে।

ওদের দেখে হাসি বন্ধ হয়ে গেল সবার।

দেয়ালের কাছের একটা আর্মচেয়ারে বসে পড়ল জেরি।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে চারপাশে চোখ বোলাল জোসেফ। আস্তে করে বসল ডেস্কের পাশে রাখা একটা ফোল্ডিং চেয়ারে।

'বাহ্, অনেক সুস্থ লাগছে তোমাকে,' ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল রবি।

'থ্যাংকস,' অস্বস্তি যাচ্ছে না জোসেফের। 'ভাল কিনা জানি না, তবে শুকনো লাগছে।' জেরির দিকে তাকাল সে. 'ধন্যবাদটা এ জন্যে জেরির প্রাপ্য।'

বিকট শব্দে বাজ পড়ল। ঝনঝন করে উঠল জানালার কাঁচ। জানালার দিকে তাকাল জেরি। বাইরে রাতের মত অন্ধকার। পানির চাদর সৃষ্টি করে কাঁচ বেয়ে নামছে বৃষ্টির পানি।

'সাঁতার কাটতে গেলে কেমন হয়?' রসিকতা করল কিং।

'তোমার ইচ্ছে হলে তুমি যাও,' গেরি বলল।

'সত্যি যাব কিন্তু বলে দিলাম।'

জেরির মনে হলো, কিং-এর কোন ধরনের সমস্যা আছে, আধপাগল। নইলে এ ভাবে বাহাদুরি দেখিয়ে কিংবা পচা রসিকতা করে কি প্রমাণ করতে চায় সে?

চুপচাপ হয়ে গেল ঘরটা হঠাৎ। সবাই যেন কথা হারিয়ে ফেলেছে। সবাই এখানে নতুন, পূর্ব-পরিচয় নেই কারও সঙ্গে কারও।

ঘরের একধারে গালে হাত দিয়ে বসে আছে জোসেফ।

চেয়ারে বসে থেকেই সামনে ঝুঁকল জেরি। বলার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'জোসেফ, পুলের মধ্যে কাকে দেখেছ, বুঝতে পেরেছি।'

ভারী নীরবতা খান খান করে দিল জেরির কণ্ঠ।

সব কটা চোখ ঘুরে গেল ওর দিকে।

অবাক হয়ে ওর দিকে মুখ তুলল জোসেফ, 'কাকে?'

'ওই মরা ছেলেগুলোর একজনকে দেখেছ।'

পাঁচ

জেরির কথা শেষ হতে না হতে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল আবার। কেঁপে উঠল ঘরটা। দপ করে আলো নিভে গেল। ছেলেকণ্ঠের চিৎকার শোনা গেল।

কিং আর গেরির হাসি শোনা গেল। ভূতুড়ে শব্দ করতে শুরু করল কিং। নাকি গলায় কথা বলে উঠল।

জানালা দিয়ে ধূসর আলো আসছে। আকাশ চিরে দিল বিদ্যুতের শিখা। জানালার কাঁচ ঢেকে রেখেছে বৃষ্টির পানি। পুরো পরিবেশটাই অবাস্তব লাগছে।

কয়েক সেকেন্ড পরেই দু'একবার মিটমিট করে আবার জ্বলে উঠল আলো। হুল্লোড় করে উঠল সবাই।

গেরি সরে গেছে রীমার কাছাকাছি। ওর এ সব কাণ্ড ভাল লাগল না জোসেফের।

ওদের দিকে বার বার তাকাচ্ছে সুজি। গেরির ওপর বোধহয় নজর পড়েছে তার। দেখে হিংসা হচ্ছে রবির রীমা, সুজি, দুজনেই গেরির দিকে ঝুঁকেছে–ওর দিকে তাকাচ্ছে না একজনও।

পেটের ওপর দুই হাত রেখে শক্ত হয়ে বসে আছে জোসেফ। উত্তেজিত মনে

হচ্ছে ওকে। সেটা লক্ষ করল রবি। অবাক লাগল তার। কখনও কি উত্তেজনা ছাড়া থাকে না ছেলেটা? শান্ত থাকে না ওর স্নায়ু? ব্যাপারটা কি ওর? অসুস্থ নাকি? নাকি লাইফগার্ড লিস্টে নাম নেই দেখে মাথা গরম হয়ে গেছে?

কারও কাছে টর্চ আছে নাকি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল রবি, কারণ আবার আলো চলে যেতে পারে। হয়তো পুরোপুরিই যাবে তখন, আর আসবে না। তার আগেই গণ্ডগোলটা কোনখানে দেখে সেরে রাখতে পারলে কাজ হয়।

কিন্তু বাধা দিল জোসেফ। জেরিকে জিজ্ঞেস করল, 'কার কথা বলছ তুমি? কোন্ মরা ছেলে?'

'হ্যাঁ,' জেরির দিকে তাকিয়ে জোসেফের সঙ্গে সুর মেলাল গেরি, 'কাদের কথা বলছ?'

জেরির দিকে ঘুরে গেল সবাই। এই যেন প্রথম, ভালমত লক্ষ করল ওকে রবি। ঢোলা প্যান্ট আর শার্ট পরেছে সে। এমনিতে বেশ সহজ সরলই মনে হয়। কিন্তু তারপরেও কি যেন একটা রয়েছে ওর মধ্যে। শীতল, আন্তরিকতাহীন।

'অভিশপ্ত এই ক্লাব,' বলতে গিয়ে কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলল জেরি। সরু করে ফেলল চোখের পাতা। 'দুর্ভাগ্যই কেবল মানুষকে টেনে নিয়ে আসে এখানে।'

ওর দিক থেকে আর চোখ সরাচ্ছে না এখন কেউ।

'কি বলতে চাও তুমি?' জিজ্ঞেস করল রবি। হেড গার্ড হিসেবে সবার ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব এখন ওর ওপর। যে ভাবে কথা বলছে জেরি, পছন্দ হচ্ছে না ওর।

নতুন এসেছে সবাই। ভালমত পরিচয়ই হয়নি এখনও কারও সঙ্গে কারোর। ক্লাব খোলার আগেই সদস্যদের মনের মধ্যে একটা বিশ্রী সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়াটা উচিত হচ্ছে না জেরির–রবির অন্তত এ কথাই মনে হচ্ছে।

'প্রতি বছরই গরমকালে এখানে মানুষ মারা যায়,' ঝমঝম ঝরতে থাকা বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে জেরির নিচু গলার কথা বোঝা যায় কি যায় না, 'রহস্যময় মৃত্যু। গত দু'বছর ধরে সুইমিং পুলে ডুবে মানুষ মারা যাচ্ছে।'

'তাই? দু'বছর ধরে একজন মানুষই মারা যাচ্ছে, তাই না?' চেঁচিয়ে উঠল কিং, 'এক কুমিরের ছানা বার বার দেখানো।'

মজা পেল না কেউ। কিং-এর কোন রসিকতাতেই কেউ মজা পায় না। তবে হেসে উঠল সবাই। দুর্বল, অস্বস্তিভরা হাসি।

কেবল জেরি হাসল না। পা তুলে নিল চেয়ারে। উত্তেজনায় চকচক করছে তার কালো চোখ। 'আমি সত্যি বলছি।'

'কি হয়েছিল?' নীরবতার মধ্যে শোনা গেল সুজির গলা। 'কে মারা গিয়েছিল?'

'গত বছর একটা ছেলে,' জেরি বলল। 'পুলে ডুবে মারা যায়। অথচ কাছাকাছিই ডিউটিতে ছিল তিনজন লাইফগার্ড।'

'কি সাংঘাতিক!' সুজি বলল। চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে।

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল রীমা। নিজের স্যান্ডেলের দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ কিছু বলছে না।

'গত বছর একজন লাইফগার্ড মারা গিয়েছিল,' জেরি বলল। 'কল্পনা করতে পারো? লাইফগার্ড! পুলের মধ্যে পানি যেখানে একেবারেই কম, সেখানে ডুবে মারা

গেল।'

আবার বিদ্যুতের চমক, আবার বজ্রপাত।

সবাই চমকে গেল। এমনকি লাইফগার্ডদের হেড রবিও। সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল সে। সবাই গম্ভীর। ভালমত কায়দা করে ফেলেছে ওদেরকে জেরি। জোসেফ একেবারে চুপ।

'সেই ডুবে মরা ছেলেটাই আছর করে আছে এই ক্যাম্পের ওপর,' জেরি বলল। 'ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটাচ্ছে।'

কেউ কিছু বলছে না। ভারী হয়ে উঠেছে নীরবতা।

অবশেষে চিৎকার করে উঠল রবি, 'জব্বর একখান গপ্প শোনালে।'

হেসে উঠল সবাই, জেরি আর জোসেফ বাদে।

'এটা গল্প নয়,' প্রতিবাদ করল জেরি, 'এটা সত্যি।'

'কিন্তু একজন লাইফগার্ড ডোবে কি করে?' কালো চুলে ঝাঁকি দিয়ে সুজি জিজ্ঞেস করল। 'সাঁতার না জানলে লাইফগার্ড হওয়া যায় না।'

'পানিতে নেমে ঘুমিয়ে পড়েছিল হয়তো,' হেসে বলল কিং।

'সাঁতার জানত না আরকি,' গেরি বলল। 'কেবল রোদে বসে থাকাটাই শিখেছিল।'

আবার হেসে উঠল সবাই।

গম্ভীর পরিবেশ কেটে যাচ্ছে। হাঁপ ছাড়ল রবি। জেরি ওকে ঘাবড়েই দিয়েছিল। সবার মাথায় ভূতের ধারণাটা বদ্ধমূল করে দিয়েছিল আরেকটু হলেই।

তারপর সবার হাসি ছাপিয়ে শোনা গেল জোসেফের কণ্ঠ, 'জেরি, তুমি কি সত্যি সত্যি ভূত বিশ্বাস করো?'

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল জেরি, 'করি। আমি জানি, এই ক্লাবটায় ভূতের আছর আছে। ডুবে মরা ছেলেটার প্রেতাত্মা শান্ত হবে না কোনমতে।'

অনেকেই হাসতে লাগল। জেরির কথা অতি নাটকীয় হয়ে গেছে।

কিন্তু থেমে গেল আবার সবাই, যখন হঠাৎ করে ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল কমনরুমের দরজা।

দরজার দিকে তাকাল রবি।

আবার ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল দরজাটা।

পায়ের শব্দ কানে এল। হলঘরে পা টেনে টেনে হাঁটছে কেউ। ফ্লোরবোর্ডে ঘষা লেগে শব্দ হচ্ছে।

হাঁ হয়ে খুলে গেল দরজাটা।

কেউ নেই ওপাশে।

ছয়

বিড়বিড় করে কি বলল জোসেফ, বোঝা গেল না।

ঘাড়ের কাছে শিরশির করে উঠল ওর। অন্য সবার মত সে-ও শুনেছে পায়ের শব্দ। দরজা খুলতে দেখেছে। কিন্তু কেউ ঢুকল না এ ঘরে।

বিচিত্র হাসি দেখা গেল জেরির ঠোঁটে। বিজেতার হাসি। ভূতের ব্যাপারে যেন তাঁর কথা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে।

আর কেউ হাসছে না। রবির চোয়াল ঝুলে পড়েছে। স্তব্ধ হয়ে গেছে সব ক'জন। কান পেতে আছে।

আবার পায়ের শব্দ।

অবশেষে কালো চুলওয়ালা একটা ছেলে ঘরে ঢুকল দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে। ঝাড়া দিয়ে গায়ের উইন্ডব্রেকার থেকে পানি ঝাড়ল। 'সরি,' উইন্ডব্রেকারটা টেনে খুলল সে। 'বাইরের দরজাটা শব্দ করছে,' হাত তুলে হলওয়ের দিকে দেখাল সে। 'আমি ভাবলাম ঠিকমতই লাগিয়েছি। কিন্তু বাতাসে ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল।'

'আর আমরা তো মনে করলাম তুমি ভূত!' রবি বলল।

হেসে উঠল সবাই।

দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো ছেলেটাকে।

জেরির দিকে তাকাল জোসেফ। হতাশ মনে হচ্ছে জেরিকে। নতুন আসা ছেলেটা ভূত নয় বলেই বোধহয়। খিঁচিয়ে রেখেছে চোখ-মুখ।

চারকোনা করে উইন্ডব্রেকারটা ভাঁজ করল ছেলেটা। তারপর ওটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিব্রত বোধ করছে। কোথায় রাখবে যেন বুঝতে পারছে না।

দেখতে ভাল না ছেলেটা। লম্বা কালচে বাদামী চুল পেছন দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঘোড়ার লেজের মত করে বেঁধেছে। তাতে রীতিমত কুৎসিত লাগছে চেহারাটা। বড় বড় কালো বিষণ্ন চোখ। গম্ভীর হয়ে আছে।

এ রকমই থাকে বোধহয় সব সময়। হাসেটাসে না বিশেষ। প্রথম দর্শনে সে-রকমই মনে হলো জোসেফের।

'আমার ব্যাগ ফেলে এসেছি হলঘরে,' ছেলেটা বলল। হাতের আঙুল দিয়ে চিরুনি চালাচ্ছে চুলে। চুলের গিঁটটা টেনেটুনে ঠিক করল। 'সরি, আসতে দেরি করে ফেললাম।' সবার দিকেই তাকাচ্ছে সে, 'আমিই বোধহয় সবার পরে এসেছি?'

'তুমি ডিউক হ্যানসন?' জানতে চাইল রবি।

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা।

'ও, আমার তো চিন্তা হচ্ছিল তোমার জন্যে,' রবি বলল। 'ভাবলাম ঝড়-তুফানে আটকা পড়ে...'

'না না, রওনা হতেও দেরি করে ফেলেছি,' জবাব দিল ডিউক।

হঠাৎ করেই জোসেফের মনে হলো, ডিউককে চেনা চেনা লাগছে। যাক, শেষ পর্যন্ত অপরিচিতের ভিড়ে চেনা মুখ একজন পাওয়া গেল।

বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল তার। হ্যাঁ, তাই তো! ওকে চেনে সে।

এতটাই উত্তেজিত হয়ে গেল, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল জোসেফ, 'হাই, আমাকে চিনতে পারছ?' চিৎকার করে উঠল সে। কয়েক পা এগিয়ে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল।

চোখের পাতা সরু করে ওর দিকে তাকাল ডিউক। তারপর হাঁ হয়ে গেল

চোয়াল। 'আরে, তুমি!'

'চিনতে তাহলে পারছ? আমি জোসেফ উইনার,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল জোসেফ।

অনেকক্ষণ ধরে তার দিকে তাকিয়ে রইল ডিউক। চোখের পাতা মিটমিট করল। ওর মগজে কি চলছে দেখতে পাচ্ছে যেন জোসেফ।

'জোসেফ?' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল ডিউক, 'তুমি জোসেফ?'

মাথা ঝাঁকাল জোসেফ। আশা নিয়ে হাসিমুখে তাকাল ওর দিকে।

অবশেষে অনিশ্চয়তা দূর হয়ে গেল ডিউকের চেহারা থেকে। সে-ও হাসল। 'হাই, জোসেফ!' চিৎকার করে বলল সে, 'চিনতেই পারিনি তোমাকে। তারপর? কেমন চলছে? আরেকটা ছুটি কাটাতে এলে বুঝি?'

'হ্যাঁ। না এসে আর থাকতে পারলাম না,' জবাব দিল জোসেফ। খুশি লাগছে ওর। একজন অন্তত ওকে চিনতে পেরেছে।

রবির দিকে তাকাল জোসেফ। রবিও হাসছে।

'তো, কেমন বুঝছ?' কথার কথা জিজ্ঞেস করল জোসেফ।

কাঁধ ঝাঁকাল ডিউক। 'তুফান একখান হচ্ছে বটে, তাই না?' অপ্রাসঙ্গিক কথা।

'হ্যাঁ।' জবাব দিল জোসেফ।

ডিউকের কাছে এসে দাঁড়াল রবি। পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল অন্য লাইফগার্ডদের সঙ্গে। প্রতিটি নাম শুনে শুনে বিড়বিড় করে আওড়াল ডিউক, যেন মুখস্থ করে নিচ্ছে।

হলুদ বর্ষাতি পরা একজন লোক এসে ঢুকল ঘরে।

'ও, ব্র্যান্ডন, এসে গেছেন,' রবি বলল।

এই লোকই অ্যাথলেটিক ডিরেক্টর লিওনার্ড ব্র্যান্ডন, অনুমান করতে অসুবিধে হলো না জোসেফের। বয়েসে তরুণ। বেঁটেই বলা চলে। গাট্টাগোট্টা। দুই গাল আপেলের মত লাল। কুতকুতে, মার্বেলের মত গোল গোল নীল রঙের চোখ। খাটো করে ছাঁটা হালকা বাদামী চুল

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল সে খুব দ্রুত হেঁটে। ঝাড়া দিয়ে হলুদ বর্ষাতি থেকে পানি ফেলল।

হাসি পেল জোসেফের। ব্র্যান্ডনকে রীতিমত একটা হাঁসের মত লাগল তার।

'এই যে, লোকেরা,' হাঁক ছাড়ল সে, 'কেমন আছো? কাটছে কেমন?' স্বাগত জানাল সে। জেরির দিকে তাকিয়ে হাসল। 'সবাইকেই জিজ্ঞেস করছি। খুশি তো তোমরা? শুকনোই আছো?' দ্রুত যেমন হাঁটে, কথাও বলে দ্রুত। কথা বলার সময় দম ফেলে না। কিংবা অন্য কাউকে বলার সুযোগ দেয় না।

'এ বছর আমাকে সাহায্য করতে হবে তোমাদের,' ডেস্কের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল তার হলুদ বর্ষাতিটা। 'তোমরা হয়তো জানো না, এটা আমার পয়লা বছর।'

সবাই ঘিরে এল ব্র্যান্ডনকে। একসঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু জোসেফ গেল না তার কাছে। বরং জানালার কাছে সরে এল।

জোসেফ ভাবল, কই, এর সঙ্গে আগে তো কখনও দেখা হয়নি আমার। তাহলে তার ইন্টারভিউ নিল কে? কার্ড পাঠাল কে?

'এই, শোনো,' কলরব করতে থাকা ছেলেমেয়েদের দিকে দুই হাত তুলল ব্র্যান্ডন, থামতে ইশারা করল। 'প্রত্যেককেই শিফট মেনে কাজ করতে হবে। রবি বলেছে এটা তোমাদের? থাকার ঘর দেখিয়েছে? একেক কামরায় দুজন করে থাকতে হবে। না, ছেলে আর মেয়ে একসঙ্গে থাকা চলবে না। ছেলেরা আলাদা, মেয়েরা আলাদা।'

হেসে উঠল কেউ কেউ।

'কিং, তোমার রুমমেট কে?' চাঁপাকলার মত মোটা একটা আঙুল তুলল তার দিকে ব্র্যান্ডন।

'ওর মা। দুদু খায় তো এখনও,' চেঁচিয়ে উঠল গেরি। 'মাকে সঙ্গে না নিয়ে ঘুমাতে পারে না।'

আবার হাসাহাসি। মুখ লাল হয়ে গেল কিং-এর। আলতো ধাক্কা মারল গেরির বুকে।

'ডিউক থাকবে কিং-এর ঘরে,' ঘোষণা করল রবি। ডিউকের দিকে ওর চোখ। 'দুঃসংবাদটা শোনানোর সুযোগ পাইনি এতক্ষণ।'

'হাহ্-হাহ্!' জোরে জোরে হাসল কিং। 'দারুণ একটা মজার কথা শোনালে হে।'

'আর তুমি থাকছ নিশ্চয় গেরির সঙ্গে?' রবিকে জিজ্ঞেস করল ব্র্যান্ডন। ডেস্ক ড্রয়ার থেকে একটা ক্লিপবোর্ড তুলে নিল।

'তাতে আমার আপত্তি নেই,' জবাব দিল রবি। 'সুজি আর রীমা থাকুক বড় ঘরটাতে।'

'হ্যাঁ, সে-ই ভাল,' মেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল ব্র্যান্ডন। 'সুইটস ফর দা সুইটস। হাহ্ হা!'

গুঙিয়ে উঠল কেউ কেউ। ব্র্যান্ডনের রসিকতাও পছন্দ হয়নি।

'তারপর আছে জেরি আর...' থেমে গেল রবি। হঠাৎ করেই যেন মনে পড়েছে জোসেফের কথা। ব্র্যান্ডনের ক্লিপবোর্ডটার দিকে হাত বাড়াল, 'দেখি তো? একটু গণ্ডগোল হয়ে গেছে।' জোসেফের দিকে তাকাল।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে এখনও জোসেফ। বিদ্যুৎ চমকানো, বাজ পড়া বন্ধ হয়েছে। বৃষ্টিও কমে এসেছে। এখন অনেক পাতলা। ঝিরঝির করে পড়ছে।

ব্র্যান্ডনকে ওর নাম নিতে শুনল জোসেফ। বার বার চোখ তুলে তাকাতে লাগল দুজনে ওর দিকে। ক্লিপবোর্ডের দিকে তাকাল।

অবশেষে দ্রুতপায়ে ওর দিকে এগিয়ে এল ব্র্যান্ডন। হাসিমুখে, নীল চোখে ওকে দেখতে দেখতে বলল, 'জোসেফ? হাই! আমি লিওনার্ড।'

হাত মেলাল দুজনে। ব্র্যান্ডনের বৃষ্টিতে ভেজা হাতটা এখনও ভেজাই রয়েছে। 'কোনভাবে লিস্ট থেকে বাদ পড়ে গেছে তোমার নামটা।' বোর্ডটা চোখের সামনে এনে আবার দেখতে শুরু করল। 'কবে তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার? শীতের শেষে? বসন্তে?'

'আমার ঠিক মনে পড়ছে না,' জোসেফ বলল।

'আমারও না,' মোটা আঙুল দিয়ে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মত চ্যাপ্টা মাথাটা চুলকাল

ব্র্যাডন। 'কিন্তু ইন্টারভিউ তো নিশ্চয় নিয়েছি। ইন্টারভিউ ছাড়া কাউকে বহাল করিনি আমি। তোমার ফাইলটা চেক করলেই জানা যাবে কবে কোথায় তোমার ইন্টারভিউ নিয়েছি।'

'আই-ডি কার্ড আছে আমার...' কথাটা শেষ করল না জোসেফ। কি বলবে বুঝতে পারছে না। কবে ওর সঙ্গে কথা বলেছে, মনে করতে পারছে না কেন? 'গত গ্রীষ্মে এখানে লাইফগার্ডের কাজ করে গেছি আমি। আর...'

হাসিটা লেগে আছে ব্র্যাডনের ঠোঁটে। 'আর কি?'

অস্বস্তি বোধ করছে জোসেফ। ব্র্যাডনের কাঁধের ওপর দিয়ে ডিউকের দিকে চোখ পড়ল। ওর ওপর স্থির হয়ে আছে ডিউকের কালো চোখের দৃষ্টি। কিন্তু ওর কাছ থেকে কোন সহযোগিতা পেল না জোসেফ।

'একসঙ্গে হাজারটা কাজ করতে হয় আমাকে। অনেক সময় ভুলও করে ফেলি,' ব্র্যাডন বলল। আবার ক্লিপবোর্ডের দিকে তাকাল সে। 'সরি, জোসেফ, তোমাকে জায়গা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।'

ঢোক গিলল জোসেফ। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল অদ্ভুতভাবে। 'কি বলছেন! এ সময়ে আমি...কোথায় যাব? কে আমাকে অসময়ে চাকরি দেবে?'

ওর দিকে তাকিয়ে আছে ব্র্যাডন। 'তোমার সমস্ত লাইফসেভিং টেস্টে পাস করেছ?'

মাথা ঝাঁকাল জোসেফ। 'হ্যাঁ, দুই বছর আগে।'

চোয়াল ডলল ব্র্যাডন। 'তোমার কথা আমার মনে পড়া উচিত ছিল।' আবার বিড়বিড় করল সে, 'অদ্ভুত কাণ্ড! নিজে যদি ইন্টারভিউ নিয়ে থাকি একটুও মনে পড়ছে না কেন!' ক্লিপবোর্ডের দিকে তাকাল আবার। তারপর রবির দিকে ফিরল। 'অলটারনেট হিসেবে রেখে দিতে পারো ওকে, জোসেফকে। শেফিল্ডের ওই ছেলেটা আসছে না। জানিয়ে দিয়েছে এর চেয়ে ভাল অফার পেয়ে গেছে হয়তো।'

'তোমার চলবে এতে?' জোসেফকে জিজ্ঞেস করল রবি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জোসেফ। বাড়ি চলে যাওয়া আর লাগল না ওর।

'চলবে!' এককথায় জবাব দিয়ে দিল জোসেফ। 'তারমানে স্ট্যান্ডবাই থাকতে হবে আমাকে। কারও বদলে প্রয়োজন হলে...'

'স্ট্যান্ডবাই আসলে থাকা লাগবে না তোমার,' শুকনো কণ্ঠে গেরি বলল। 'যা সব উদ্ভট চরিত্র জোগাড় করা হয়েছে! এরা দেবে লাইফগার্ডের ডিউটি! আহা! দেখো, তোমাকেই প্রয়োজন পড়বে সবচেয়ে বেশি।'

'জেরির ঘরেই থাকতে পারবে ও,' রবি বলল। কাউচের পাশে দাঁড়ানো জেরির দিকে তাকাল সে। 'যদি কোন ভূতকে সঙ্গী হিসেবে রাখার ইচ্ছে না হয়ে থাকে ওর।'

'হেসো না, বুঝলে,' শান্তকণ্ঠে বলল জেরি, 'অত হেসো না। হাসিটা থাকবে না বলে দিলাম।'

জোসেফের দিকে তাকাল ব্র্যাডন, 'তাহলে তুমি রাজি?'

'হ্যাঁ। থ্যাংকস।'

'ঠিক আছে। তুমি খুশি হলেই খুশি।' ঘুরে অন্যদের দিকে তাকাল ব্র্যাডন।

'ডিনারের সময় তো হয়ে গেল। ডিনার কোথায় করতে হবে নিশ্চয় দেখেছ?' হাতের ক্লিপবোর্ড তুলে দেখাল কমন রুমের শেষ মাথার সুইংগিং হাফ-ডোরটা। 'গেরি, তোমাকে অত মোটা লাগছে কেন? চর্বি জমিয়েছ নাকি?'

'না না, কি যে বলেন!' রেগে উঠল গেরি। 'আপনি ভাল করেই জানেন, রোজ ব্যায়াম করি আমি। কোনদিন বাদ দিই না। আজও যাব, ডিনারের পর সোজা ওয়েইট রুমে। আমাকে বাদ দিয়ে যদি অন্য কাউকে নেয়ার ইচ্ছে হয়ে থাকে...'

'নিতে পারলেই ভাল হত,' জবাব দিল ব্র্যান্ডন। নীল চোখজোড়া তারার মত মিটমিট করছে।

'ভার তোলা আমারও প্রতিদিনের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে,' কিং বলল।

কোন কথা থেকে কোন কথা।

মুখ বাঁকাল ব্র্যান্ডন। 'প্লীজ, কিং, পচা রসিকতাগুলো অন্তত আজকের জন্যে বাদ দাও। আর করতে ইচ্ছে করলে মনে মনে করো, নিজে নিজেই হাসো।'

হেসে উঠল বেশির ভাগ।

'আমি রসিকতা করছি না,' গম্ভীর মুখে প্রতিবাদ করল কিং। 'শরীরটা ছোট হতে পারে আমার, তাই বলে পেশী কম নেই। সারা গায়েই পেশী।'

'নাহ্, আমাকে পালাতে হচ্ছে,' হলুদ বর্ষাতিটা টান দিয়ে তুলে নিল ব্র্যান্ডন। 'মনে রেখো, কাল সকাল নয়টায় খুলব আমরা। ততক্ষণে বৃষ্টি থেমে যাবে। খুলতে অসুবিধে হবে না আমাদের। তাহলে, শিফটিং ডিউটি করতে রাজি আছ তোমরা, তাই তো? আর...'

'আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা ছিল,' বলতে বলতে সামনে গিয়ে ব্র্যান্ডনের পথরোধ করে দাঁড়াল রীমা।

'বলো?' হাসিমুখে বলল ব্র্যান্ডন। 'সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে কখনোই খারাপ লাগে না আমার।'

জোসেফ লক্ষ করল, ওদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে জেরি।

'সকাল বেলা উঠেই কোন ছেলেকে পুলে ভাসতে দেখলে খুশি হব না আমি,' খসখসে কণ্ঠে জানিয়ে দিল রীমা। 'সকালে ঘুম ভেঙে উঠে ভাল কিছু দেখার আশা করব আমি।'

'না দেখার কোন কারণ নেই...' ব্র্যান্ডন বলল। 'যাই হোক, তোমাদের ভালমন্দ সব কিছু দেখার ভার রবির।'

রবির দিকে তাকাল রীমা। 'আমাকে পুলে ডিউটি না দিলেই খুশি হব। সুজি নিশ্চয় ভাল সামলাতে পারবে বাচ্চাদের। তাকে দিলেই ভাল হয়।'

'না না!' চিৎকার করে উঠল সুজি। 'আমাকে কেন?'

ওর রাগ দেখে অবাক হলো জোসেফ। একজন আরেকজনকে দেখতে পারে না ওরা, সেটা বহু আগে লক্ষ করেছে সে। সুজি যখনই রীমার দিকে তাকিয়েছে, চোখে আগুন দেখা গেছে ওর।

সুজির নজর গেরির দিকে। আর গেরিকে রীমার প্রতি আগ্রহী হতে দেখে রীমাকে অপছন্দ সুজির।

'দেখা যাক, ভেবেচিন্তেই শিডিউল করা হবে,' রবি বলল। 'সব সময়

একজনকেই পুরো ডিউটি দিয়ে রাখতে হবে, এমন কোন কথা নেই। ভাগাভাগি করে ডিউটি করতে হবে।'

চুপ হয়ে গেল রীমা।

দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল ব্র্যান্ডন। গায়ে ঝাঁকি খেতে থাকল তার হলুদ বর্ষাতির কোনা।

অনেকটা ভাল বোধ করছে এখন জোসেফ। নিজেকে অবাঞ্ছিত মনে হচ্ছে না আর। অধীর হয়ে অপেক্ষা করেছে গ্রীষ্মকালটার জন্যে। এই ক্লাবে ফিরে আসার জন্যে। চমৎকার আরেকটা ছুটি কাটানোর জন্যে। কোন কিছুর বিনিময়েই এই আনন্দ হাতছাড়া করতে রাজি হত না সে।

ঘুরে ডিউকের দিকে তাকাল সে। জেরির সঙ্গে কথা বলছে ডিউক। ওর দিকে তাকিয়ে থেকে ওর কথা মনে করার চেষ্টা করল জোসেফ।

ডিউক হ্যানসন। ডিউক হ্যানসন।

ওর সম্পর্কে কি কি জানে সে? নিজেকে প্রশ্ন করল জোসেফ। আঁতিপাতি করে খুঁজতে লাগল নিজের মনের মধ্যে।

ডিউক হ্যানসন...

ডিউক হ্যানসন...

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবতে লাগল জোসেফ। সাদা, ঢোলা, এক সাইজ বড় টি-শার্ট গায়ে দিয়েছে ডিউক পরনে কালো রঙের ডেনিম কাটঅফ। কালো চোখ। রাশভারী ভঙ্গি করে জেরির কথা শুনছে।

ডিউকের দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল জোসেফ, ওর সম্পর্কে কোন কিছুই জানে না সে। একটা কথাও মনে করতে পারছে না।

সাত

ভাল কাটল ডিনারের সময়টা। যতক্ষণ না আবার ভূতের আলোচনা শুরু করল জেরি।

খাবারটা খুবই ভাল। অবাক করল রবিকে। এতটা ভাল এখানে আশা করেনি। ফ্রাইড চিকেনটা দারুণ হয়েছে। খুব ভাল বাবুর্চি। অন্যান্য খাবারও চমৎকার। এমনকি বেশি করে লবণ ছিটিয়ে নিলে ম্যাশ্‌ড্ পটেটোর স্বাদটাও খারাপ লাগে না।

ম্যাশ্‌ড্ পটেটো নিয়েই কাড়াকাড়ি শুরু করে দিল কিং আর গেরি। কিন্তু রীমার একটিমাত্র নাক-কুঁচকানো দৃষ্টিই আলুর বাটির প্রতি গেরির আগ্রহ হারানোর জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেল। বাটিটা ছেড়ে দিল সে।

ডিনারের পুরোটা সময় কথার খোঁচাখুঁচি চালিয়ে গেল সুজি আর রীমা। ব্যাপারটা অবাক করল রবিকে। গেরির মধ্যে কি দেখেছে মেয়ে দুটো? ওর মাথার লাল রুমাল? লাল কাপড় ষাঁড়কে রাগিয়ে দেয় জানত, কিন্তু মেয়েদের আকৃষ্ট করে, জানা ছিল না। সত্যি কিনা পরখ করে দেখার জন্যে সে নিজেও একটা লাল রুমাল

বেঁধে নেবে কিনা ভাবল, কিন্তু পরক্ষণে বাতিল করে দিল ভাবনাটা। হেড লাইফগার্ডের অনেক ভারভারিক্কি হওয়া দরকার, ছেলেমানুষী করলে কেউ আর মানতে চাইবে না।

গেরিটা হ্যাংলাও বটে—রবির তা-ই মনে হলো। কেমন নির্লজ্জের মতে নিজের দেহের প্রশংসা করে যাচ্ছে। প্রতিদিন কতটা ব্যায়াম করে এ রকম স্বাস্থ্য বানাতে হয়েছে, সবিস্তারে বর্ণনা করছে। একটু পর পরই বলছে, 'আমি হলামগে এখানে একমাত্র লোক, যাকে দেখলে লাইফগার্ড মনে হয়।'

আর সহ্য করতে পারল না রবি। 'দোহাই গেরি, তোমার বাগাড়ম্বর দয়া করে থামাবে? তোমার চেয়ে মাস্‌ল্‌ কারও কম না, এই দেখো,' নিজের বাহু বাঁকা করে পেশী ফুলিয়ে দেখাল সে।

ডিউকও কম যায় না, বোঝা গেল ওর কথা থেকে, 'তোমাদের দুজনকে চোখ বন্ধ করে টিট করে দিতে পারি আমি।'

ওর এই আচরণে অবাক হলো সবাই। শান্তশিষ্ট ডিউক যে এমন মুখর হয়ে উঠবে, কল্পনা করেনি কেউ। চুপচাপ কথা বলছিল জেরির সঙ্গে। হঠাৎ কি হয়ে গেল ওর?

তবে কিং-এর কোন পরিবর্তন হয়নি। যে কিং সে, সেই কিংই রয়ে গেছে। থেকে থেকেই নীরস রসিকতা করছে, হাসার বদলে বিরক্ত হচ্ছে সবাই, গুঙিয়ে উঠছে কেউ, টিটকারি দিতে ছাড়ছে না—কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না তার সে চালিয়েই যাচ্ছে। চিঙড়ি মাছের শরীর, অথচ বোঝানোর চেষ্টা করছে সে কত্তবড় বীর। একটু পর পর আড়চোখে তাকাচ্ছে জোসেফের দিকে। তাকেই প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। যদিও জোসেফের স্বাস্থ্য তারচেয়ে অনেক অনেক ভাল। মাথায় তুলে আছাড় মারতে পারে।

কিং তাকাতে থাকলেও, পারতপক্ষে তার দিকে তাকাচ্ছে না জোসেফ। খাবার খেয়ে চলেছে একমনে। তার আগ্রহ ডিউকের প্রতি। খাবারের ফাঁকে ফাঁকে কারও দিকে যদি তাকায়, তাহলে ডিউকের দিকেই তাকাচ্ছে।

ডিউক যখন গত গ্রীষ্মের আলোচনা শুরু করল, কান খাড়া করে ফেলল জোসেফ। খাওয়া থামিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল যখন লাইফগার্ডদের বদনাম শুরু করল ডিউক।

'ডরমিটরিটাকে পুরোপুরি খোঁয়াড় বানিয়ে ফেলেছিল ওরা,' ডিউকের কালো চোখ চকচক করছে। 'জানোয়ারেরও অধম। প্রতি রাতে পার্টি দিত। হায়েনারা মড়া নিয়ে টানাটানি করে, দেখেছ? ওরকম করত। তারচেয়ে খারাপ।'

'দেখা যাক, এবার কেমন কাটে,' গেরি বলল। রীমার দিকে তাকিয়ে হাসল। সুর করে বলতে শুরু করল, 'পার-টি! পার-টি! পার-টি! পার-টি!'

উঠে গিয়ে ফায়ারপ্লেসের জ্বলন্ত কাঠগুলোকে খোঁচাতে শুরু করল রীমা। গনগনে লাল কয়লায় খোঁচা পড়তে লাফিয়ে উঠল আগুন।

অবাক চোখে ওর দিকে তাকাল রবি। আগুনের এত কি দরকার পড়ল ওর? জুন মাস। এখন শীত কোথায়?

কিন্তু রীমা বলতেই থাকল, তার ঠাণ্ডা লাগছে। আগুন ছাড়া হবে না।

ফায়ারপ্লেসের পাশে লাকড়ির স্তূপ। আগুন ধরাতে অসুবিধে নেই। সুতরাং যা খুশি করুক সে। কেউ কিছু বলতে গেল না।

তৃতীয়বার প্লেটে মুরগীর মাংস আর ম্যাশ্ড্ পটেটো তুলে নিল রবি। চমৎকার রান্না! মনে মনে আরেকবার প্রশংসা না করে পারল না সে।

ফিরে এসে বসল রীমা। আগুনের আঁচে লাল হয়ে গেছে মুখ-চোখ। একঘেয়ে কণ্ঠে গত গ্রীষ্মকালের গুণগান করেই চলেছে ডিউক—আহা, কত নাকি ভাল ছিল!

হঠাৎ করে এমন একটা প্রশ্ন করে বসল জোসেফ, চমকে গেল সবাই। বন্ধ হয়ে গেল সব আলোচনা। ডিউককে জিজ্ঞেস করল জোসেফ, 'গত বছর ছেলেটা যখন ডুবে মারা গেল, তোমার ডিউটি ছিল নাকি তখন?'

গলায় চা আটকে গেল ডিউকের। বিষম খেল। গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল, 'আমি ওখানে ছিলাম না, জোসেফ। সেদিন ক্লাবেই ছিলাম না। পরে শুনেছি।'

স্তব্ধ হয়ে গেছে পুরো ঘর। কেবল ফায়ারপ্লেসে আগুনের চড়চড় ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

'ভূতের কথা বলেছিল নাকি কেউ?' জানতে চাইল জোসেফ।

বুঝতে পারল না ডিউক। 'ভূত?'

'আমি জানতে চাইছি, কেউ উদ্ভট কিছু দেখেছে নাকি?' জোসেফ জিজ্ঞেস করল। অস্বস্তি বোধ করছে, টেবিলে টাট্টু বাজানো দেখেই বোঝা যায়। 'মানে, আমার প্রশ্ন, লাইফগার্ডদের কেউ ডুবে মরা কোন ছেলেকে দেখেছে নাকি পুলে?'

আগুনের মধ্যে কুঁকড়ে খচমচ করে উঠল শুকনো বাকল। সামনের দিকটা পুড়ে গিয়ে ভার সামলাতে না পেরে উল্টে পড়ল লাকড়ি। ছিটিয়ে দিল গরম ছাই আর কয়লার টুকরো। লাকড়িগুলো ঠিক করে দিতে উঠে গেল আবার রীমা।

টেবিলের অন্যপাশ থেকে জোসেফের দিকে তাকিয়ে আছে ডিউক। মনে হচ্ছে যেন ওর কথা বুঝতে পারছে না।

'ভূত আছে এখানে,' মোলায়েম স্বরে বলল জেরি। ধীরে ধীরে চোখ বোলাল ডাইনিং টেবিল ঘিরে থাকা মুখগুলোর দিকে। 'সবাই জানে ওদের কথা।'

এমন ভঙ্গিতে বলল জেরি, ভূতে বিশ্বাস না করলেও রবির গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

'দেখো, জেরি,' মুখভর্তি মুরগির মাংস চিবাতে চিবাতে টিটকারি দিল গেরি, 'তোমার এই ভূতের গপ্পোগুলো হ্যালোউইন পার্টির জন্যে তুলে রাখো, কাজে লাগবে।'

'ঠিক,' কিংও সুর মেলাল। 'ওসব ফালতু আলোচনা বাদ দাও। ভাল্লাগছে না।'

'কেন, রাতে ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখবে নাকি?' বাঁকা সুরে জেরি বলল।

'তুমি নিজেই তো একটা দুঃস্বপ্ন!' খেঁকিয়ে উঠল কিং। তেমন সাংঘাতিক কোন রসিকতা হলো না। কিন্তু হেসে উঠল রীমা আর সুজি।

'প্রসঙ্গটা বাদ দাও না,' ঝগড়া বাধার ভয়ে তাড়াতাড়ি বলল রবি।

কিন্তু থামাতে পারল না। গাল লাল হয়ে গেছে জেরির। ছুরির বাঁটটা শক্ত করে চেপে ধরল। চোখ গরম করে তাকাল কিং-এর দিকে। 'খুব চালাক ভাবো নিজেকে, তাই না? কিন্তু একটা কথা শুনে রাখো, এখানে পুলের পানিতে যারা ডুবে মরেছে,

জায়গা ছেড়ে যায়নি, এখনও তাদের প্রেতাত্মা।'

ব্যঙ্গ করে জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল কিং, কিন্তু দেয়া আর হলো না। বরফের মত জমিয়ে দিল ওকে মেয়েকণ্ঠের চিৎকার।

আরেকটু হলেই চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিল রবি। ফিরে তাকাল। কে চিৎকার করেছে দেখার জন্যে।

রীমা। আগুনের আলোয় মুখ লাল। দরজার দিকে হাত তুলে রেখেছে। থরথর করে কাঁপছে সে।

'ভূত!' আতঙ্কিত চিৎকার করে উঠল সে আবার। 'ওই যে!'

আট

রীমার নির্দেশিত দিকে ফিরে তাকাল সবাই।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল জেরি। চিৎকার করে উঠল, 'জানতাম! আমি জানতাম! কই? কোনখানে?'

আবার দরজার দিকে দেখাল রীমা। কিন্তু সামলাতে পারল না আর। অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। তীক্ষ্ণ হাসি। এক হাতে মুখ ধরে রেখে, চোখ বন্ধ করে হাসছে।

হি-হি করে হাসতে হাসতে বলল, 'কেমন বোকা বানালাম সব ক'টাকে!'

ধাক্কাটা সামলাতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল। তারপর একে একে বাকি সবাই হাসতে শুরু করল। কেবল জেরি বাদে। আর জোসেফ।

এখনও দাঁড়িয়ে আছে জেরি। দুই হাতে টেবিলের কিনার খামচে ধরেছে। শক্ত হয়ে গেছে চোয়াল। রাগে ফুঁসছে।

তারপর হঠাৎ বিকট চিৎকার দিয়ে উঠল। বিস্ফোরিত হলো রাগটা।

শীতল কালো চোখজোড়া ঘুরে বেড়াতে লাগল সবার মুখের ওপর। চেঁচিয়ে বলল, 'দেখা যাবে ছুটির শেষে ক'জনের মুখে হাসিটা থাকে!' নিজের এঁটো প্লেটের ওপর ছুঁড়ে ফেলল ন্যাপকিনটা। তারপর ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে গটমট করে সরে গেল সেখান থেকে।

তার রাগ দেখে হাসি বন্ধ হয়ে গেছে সবার। তবে কিং হাসছে এখনও।

'অ্যাই, জেরি,' ডাক দিল রবি, 'শোনো! শুনে যাও।'

কিন্তু কানেও তুলল না জেরি। বেরিয়ে গিয়ে পেছনে দড়াম করে লাগিয়ে দিল পাল্লাটা।

ভাল লাগল না রবির। বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল সে। শুরুতেই এমন একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটবে, ভাবতে পারেনি। কাল সকালে সবার ভাল মেজাজ নিয়ে কাজ শুরু করা দরকার ছিল। প্রথম রাতেই চিৎকার-চেঁচামেচি আর দরজা পিটাপিটি করে কি একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলল!

এ সব বিভিন্ন মেজাজের লাইফগার্ডের দল নিয়ে এবারের গ্রীষ্মটা কি করে কাটবে, ভেবে শঙ্কিত হলো রবি।

'জেরির সঙ্গে এ রকম করাটা ঠিক হয়নি আমাদের,' সবাইকে বলল সে।

'তার কি এমন করা ঠিক হয়েছে?' ভুরু নাচাল কিং।

'এ সব ভূতের গল্পের কি কোন মানে হয়?' বিরক্ত কণ্ঠে বলল সুজি। 'অকারণে মানুষের মনকে বিষিয়ে দেয়া। কার ভাল্লাগে এ সব। এবারের গ্রীষ্মটা কেমন কাটবে তাই ভাবছি এখন! আদৌ মজা-টজা কিছু হবে কিনা…নাকি সারাটা সময় বসে বসে খালি ভূতের গল্প করব আর ঝগড়া করব!'

'দোষটা…দোষটা আসলে আমার,' খাবারের প্লেটের দিকে তাকিয়ে বলল জোসেফ। খাবারগুলো ছুঁয়েও দেখেনি। 'ডিউককে কথাটা জিজ্ঞেস করাই ভুল হয়েছে…' শেষ দিকে কি যেন বলল; এতই আস্তে, কিছু বোঝা গেল না।

আগুন খুঁচিয়ে চলেছে এখনও রীমা। 'এত বদমেজাজী মানুষের আবার ভূতের গল্প বলা কেন? জানা কথাই তো কেউ কেউ বিশ্বাস করবে না, টিটকারি দেবে…'

'হাই, বুকার,' রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে বাবুর্চিকে ডেকে জিজ্ঞেস করল রবি, 'আর কিছু আছে নাকি? মিষ্টি-টিষ্টি?'

ডিউক আর গেরি যখন টেবিলের শেষ মাথায় পাঞ্জা কষার লড়াই শুরু করল, খুশি হলো সে। আবার স্বাভাবিক মেজাজে ফিরে আসছে সবাই। হেসে, চেঁচিয়ে দুজনকে উৎসাহ দিতে লাগল রবি।

'যে জিতবে তার সঙ্গে আমার লড়াই,' ঘোষণা করে দিল কিং।

হেসে উঠল সবাই।

কিন্তু কিং হাসল না। মুখ গম্ভীর করে রেখে ভারিক্কি চালে বলল, 'কিন্তু দেখতে রোগা হলে কি হবে, আসলে আমি বাঘের বাচ্চা। সাহস থাকলে লেগে দেখো।'

'আমার সঙ্গে লাগবে?' ফায়ারপ্লেসের কাছ থেকে হেসে জিজ্ঞেস করল রীমা। হাত বাঁকা করে পেশী ফুলিয়ে দেখাল।

পাত্তাই দিল না তাকে কিং। আগের কথাটাই বলল, 'যে জিতবে তার সঙ্গে আমার লড়াই।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ওর দিকে রবি। বিশ্বাস করতে পারছে না। সত্যি কি লড়তে চাইছে কিং? এ কি সম্ভব? ও কি জানে না, চিংড়ি মাছের ক্ষমতাও নেই ওর শরীরে? মশার মত টিপে মেরে ফেলতে পারে ওকে গেরি কিংবা ডিউক।

মুখে মুখে নিজেকে বলবান প্রমাণ করতে চাইছে বেচারা কিং। ব্যাপারটা একদিকে যেমন হাসির, তেমনি দুঃখজনকও বটে।

কোকের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে গ্লাসটা রেখে উঠে দাঁড়াল রবি, লড়াইটা ভালমত দেখার জন্যে।

শুরুতে কেবল বড় বড় কথা বলছিল গেরি আর ডিউক। বাগাড়ম্বর।

বাঁকা হাসি হেসে ডিউককে টিটকারি দিচ্ছিল গেরি। গেরিও কম যায়নি। লাল কড়ে আঙুল দেখিয়ে বলেছে, এক আঙুলেই ডিউককে কাত করে দিতে পারে।

প্রথম দিকে হাসি-ঠাট্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ব্যাপারটা।

তারপর হঠাৎ করেই সিরিয়াস হয়ে গেল দুজনে। পাঞ্জা কষা শুরু হয়ে গেল।

সরু হয়ে এসেছে ডিউকের কালো চোখের পাতা। দাঁতে দাঁত চেপে রাখার ফলে ফুলে উঠেছে চোয়ালের হাড়।

টান দিয়ে লাল রুমাল খুলে নিয়ে মেঝেতে আছড়ে ফেলল গেরি। ডিউকের হাতটাকে কাত করে ফেলার চেষ্টায় বিন্দু বিন্দু ঘাম বেরিয়ে এল চওড়া কপালে।

পুরোপুরি নীরব হয়ে গেছে ঘরটা।

আচমকা মৃদু একটা গোঙানি ছেড়ে গেরির হাতটা কাত করে টেবিলের কাছাকাছি নিয়ে গেল ডিউক।

তুলে রাখার চেষ্টায় মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে গেরির। তারপর এক ঝটকায় ডিউকের হাত সহ তুলে ফেলল আবার হাতটা।

কয়েক সেকেন্ড স্থির রইল দুটো হাতই। দুজনেরই টানটান অবস্থা। দুজনেই ঘামছে।

বড় বেশি সিরিয়াসলি নিয়ে ফেলেছে ওরা, ভাবল রবি। হালকাভাবে নিলেও পারত। একজন অন্তত স্বাভাবিক হয়ে ঢিল দিয়ে দিক।

গর্জে উঠল গেরি। চাপ বাড়িয়ে দিল ডিউকের হাতে। বাড়ছে! বাড়ছে!

এক ইঞ্চি কাত হয়ে গেল ডিউকের হাত।

ছেড়ে দাও, ডিউক! নীরবে প্রার্থনা করল রবি। প্লীজ, শেষ করো এ সব উত্তেজনার! ভাল কিছু ঘটবে না এতে!

সুযোগ বুঝে আরও চাপ বাড়াল গেরি। ঠেকাতে পারছে না ডিউক। নিচে নামছে তার হাত। আরও নিচে।

নীরব হয়ে আছে পুরো ঘর।

মট করে শব্দ হলো। হাড়া ভাঙার মত শব্দ।

সাদা হয়ে গেল ডিউকের মুখ।

নয়

ভয়াবহ শব্দটা কানে আসতে আপনাআপনি বুজে গেল জোসেফের চোখের পাতা। দাঁত বসে গেল জিভের ওপর।

আবার চোখ মেলে দেখল, টেবিলের অন্য মাথায় বসা ডিউকের মুখটা কাগজের মত সাদা।

টেবিলে নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে পড়ে আছে তার হাতটা।

গেরির চোখ জোড়া ঠেলে বেরিয়ে এসেছে কোটর থেকে। খুলে চলে আসতে চাইছে। হাঁ হয়ে গেছে মুখ।

কেউ টুঁ শব্দ করছে না।

তারপর, হঠাৎ করেই আবার শব্দ হলো–রীমার উচ্চকিত হাসির শব্দ। ভেঙে খানখান করে দিল নীরবতা।

ফিরে তাকাল জোসেফ। দেখে রীমার দুই হাতে একটা শুকনো ডালের দুটো ভাঙা টুকরো।

খিলখিল করে হেসেই চলেছে রীমা। ডালের মাথা দুটো দিয়ে বাড়ি মারছে

একটা আরেকটার সঙ্গে।

'রীমা!' চিৎকার করে উঠল সুজি। 'সব রীমার শয়তানি!'

শব্দ রহস্য এতক্ষণে পরিষ্কার হলো জোসেফের কাছে। ডিউকের হাড় ভাঙেনি। রীমা ডাল ভেঙে ওরকম শব্দ করেছে।

কি মেয়েরে বাবা!

জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে এখনও ডিউকের। কালো চোখ দুটো কেমন নিষ্প্রাণ। তবে গালের রঙ ফিরতে আরম্ভ করেছে।

হেসে উঠে টেবিলে চাপড় মারল গেরি। যতটা আনন্দে, তারচেয়ে বেশি স্বস্তিতে। ডিউকের হাত ভাঙার দায়টা তার ঘাড়ে পড়েনি বলে।

সবাই হাসতে শুরু করল। অস্বস্তি কাটেনি এখনও অনেকের, হাসিতেই বোঝা গেল।

'কি, মহা শয়তান মনে হচ্ছে না আমাকে?' চোখে মিটমিটে হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করল রীমা।

হাত ঝাঁকাতে লাগল ডিউক। তারপর হাতের তালুটা চোখের সামনে তুলে এনে দেখতে লাগল। 'বাঁচলাম, বাবা! ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম, সত্যি সত্যি আমার হাতটা বুঝি গেল। ব্যথার অপেক্ষা করছিলাম। অবাক লাগছিল! ব্যথাটা আসে না কেন?'

'কারণ ব্যথাটা রীমার হাতে চলে গিয়েছিল,' রসিকতা করল কিং।

'বড় বেশি সিরিয়াস হয়ে গিয়েছিলে তোমরা,' গেরি আর ডিউকের দিকে তাকাল রীমা। 'অঘটন ঘটে যেতে পারত। সেটা বন্ধ করলাম।'

'শেষ মুহূর্তে করলে আরকি,' ডিউক বলল। 'কে জিতল জানা গেল না।'

'কে আবার?' বলে উঠল গেরি, 'আমি জিতেছি। রীমা আর এক সেকেন্ড সময় দিলেই তোমার হাতটা টেবিলে লাগিয়ে ফেলতাম।' রীমার দিকে তাকাল সে, 'রীমা, কাজটা ঠিক করলে না। আমি এ কথা ভুলব না, মনে রেখো।'

'বাপরে, কাঁপ উঠে যাচ্ছে আমার!' ভয় পাওয়ার কৃত্রিম ভঙ্গি করল রীমা।

'এবার আমার পালা,' বলে ডিউককে ঠেলে এগিয়ে গেল কিং। 'বলেছিলাম না, যে জিতবে তার সঙ্গে আমার লড়াই। এসো এখন।'

এমন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কিং-এর দিকে তাকাল গেরি যেন সে একটা পচা ইঁদুর। 'ঘুমাওগে। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে লড়াই করতে যেয়ো কারও সঙ্গে, ঘাড়টা মটকে দিলেও যাতে সকালে বেঁচে উঠতে পারো।'

হেসে উঠল অনেকেই।

গেরির দিকে ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে ঝুঁকল কিং। 'মুরগীর ছানা কোথাকার। ভয় পাচ্ছ নাকি? যাও, দিলাম মাপ করে।'

অবিশ্বাস্য গতিতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল গেরি। দুই হাতে ধরে শূন্যে তুলে নিল কিংকে। এগিয়ে গেল ধাতব ওয়েস্টবাস্কেটটার দিকে।

'ছাড়ো, ছাড়ো, ছেড়ে দাও আমাকে!' অসহায় ভঙ্গিতে হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করতে লাগল কিং।

'ছাড়ব,' কথা দিল গেরি, 'তবে এখানে না।'

ওয়েস্টবাস্কেটে কিংকে ঠেসে ভরল গেরি।
উল্লসিত চিৎকার করে উঠল কয়েকজন।
'দারুণ দেখালে, গেরি,' রীমা বলল। 'কিন্তু একটা কথা তো ভুলে গেলে। গোসল করানো দরকার ওকে।'
আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে সুজি। ডিউক এখনও কব্জি ডলছে।
অনেক সহ্য করেছে রবি। আর পারল না। অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল, 'অনেক হয়েছে, থামো এবার। পুডিং দেয়া হয়েছে। খেলে খাও।'

খেতে ইচ্ছে করল না জোসেফের। মাথা ঘুরছে ওর। নতুন নতুন মুখ, উদ্ভট কথাবার্তা, কারণে-অকারণে হাসি মাথা গরম করে দিয়েছে।
সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। লম্বা হলঘর ধরে নিজের ঘরের দিকে এগোল।
জেরির জন্যে খারাপ লাগছে তার। যে ভাবে তাকে সবাই মিলে টিটকারি দিচ্ছিল, তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছিল, ভাল লাগেনি জোসেফের। বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ভবিষ্যতে এটা বন্ধ করা দরকার।
ঘরে ঢুকল জোসেফ। ঘরের প্রায় পুরোটাই অন্ধকার। কেবল একটা রীডিং ল্যাম্প জ্বলছে ওর বেড টেবিলে।
জেরি ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?
আস্তে করে ডাকল, 'জেরি?'
বিছানায় নেই জেরি।
বাথরুমে খুঁজল জোসেফ। জেরি সেখানেও নেই। হাঁটতে গেছে হয়তো।
ফোনের দিকে এগোল জোসেফ। কিন্তু জেরির ড্রেসারের ওপর চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আপনাআপনি একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। আবছা আলোয় দৃষ্টি স্থির রাখার চেষ্টা করছে।
ড্রেসারের ওপর কিলবিল করছে ইঁদুর।

দশ

কাঁধের কাছে জ্বালা করছে। ছুঁয়ে দেখতে গিয়ে আঁউ করে উঠল জোসেফ।
সানবার্ন!
সারাটা দিন ছিল আকাশ মেঘে ঢাকা। সামান্য যেটুকু সময়ের জন্যে বেরিয়েছিল সূর্য, তাতেই পুড়িয়ে দিয়েছে। তবে আকাশে মেঘ ছিল বলেই সানবার্নের ব্যাপারে অসাবধান ছিল জোসেফ।
উঠে দাঁড়াল সে। জ্বালা কমানোর জন্যে কিছু একটা লাগানো দরকার। বাথরুমে চলল অ্যালোই লোশন লাগানোর জন্যে।
শুরুটা ভাল না। একেবারে খোলার দিনেই আকাশ মেঘলা। হতাশাজনক। বৃষ্টি

নামবে ভেবে বাইরের প্রায় কেউই সাঁতার কাটতে আসেনি। আকাশ খারাপ থাকলে লোকে সাঁতার শিখতে আসবে না, টিকিট বিক্রি হবে না, ব্যবসার বারোটা বাজবে।

দুপুরের দিকে রীমার কাছ থেকে যখন পাহারার দায়িত্ব নিল জোসেফ, তখন গোটা তিনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এসে নেমেছিল ভূতের পুলটায়, যেটাতে কিশোর ছেলেটা ডুবে মারা গিয়েছিল।

বড় পুলটাতে কেউ নামেনি। একজনও না।

শূন্য পুলের দিকে তাকিয়ে সাদা, উঁচু প্ল্যাটফর্মে বসে থাকা গেরি আর ডিউককে কেমন বোকা বোকা লাগছে। মেঘের কারণে সাঁঝের মত অন্ধকার এখন, কিন্তু সানগ্লাস খুলছে না গেরি। মাথায় লাল রুমাল বাঁধা।

খানিক পর রীমার সঙ্গে গেরিকে টেনিস কোর্টের দিকে চলে যেতে দেখল জোসেফ।

তেতো হয়ে গেল ওর মন। এখানে কি চাকরি করতে এসেছে ওরা, নাকি ডেটিং! ডেটিংই যদি করবে তাহলে বাড়িতে বসে থাকলেই পারত, কিংবা অন্য কোথাও চলে যেত। এখানে আসার কি দরকার ছিল? সাঁতরাতে আসা মানুষের ওপর নজর রাখা, প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করাটাই লাইফগার্ডের কাজ। ডেটিঙে মন থাকলে আসল কাজ করবে কিভাবে?

গেরি আর রীমার কাণ্ড ছাড়া পুরো ক্লাবটাতে কোন রকম বৈচিত্র ছিল না সারাটা দিনে। নীরব হয়ে ছিল। বাইরের লোক না এলে যা হয়।

কেমন অদ্ভুত লেগেছে জোসেফের। যেন পার্টির জন্যে দাওয়াত দিয়ে বসে আছে, অথচ মেহমানদের দেখা নেই।

ব্যাপারটা মনে হয় সবার অনুভূতিতেই চাপ দিয়েছে। ডিনারের সময়ও সব চুপচাপ রইল তাই। প্রথম রাতের মত হই-চই, পাঞ্জা কষা, কোন কিছুই হলো না।

তবে সেটা ভালই লাগল জোসেফের। ওই সব অস্থিরতার চেয়ে এই চুপচাপ থাকাটা বরং ভাল।

ডিনারের পর নিজের ঘরে আসার আগে সানবার্নের ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি সে। গেরির সান-ব্লকটা ধার নিয়ে সারাদিন ওটা কাঁধে ফেলে ঘুরে বেড়িয়েছে, অথচ গায়ে দেয়নি। ভেবেছে, রোদ তো কমই উঠেছে, কি আর হবে।

কাপড় বদলাচ্ছে ও, এই সময় ঘরে ঢুকল জেরি। জোসেফের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল।

'কি হয়েছে? এত হাসি যে?' জিজ্ঞেস করল জোসেফ।

'কাল রাতের কথা ভাবছি। কাল রাতে অন্ধকারের মধ্যে এসে গাদাখানেক ইঁদুরের মধ্যে পড়েছিলে। তুমি ভাবলে আসল। অথচ নকল। আমি রেখে দিয়েছিলাম ড্রেসারের ওপর।'

দুজনেই হাসতে লাগল।

'আসলেই গাধা বনে গেছি,' জোসেফ বলল। 'আমি ভাবলাম বুঝি আসল। মনে হলো নড়ছে,' রাতের মত একই কথা বলল আবার সে। 'কাল রাতে কি যে হয়ে গিয়েছিল আমার! সব কিছু খালি উল্টোপাল্টা দেখেছি।'

'উল্টোপাল্টা দেখার রোগ আছে নাকি তোমার?' জেরি জিজ্ঞেস করল। 'রোগ

না থাকলে এতটা দেখে না কেউ।'

জবাব না দিয়ে ড্রেসারের কাছে গিয়ে ইঁদুরগুলোকে ভালমত দেখতে লাগল জোসেফ। ইঁদুরের ছড়াছড়ি। জেরি বলেছে, ব্রুটকে জোগাড় করার পর আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুবান্ধবরা ভাবল সে খুব ইঁদুর পছন্দ করে। সবাই মিলে তখন খালি ইঁদুর উপহার দেয়া শুরু করল তাকে। চীনা মাটির ইঁদুর, স্টাফ করা ইঁদুর, প্ল্যাস্টিকের ইঁদুর। ইঁদুর আর ইঁদুর। কিছু বুঝে ওঠার আগেই একদিন দেখতে পেল ইঁদুরের বেশ ভাল একটা সংগ্রহ জমে গেছে তার।

কিন্তু এগুলো সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে কেন? যতই দেখছে জেরিকে, বিচিত্র, কেমন অদ্ভুত স্বভাবের লোক মনে হচ্ছে জোসেফের। তার নিজের চেয়েও অদ্ভুত।

আয়নার সামনে গিয়ে চুল আঁচড়াতে শুরু করল জেরি। এতই লম্বা. মুখ দেখার জন্যে হাঁটু বাঁকা করে নিচু করতে হলো শরীরটাকে।

'বাইরে যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল জোসেফ।

জবাব দিল না জেরি। দ্রুত চুল আঁচড়ে নিয়ে দরজার দিকে এগোল। বেরিয়ে যাওয়ার আগে ফিরে তাকিয়ে বলল. 'দেখা হবে।'

'অ্যাই, জেরি, যাচ্ছ কোথায় তুমি?' পেছন থেকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল জোসেফ।

জবাব দিল না জেরি। বেরিয়ে গেছে।

রাতে ঠাণ্ডা ঘামে ভিজে ঘুম ভেঙে গেল জোসেফের। গেঞ্জিটা সেঁটে গেছে রোদে পোড়া কাঁধের চামড়ার সঙ্গে। ভয়ানক গতিতে ছুটছে যেন হৃৎপিণ্ডটা।

দুঃস্বপ্ন দেখছিল। ভয়ঙ্কর কোন কিছু তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল ওকে।

ঘুম ভাঙার পরেও ভয়টা আটকে রইল মগজে। তবে কয়েকবার চোখ মিটমিট করতে চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে গেল স্বপ্নটা।

টেবিলে রাখা জেরির ঘড়িটার দিকে তাকাল। রাত দুটো বেজে গেছে।

লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল জেরি। আধো অন্ধকারে ভেসে এল তার ফিসফিস কণ্ঠ, 'শুনলে?'

'অ্যাঁ!' নিজেকে টেনে তুলল জোসেফ। ওর রোদেপোড়া কাঁধটা ব্যথা করছে। ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেরি কখন এসেছে জানে না।

'শুনলে নাকি?' আবার ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল জেরি।

কান পাতল জোসেফ। শোনার চেষ্টা করতে লাগল।

মৃদু একটা গোঙানি কানে এল। ওদের দরজার ঠিক বাইরে হলঘর থেকে।

'ওই যে! এবার শুনলে তো?' অসহিষ্ণু হয়ে উঠল জেরির কণ্ঠ।

মাথা ঝাঁকাল জোসেফ।

তারপর আবার শোনা গেল।

মৃদু গোঙানি। চিৎকার করে উঠল কে যেন, 'বাঁচাও! বাঁচাও! মেরে ফেলল!'

এগারো

'শুনলে তো?' জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে জেরি। 'সেই ডুবে মরা ছেলেটা।' লাফিয়ে বিছানা থেকে নামল সে।

জোসেফও নামতে গেল। ঠাণ্ডা শিহরণ শিরশির করে নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে বিছানার চাদরটা পেঁচিয়ে গেল পায়ে। উল্টে পড়েছিল আরেকটু হলে।

'বাঁচাও...' শোনা গেল চাপা গোঙানি।

'হলের মধ্যে!' ফিসফিস করে বলল জেরি। 'বলেছিলাম না, ক্লাবটাকে ভূতে আছর করেছে। নিজের কানেই তো শুনতে পাচ্ছ এখন। নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল আবার জোসেফ। ঘুম থেকে ওঠার পর ঘোরটা পুরোপুরি কাটেনি এখনও। মগজ থেকে দূর হয়নি দুঃস্বপ্নের রেশ। 'শুনতে পাচ্ছি, জেরি,' ফিসফিস করেই বলল সে-ও। 'ওটা তোমার কল্পনা নয়।'

ভয় পেলেও কৌতূহল দমন করতে পারল না জেরি। এগিয়ে গেল দরজার দিকে। পেছন পেছন চলল জোসেফ।

'বাঁচাও...দোহাই লাগে, আমাকে বাঁচাও!'

ভয় পেলেও কেন যেন অবাক লাগছে জোসেফের। মেনে নিতে পারছে না। আর জায়গা পেল না ভূতটা। একেবারে ওদেরই দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে!

বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে। দরজার কাছে এসে পাল্লার গায়ে কান চেপে ধরল দুজনেই।

নীরবতা।

তারপর আবার চাপা গোঙানি। আর্তনাদে ভরা বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাস। শুকনো। যেন মৃত্যুর ওপার থেকে আসছে।

দরজার হাতলটা চেপে ধরল জেরি।

এক পা পিছিয়ে গেল জোসেফ।

'বাঁচাও! বাঁচাও!' ঠিক সামনেই আবার ফেটে পড়ল চিৎকার।

একেবারে কাছে!

এক হ্যাঁচকা টানে পাল্লাটা খুলে ফেলল জেরি।

দুজনেই তাকিয়ে রইল গোঙাতে থাকা ভূতটার দিকে।

বারো

'বাঁচাও! বাঁচাও!'

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে জোসেফ।

প্রথমে অবাক দেখাল জেরিকে। তারপর চেহারায় ফুটল রাগ। চিৎকার করে উঠল, 'রীমা, এ সব তোমার শয়তানি!'

হাসতে শুরু করল রীমা। হাসির দমকে পাশে দাঁড়ানো গেরির গায়ে ঢলে ঢলে পড়ছে। বোকা বোকা লাগছে গেরিকে। তাকিয়ে আছে জোসেফ আর জেরির দিকে।

'দেখো, গেরি···দেখো, ওদের চেহারা দেখো!' হাসতে হাসতে বলল রীমা। হাসির জন্যে বলতে পারছে না ঠিকমত। পানি বেরিয়ে গেছে চোখ থেকে।

'দেখো, রাত বাজে আড়াইটা! মজা করার সময় নয় এটা!' রাগে দরজার নবে আঙুলগুলো চেপে বসল জেরির।

'আমাকে দোষ দিয়ো না আবার,' গেরি বলল। 'বুদ্ধিটা রীমার মাথা থেকে বেরিয়েছে।'

কপালে এসে পড়া সোনালি চুলগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে দিল রীমা। 'বিশ্বাস করে ফেলেছিলে তোমরা, তাই না? সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে বসেছিলে, ভূতেই খেল দেখাচ্ছে।'

জবাব দিল না জেরি। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে রীমার দিকে।

জোসেফের বুকের দুরুদুরুও বন্ধ হলো অবশেষে। হাসতে শুরু করল। স্বীকার না করে পারল না, ভূত হিসেবে রীমা সত্যি অসাধারণ।

তবে সত্যিকারের ভূত নেই দেখে সে আর জেরি দুজনেই মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, রীমাকে বুঝতে দিল না সেটা।

'তোমার সিনেমায় নামা উচিত, রীমা,' প্রশংসা করল জোসেফ।

মাথা নুইয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বাউ করল রীমা। আরেকব্যার গুঙিয়ে উঠে ভূতুড়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

হাততালি দিল জোসেফ আর গেরি।

জেরির দিকে ঘুরল জোসেফ, ওর রাগ দূর করে স্বাভাবিক করে তোলার জন্যে। কিন্তু সে মুখ খোলার আগেই চিৎকার করে উঠল জেরি, 'ভুগতে হবে, রীমা! এর জন্যে ভুগতে হবে তোমাকে।'

এমন করেই বলল জেরি, আপনাআপনি হাসি বন্ধ হয়ে গেল গেরি আর রীমার। পাথুরে-কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জেরির দিকে।

দড়াম করে ওদের মুখের ওপর দরজা লাগিয়ে দিল জেরি। এত জোরে, চমকে গিয়ে লাফিয়ে উঠল ড্রেসারের ওপরে রাখা ইঁদুরটা।

'জেরি, শান্ত হও,' বোঝানোর চেষ্টা করল জোসেফ। 'অত রেগে যাওয়ার কিছু

নেই। সাধারণ একটা রসিকতা ধরে নিলেই হয়।'

ওর কাঁধে হাত রাখতে গেল জোসেফ।

কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে হাতটা ধরে এক ঝটকায় সরিয়ে দিল জেরি। 'বললাম তো, এর জন্যে ভুগতে হবে রীমাকে, দেখো। আমার কান কেটে দিয়ো নাহলে।'

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল জোসেফ। পরিষ্কার আকাশে সূর্যটা টকটকে লাল। ইতিমধ্যেই গরম হয়ে উঠেছে আকাশ। পুলের একটা কোনা দেখা যায় জানালা দিয়ে। টলটলে পানি হাত নেড়ে ডাকছে যেন। ঝাঁপিয়ে পড়ার লোভ দেখায়।

চমৎকার দিন। এই প্রথম ভাল আবহাওয়া দেখা গেল। ভিড় হবে আজ ক্লাবে। তাড়াতাড়ি উঠে গোসল সেরে, কাপড় পরে নাস্তা করতে চলল সে।

ডাইনিং রুমে ঢুকতেই নানা রকম ভূতুড়ে শব্দ শুরু করল সবাই। আগেই এসে রাতের কথা জানিয়ে দিয়েছে রীমা। সেজন্যেই খেপাচ্ছে জোসেফকে। সে হাসল। ভয় পাচ্ছে জেরির জন্যে। সে এ সব সহ্য করবে না।

জেরি আসার আগেই এখান থেকে পালাতে হবে। প্রথম শিফটে পুলের ধারে পাহারা রয়েছে আজ ওর আর গেরির।

সেদিন আর ভুল করল না। প্ল্যাটফর্মে ওঠার আগে ভাল করে সানব্লক মেখে নিল। কড়া হয়ে গেছে রোদ। গা থেকে শার্টটা খুলল না। বাতাস লাগবে বটে, রোদও লাগবে। পোড়া কাঁধের জন্যে মোটেও আরামদায়ক হবে না সেটা।

সাড়ে দশটা নাগাদ বেশ ভিড় জমে গেল পুলের ধারে। তিনজন মহিলা গিয়ে ঝাঁপ দিতে শুরু করেছে দড়ি দিয়ে ঘেরা ঝাঁপ দেয়ার জায়গায়। গভীর অংশে গিয়ে নেমেছে একঝাঁক কিশোর ছেলেমেয়ে। এখানকার স্থানীয়। হাসাহাসি, দাপাদাপি করছে।

চোখে সানগ্লাস পরা থাকা সত্ত্বেও রোদ বাঁচানোর জন্যে কপালের ওপর হাত রেখে তারপর তাকাতে হচ্ছে। গেরিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে একদল কিশোরী মেয়ে। সে ওদের সঙ্গে হাসাহাসি করছে, রসিকতা করছে, নিজেকে হিরো বানিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যেই।

দেখতে মোটেও খারাপ বলা যাবে না ওকে, কিন্তু এত আহামরি রূপবানও নয় যে নজরে পড়বে। তারপরেও কি করে যেন মুহূর্তে তার বন্ধু হয়ে যায় মেয়েরা। ছেলেরা আবার অতটা পছন্দ করে না।

পছন্দ করে করুকগে, ওসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই জোসেফের। কাকে কে পছন্দ করল তাতে তার কি এসে যায়। ঢোলা সুইম স্যুট পরা একটা বড় ছেলে একটা ছোট ছেলেকে ঠেলে পানিতে ফেলার চেষ্টা করছে দেখে সাবধান করার জন্যে বাঁশি বাজাল। তারপর চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল রীমাকে। গভীর অংশের ওপাশে ডিউটি দিচ্ছে।

গোল পুলটার কিনারে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রীমা। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে গেরির দিকে। চোখে রাগ।

জোসেফের বুঝতে অসুবিধে হলো না, গেরির নতুন মেয়েবন্ধুদের সহ্য করতে পারছে না সে।

প্রথম শিফটটা নির্বিঘ্নেই কেটে গেল। হই-হট্টগোলের মধ্যে এই পুলের কিনারে বসে পাহারা দিতে ভালই লাগল। ঝলমলে সাজে অবশেষে যাত্রা শুরু হয়েছে নতুন গ্রীষ্মের। এক ধরনের সুখে ভরে গেল মন।

এগারোটার সামান্য আগে এসে হাজির হলো জেরি। পানিতে পড়লে কিভাবে বাঁচতে হবে নতুন সাঁতারুদের সেটা শেখানোর দায়িত্ব তার। পুলের অগভীর অংশে চলে ট্রেনিং। জোসেফকে অবাক করে দিয়ে হাসিমুখে তার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল সে। মনমেজাজ ভালই আছে তার। ডাইনিং রুমে নিশ্চয় অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি।

ডাইভিং বোর্ডের দিকে এগিয়ে যেতে দেখল তাকে জোসেফ। খুব ভাল ডাইভ দিতে পারে জেরি। এতই নিখুঁত, ঝাঁপ দেয়ার সময় শব্দ প্রায় হয়ই না।

এগারোটার কয়েক মিনিট পর কিং এসে রিলিজ করল জোসেফকে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে রওনা হলো জোসেফ। ছায়া আর এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানির জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।

খালি পায়ে হাঁটছে। ভীষণ গরম হয়ে গেছে কংক্রীটে বাঁধানো চত্বর। একটা কণ্ঠ থামিয়ে দিল ওকে, 'জোসেফ।'

গরম একটা হাত পড়ল কাঁধে।

ফিরে তাকিয়ে দেখল ডিউক দাঁড়িয়ে আছে।

জোসেফ তাকাতেই হাতটা বাড়িয়ে দিল।

'কি হয়েছে তোমার হাতে?' জিজ্ঞেস করল জোসেফ।

'হাতে কিছু হয়নি,' তালু মেলল ডিউক।

হাঁ করে তাকিয়ে রইল জোসেফ। ডিউকের হাতে একটা সিকি। বুঝতে না পেরে বিড়বিড় করল জোসেফ, 'সিকি!'

মাথা ঝাঁকাল ডিউক। রোদে ঝিলমিলিয়ে উঠল ওর কালো চোখের তারা। মাথার পেছনে হাত নিয়ে গিয়ে চুল ঠিক করল। জিজ্ঞেস করল, 'জানো এটা কি?'

'জানি। ঘোড়ার লেজ।'

'আরে না। চুলের কথা বলছি না।' হাতের তালু দেখাল।

'সিকি।'

'টিপস,' দাঁতে দাঁত চাপল ডিউক। রেগে গেছে। হাতটা নামাল। 'এক ধনী বুড়ি দিয়েছে।'

হেসে উঠল জোসেফ, 'টিপস দিল তোমাকে?'

ভ্রূকুটি করল ডিউক, 'তাহলে আর বলছি কি! লাউঞ্জ চেয়ারটা জায়গামত নিয়ে যেতে বুড়িকে সাহায্য করেছিলাম। জোর করে ধরে আমার হাতে পয়সাটা গুঁজে দিল।'

'ভালই তো,' হাসল জোসেফ। 'তোমার শুভ দিন।'

'কি বলল আমাকে জানো?' কঠিন হয়ে উঠল ডিউকের কণ্ঠ। 'বলল, জমিয়ে রাখো। কলেজে পড়লে কাজে লাগবে...সিকি দিয়ে কলেজে পড়া! হুঁহ!'

জোরে জোরে হাসতে লাগল জোসেফ। 'কাল আবার গিয়ে সাহায্য কোরো। আরেকটা সিকি পাবে। মন্দ কি? রোজ রোজ একটা করে সিকি পেতে থাকলে খারাপ জমবে না।'

হাসিটা মুছে গেল ডিউকের। পয়সাটা ট্র্যাশ বাস্কেটে ছুঁড়ে ফেলল।

'আরে করো কি!' থামানোর চেষ্টা করল জোসেফ, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। ফেলে দিয়েছে ডিউক। 'টাকা ছুঁড়ে ফেলা দণ্ডনীয় অপরাধ। জানো না?'

'এত সামান্য ব্যাপার নিয়ে কে মাথা ঘামাতে যাচ্ছে এখানে?' বিড়বিড় করল ডিউক। 'এখানে যা হয়, সব বড় বড় ঘটনা।'

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল জোসেফ। গত গ্রীষ্মের কথা। ডিউকের সম্পর্কে মনে করার চেষ্টা করল।

'ডিউক,' ধীরে ধীরে বলল জোসেফ, 'গত গ্রীষ্মে তুমি আর আমি...'

ঘড়ি দেখল ডিউক। 'এহ্হে, দেরি হয়ে গেল। যাই। বাই, জোসেফ।'

'কিন্তু, ডিউক...'

তার কথা শোনার জন্যে দাঁড়িয়ে নেই ডিউক। প্রায় দৌড়ে চলে যাচ্ছে পুলের গভীর অংশের দিকে। ওর দিকে তাকিয়ে রইল জোসেফ।

ডিউককে চেনে ও। নিশ্চয় চেনে। আর সে-ও তাকে চেনে।

তাহলে কেন কিছু মনে করতে পারছে না?

সেদিন ঝড়ের মধ্যে প্রথম যখন ঘরে ঢুকল সে, তাকে দেখে চমকে উঠেছিল ডিউক। এর একটাই মানে—ওকে চেনে সে। তবে দেখে খুশি হয়েছিল, এটা ঠিক।

গত গ্রীষ্মে কিছু ঘটেছিল নাকি দুজনের মধ্যে?

বন্ধুত্ব? দুজনে মিলে কোন কিছু ঘটিয়েছিল?

ওর মন বলছে, কিছু ঘটিয়েছে। কিন্তু মনের গহন অতল থেকে কোনমতেই খুঁজে বের করে আনতে পারল না, কি ঘটিয়েছিল। অতীতের স্মৃতির কোনখানে দেখতে পেল না ডিউকের চেহারা।

সে-রাতে নিজের বিছানায় জেগে বসে ঘামতে লাগল জোসেফ। পিঠের সঙ্গে লেপ্টে গেছে শার্টটা। ঘড়িতে দুটো বেজে পঁয়তাল্লিশ।

গভীর রাত।

মাথাটা ধরেছে খুব। প্রচণ্ড গরম। আঠা আঠা। ওর মনে হচ্ছে গরম ঘামের মধ্যে ডুবে আছে। কিংবা গরম কোন তরল পদার্থে।

অন্ধকার ঘরে চোখ বোলাল সে। জেরির বিছানার পাশের জানালাটা দিয়ে আসছে ফ্যাকাসে ধূসর আলো। জেরির বিছানা শূন্য।

কোথায় গেল?

বিছানা থেকে নামল জোসেফ। মাথার মধ্যে কেমন ঘোলা হয়ে আছে। খোলা জানালার দিকে এগোল। বাইরে থেকে বাতাস আসছে, সেটাও ঘরেরটার মতই গরম।

সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করল। গায়ের এই তাপ দূর করার একটাই উপায়, পুলের পানিতে গা ডুবিয়ে বসে থাকা।

কাপড় বদলে সুইম স্যুট পরে নিল সে। সকালবেলা যেটা পরেছিল। পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল হলঘরে। এদিক ওদিক তাকাল। কাউকে চোখে পড়ল না।

পড়ার কথাও নয়। রাত বাজে দুটো। এখন কে আসবে? অতি সতর্কতার জন্যে নিজেকেই মনে মনে ধোলাই লাগাল।

দ্রুত এগোল পুলের দিকে। ঘাম ঝরছে বৃষ্টির মত।

ফ্লাডলাইটের আলোয় চকচক করছে পুলের পানি। উজ্জ্বল নীল টাইলসে বাঁধানো পুল। মাথার ওপর ছড়ানো আকাশটায় লক্ষ তারার মেলা। নিচের পৃথিবীটার দিকে তাকিয়ে থেকে ক্রমাগত চোখ মিটমিট করছে যেন।

খালি পায়ে হাঁটছে সে। চত্বরটা এখনও গরম হয়ে আছে। পানি দেখেই ঠাণ্ডাটা আঁচ করতে পারছে! গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল।

পুলের অগভীর অংশে পা নামিয়ে দাঁড়াল সে। তাকাল সামনের দিকে। পানিতে কে যেন একটা স্টাইরোফোম বগিবোর্ড ফেলে গেছে। দড়িতে ঘেরা জায়গাটার কাছে ডুবছে-ভাসছে ওটা।

গভীর পানি যেখানে শুরু হয়েছে, সে খানটায় ভেসে আছে নীল রঙের একটা কি যেন।

নীল ভাসমান জিনিস!

নীল পোশাক পরা ছেলে!

লাফ দিয়ে পানি থেকে উঠে সেদিকে দৌড় দিল সে।

স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হলো তাকে

নীল বিকিনি পরা একটা মেয়ে। মাথা নিচু করে ভাসছে। অল্প অল্প ঢেউয়ে মাথাটা ডুবছে আর ভাসছে। পানিতে ছড়িয়ে ভেসে আছে তার চুল।

কৃত্রিম আলোয় তার চামড়ার রঙ লাগছে অস্বাভাবিক সাদা।

না! বাস্তব নয়!

নিশ্চয় কল্পনা। সেদিনকার মত। আবার হ্যালুসিনেশন দেখছে।

চোখ মিটমিট করল সে। বুজল। আবার খুলল।

আবার বন্ধ। দৃশ্যটা চোখের সামনে থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

কিন্তু আবারও যখন খুলল, দেখল, আছে। ভাসছে পানিতে।

এবারকার মেয়েটা বাস্তব। আগের বারের মত ভুল দেখা নয়। সত্যি একটা মেয়ে পানিতে ভাসছে।

না! সত্যি নয়! ভুল! মাথাটা গরম হয়ে গেছে বলে উল্টোপাল্টা দেখছে।

কিন্তু দেখাটা এত বাস্তব কেন?

দূর, যা থাকে কপালে, দেখতেই হবে। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। দম বন্ধ। ঠাণ্ডা পানি গিলে নিল ওকে।

ঠেলে মাথা তুলল আবার। ফুস্‌স্ করে পানি ফেলল মুখ থেকে। গলার ভেতর ঢুকে গেছে খানিকটা।

মেয়েটার কাছে পৌঁছতে দেরি হলো না।

তাড়াহুড়োয় নাকেমুখে পানি ঢুকে যাওয়ায় কাশতে শুরু করল সে। ওই অবস্থাতেই মেয়েটার সোনালি চুল ধরে টান দিল।

টেনে তুলে ফেলল মুখটা। পানি থেকে বের করে আনল।
ভারী। খুব ভারী লাগল মাথাটা।
তাকিয়ে রইল মেয়েটার মুখের দিকে।
তাকিয়ে রইল। তাকিয়েই রইল।
বিশ্বাস করতে পারছে না।

তেরো

চুল ধরে মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে জোসেফ। আছে তো আছেই।

কিন্তু মেয়ে নয় ওটা। ভুল করেছিল। ছেলে। ছেলের মুখ। আর চুলগুলোও সোনালি নয়। বদলে গেছে। জোসেফকে দেখছে সে। নিজেকে।

'তুমি, তুমি জোসেফ হতে পারো না!' কথা আটকে যাচ্ছে। মুখটা একভাবে তুলে ধরে রেখেছে। ওর নিজের মুখ।

'তুমি জোসেফ নও!' মৃত ছেলেটাকে বলল আবার সে। 'কারণ, জোসেফ হলাম আমি।'

ছেলেটার ফ্যাকাসে কপাল থেকে পানি গড়িয়ে পড়ল।

ধীরে ধীরে খুলে গেল ফোলা ঠোঁট। পানি বেরিয়ে এল মুখ থেকে। থুতনি বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

ওর চোখ, নিষ্প্রাণ এক জোড়া চোখ, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

আরও পানি গড়িয়ে বেরোল ফোলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। সেই সাথে গলায় পানি আটকে গেলে যে রকম শব্দ করে মানুষ, তেমন শব্দও বেরোল।

উল্টে গেল চোখের মণি দুটো। দেখা দিল সাদা অংশটা।

থুতনি বেয়ে আবার খানিকটা পানি গড়াল।

তারপর ভেজা ফিসফিসানি। কেঁপে উঠল লাল ঠোঁট। ফিসফিস করে বেরিয়ে আসছে কথা : 'আমি জোসেফ!'

'আমি জোসেফ,' ফিসফিস করে আবার বলল মৃত ছেলেটা। চোখের সাদা অংশটাই যেন মণির মত তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ফ্লাডলাইটের আলোয় অসম্ভব সাদা লাগছে চোখটা।

চিৎকার দিতে চাইল জোসেফ। স্বর বেরোল না গলা দিয়ে।

চুল ধরে আগের মতই তুলে রেখেছে মাথাটা।

ফ্যাকাসে মুখটা ধীরে ধীরে সবুজ হতে শুরু করল।

সবুজ চামড়ার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে চোখ দুটো। শেষ পর্যন্ত চোখ বলে আর কিছু রইল না। শুধু শূন্য কোটর।

সাগরের শ্যাওলার মত কুঁচকে যাচ্ছে চামড়া। গলে গলে পড়তে শুরু করল পানিতে।

ভোঁতা একটা গোঙানি বেরিয়ে এল ফোলা ঠোঁটের ফাঁক থেকে।

এক খাবলা আধগলা চামড়া পানিতে খসে পড়ল। তারপর আরেক খাবলা।

এখনও চুল ধরে রেখেছে জোসেফ। তাকিয়ে আছে পচা-গলা, ভয়ানক বিকৃত মুখটার দিকে।

আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সবুজ চামড়াটা পুরো খসে পড়ল।

চুলটা ধরা রয়েছে এখনও জোসেফের হাতে। আতঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে আছে গলিত মাংস লেগে থাকা ভয়াবহ খুলিটার দিকে।

চোদ্দ

আতঙ্কে জমাট বরফ হয়ে গেল জোসেফ। খুলির কালো গর্ত দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে বোবা হয়ে।

অবশেষে যেন সংবিত ফিরে পেল সে। ছেড়ে দিল চুলের গোছা।

পানিতে ডুবে যেতে লাগল ছেলেটা। অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ক্রমে। পানি পাক খেতে শুরু করল। ঘূর্ণাবর্তের মত গতি বাড়তে লাগল সেটার। মুখে এসে লাগছে পানির ঝটকা। চোখে লাগছে। দম আটকে দিতে চাইছে।

অবশেষে চিৎকার বেরোল তার কণ্ঠ চিরে। চোখ মেলল। মেলে দেখল, ছেলেটা নেই...

বিছানায় উঠে বসল সে. ঘামে নেয়ে গেছে শরীর।

গরম, হালকা বাতাসে উড়ছে জানালার পর্দা। বাড়ি মারছে চৌকাঠের গায়ে।

কেঁপে উঠল সে। চোখ আধবোজা করে তাকাল ধূসর আলোর দিকে।

গরমে সেদ্ধ হয়ে গেছে, ঘামে ভেজা শরীর, তারপরেও বিছানার চাদরটা গলার কাছে তুলে দিল সে। চুপচাপ বসে থাকল শরীরের কাঁপুনি বন্ধ হওয়ার জন্যে।

সাংঘাতিক স্বপ্ন দেখেছে। অতি বাজে একটা স্বপ্ন।

ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন।

বিকৃত চেহারাটা চোখে ভাসছে এখনও। চোখ বন্ধ করল। কিন্তু দূর হলো না চেহারাটা।

চোখ মিটমিট করে তাড়ানোর চেষ্টা করল। লাভ হলো না কোন।

'জোসেফ...' শোনা গেল ফিসফিসে কণ্ঠ।

আবার স্বপ্ন? স্বপ্নের মধ্যে?

আবার ডাকাডাকি করছে ওকে দুঃস্বপ্নের মধ্যে!

জানালায় জোরে জোরে বাড়ি মারল কয়েকবার পর্দাটা।

'জোসেফ...' আবার কানে এল ডাক।

না, এটা স্বপ্ন নয়। পুরো সজাগ এখন সে।

জেরির বিছানার দিকে তাকাল। এখনও খালি। কোথায় গেছে সে?

রাত দুপুরে কোথায় গেল?

হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। মুহূর্তে আঠা হয়ে গেল হাতের তালুটা। বাড়ির

কথা মনে পড়ল। ওর নিজের ঘরেও এয়ারকন্ডিশনার আছে। যদিও ছোট, দাম কম, কিন্তু কাজ চলে যায়। এ ঘরটার মত অস্বস্তিকর পরিবেশ নয়।

বাড়ির জন্যে মন কেমন করে উঠল ওর।

'জোসেফ, এসো না এখানে!' ডাকুল আবার কণ্ঠটা।

দরজার ঠিক বাইরেই।

'জেরি?' ডাক দিল জোসেফ। জেরিই কি ডাকছে নাকি? বাইরে আটকা পড়েছে বোধহয়।

না, আটকা পড়বে কেন? দরজায় তো ছিটকানি লাগায়নি জোসেফ। লাগানোর কোন কারণ ঘটেনি।

'জেরি?' আবার ডাকল জোসেফ। তারপর নীরবতার মধ্যে কান পেতে রইল জবাবের আশায়।

'জোসেফ...বেরিয়ে এসো। জোসেফ...'

বিছানা থেকে মাটিতে পা নামাল জোসেফ। উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলল।

কে ডাকে?

দমকা বাতাসে ভীষণ ভাবে দুলে উঠল পর্দাটা। এত গরমের মধ্যেও গায়ে কাঁটা দিল ওর।

অন্ধকারে পা দিয়ে খুঁজে খুঁজে বের করল একজোড়া রবারের স্যান্ডেল।

'জোসেফ...'

ফিসফিসিয়ে ডাকল আবার কেউ। খসখসে কণ্ঠ। খুব আস্তে। ওর কানেই শুধু পৌঁছাচ্ছে।

'আসছি!' বলে আবার হাই তুলল সে। এখনও চোখ থেকে ঘুম যায়নি পুরোপুরি।

মনের মধ্যে দুঃস্বপ্নটা এখনও ঢুকে রয়েছে। গলিত মুখটার কথা মনে পড়ল আবার।

দরজা খুলল সে। হলঘরে কেউ নেই।

'জোসেফ, এখানে এসো...' কোণের দিক থেকে ডাক শোনা গেল আবার।

হলে পা রাখল সে। শার্টের বোতামগুলো সব লাগাল।

ঘুম ঘুম লাগছে ওর। সত্যি কি ঘটছে ঘটনাটা? অদ্ভুত ডাক শুনে রাত তিনটের সময় হলঘরে বেরিয়ে এসেছে!

কোণের দিকে এগোল সে। একটা দরজা ক্যাঁচকোঁচ করে উঠতে শুনল, কিন্তু কাউকে চোখে পড়ল না।

শোনার জন্যে দাঁড়াল সে। কোথায় গেল কণ্ঠের মালিক?

'জোসেফ, এদিকে!'

ভারী হয়ে গেল নিঃশ্বাস। হাত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। অবাক হয়ে ভাবল, কি ঘটছে এখানে?

'জেরি, নাকি?' ডেকে জিজ্ঞেস করল সে। এতটাই নিচু স্বরে, নিজের কথা নিজেই শুনল না ঠিকমত।

'এদিকে...' আবার শোনা গেল ফিসফিসে জবাব।

ডাইনিং রূমের দরজার সামনে গিয়ে থামল সে।
ডাইনিং রূমে ডেকে নিয়ে এসেছে ওকে কণ্ঠটা।
ঠেলে দরজা খুলল। 'কে ওখানে?' কোনমতে স্বর বের করল গলা দিয়ে।
জবাব নেই।
ঘরটা ভীষণ গরম। দম আটকানো গরম।
দেয়ালের কাছে কমলা রঙের আগুনের শিখা লকলক করতে দেখা গেল।
আগুনটা ফায়ারপ্লেসে জ্বলছে এটা বুঝতে বেশ সময় লাগল তার।
রাত তিনটের সময় আগুন?
'এই, কে ওখানে?' চিৎকার করে ডাকতে গিয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে গেল তার কণ্ঠস্বর।
ঘরের মধ্যে পা রাখল। কয়েক কদম এগিয়ে গেল। আগুনের দিকে চোখ। উজ্জ্বল কমলা রঙের আগুন।
রীমাকে দেখতেই আবার চিৎকার করে উঠল।
আগুনের সামনে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে। গায়ের ওপরে ছায়ার নাচন।
আগুন খোঁচানোর শিকটা পড়ে থাকতে দেখল তার পাশে।
'রীমা!' অস্ফুট স্বরে ডাকল সে।
ও রকম করে পড়ে আছে কেন? আগুনের এত কাছে? অতিরিক্ত কাছে!
রীমার মাথার কাছে আগুনের শিখা লাফ দিয়ে উঠতে দেখে চিৎকার করে উঠল সে।
মাথাটা রয়েছে আগুনের মধ্যে!
'রীমা, সরো! জলদি সরো!'
চিৎকার করে ছুটে গিয়ে রীমার পা চেপে ধরল সে। তারপর টান দিল। সর্বশক্তি দিয়ে টানতে লাগল।
সরে আসতে শুরু করল দেহটা।
আরও জোরে টান দিল সে। লাফাতে থাকা আগুনের শিখা থেকে সরিয়ে আনতে চাইছে রীমাকে।
চোখে পড়ল রীমার একটা চুলও নেই। মুখটাও শেষ। পুড়ে বিকৃত।

পনেরো

রাত তিনটায় ডাইনিং রূমে কি করছিল রীমা?
প্রশ্নটা বার বার ঘুরেফিরে অনেকের মনেই আসতে থাকল। তার মধ্যে রবিও একজন।
এটাই একমাত্র প্রশ্ন নয়। ডাইনিং রূমে কেন গিয়েছিল রীমা? এত বেশি আগুনই বা জ্বেলেছিল কেন? আর কেনই বা তাকে খুন করা হলো?
খুন!
কেউ কি চুরি করে ঢুকেছিল গেস্ট হাউসে? রীমা টের পেয়ে ওকে ধরতে গিয়ে

খুন হয়েছে?

কিন্তু চোর ঢোকার কোন লক্ষণ খুঁজে পেল না পুলিশ। জানালা ভাঙা নেই। বাইরে থেকে ঢোকার দরজাগুলো সব তালা দেয়া ছিল।

'ভেতরের কেউ খুন করেনি তো ওকে?' রবির দিকে কাত হয়ে ফিসফিস করে বলল ব্র্যান্ডন। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দুজনে। নজর পুলিশের দিকে। কোন কারণে যদি আবার খোঁজ পড়ে ওদের, এজন্যে তাকিয়ে রয়েছে।

মাথা নাড়তে লাগল ব্র্যান্ডন। চোখ লাল। পানি জমা। মুখটা ফ্যাকাসে। বিধ্বস্ত। 'উঁহু, সম্ভব না,' রবির প্রশ্নের জবাবে বলল সে। অনিশ্চিত কণ্ঠস্বর।

রীমার লাশ পরীক্ষা করছে দুজন পুলিশ অফিসার। আরেকজন দেখছে আগুন খোঁচানোর শিকটা। আর চতুর্থ আরেকজন, একজন মহিলা অফিসার চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে রয়েছে ফায়ারপ্লেসের দিকে।

ঘণ্টাখানেক ধরে ডাইনিং রূমে রয়েছে ওরা। আগুন নিভে গেছে। কয়লাগুলো যেন বাঘের চোখের মত জ্বলছে।

অন্য লাইফগার্ডদের দিকে ফিরে তাকাল রবি। একটা টেবিল ঘিরে বসেছে ওরা। চেহারা ফ্যাকাসে, চোখের কোণে কালি, চোখ লাল; ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, ভীত।

গালে হাত দিয়ে রেখেছে সুজি রনসন। কাঁধের কাঁপুনি দেখেই বোঝা যায় সারা শরীরই কাঁপছে। কাঁদছে বোধহয় সে, শিওর হতে পারল না রবি। ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছে গেরি। ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

ডিউকের সারা মুখে ছড়িয়ে আছে কালো চুল। টেবিলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে যেন ঘোরের মধ্যে। তার সামনে বুকের ওপর হাত আড়াআড়ি রেখে বসে আছে কিং। সামনে-পেছনে দোলাচ্ছে চেয়ারটা। আর সামান্য পেছনে হেলালেই পড়ে গিয়ে দেয়ালে বাড়ি খাবে। চোখ বন্ধ।

শেষ ধারে পাশাপাশি বসেছে জোসেফ আর জেরি। তবে বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে। দুজনেই কুঁচকে রেখেছে চেহারা। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসা। চোখে বুনো দৃষ্টি।

দেখা শেষ করে কালো প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে রীমার দেহটা ঢেকে দিল পুলিশ। সেদিকে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্র্যান্ডন।

'মাথাটা...' বলতে গিয়েও থেমে গেল ব্র্যান্ডন। ঢোক গিলল।

সবাইকেই মোটামুটি সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসাবাদ করে ফেলেছে অফিসারেরা। এখন আগুনের দিক থেকে ঘুরে দাঁড়াল মহিলা অফিসার। এগিয়ে আসতে লাগল টেবিলের দিকে। জোসেফের ওপর চোখ।

আড়ষ্ট হয়ে গেল জেরি। তার আর জোসেফের মাঝখানে বসে পড়ল অফিসার। 'আমি অফিসার গ্রেগ,' মোলায়েম স্বরে বলল সে। গোল মুখে বড় বড় বাদামী চোখ। খাটো করে ছাঁটা কালো চুল। কপাল কুঁচকালে গভীর ভাঁজ পড়ে।

নীল শার্টের পকেট থেকে ছোট একটা নোটপ্যাড আর বলপেন বের করল সে। জোসেফের দিকে কাত হলো, 'বলো তো আবার, ডাইনিং রূমে কিভাবে এসেছিলে।'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল জোসেফ। কথা বলতে যেতেই খসখসে হয়ে

আটকে গেল। আবার পরিষ্কার করে নিল। 'একটা ডাক শুনলাম। একটা কণ্ঠ আমাকে ডাকতে লাগল।'

চোখের পাতা সরু করে ফেলল অফিসার গ্রেগ। 'একটা কণ্ঠ?'

মাথা ঝাঁকাল জোসেফ। গাল কাঁপছে। ভয় পেয়েছে সত্যি সত্যি।

'একটা কণ্ঠ শুনেছ, না? কি ধরনের কণ্ঠ?' জিজ্ঞেস করল গ্রেগ। খসখস করে কি যেন লিখল নোটপ্যাডে। 'পুরুষের গলা? নাকি ছেলেমানুষের? চেনা কারও?'

দ্বিধা করতে লাগল জোসেফ। 'শুধু একটা কণ্ঠ। আসলে, ঠিক করে বললে একটা ফিসফিসানি। কার কণ্ঠ, বলতে পারব না। ফিসফিস করে আমার নাম ধরে ডাকতে লাগল। আমাকে অনুসরণ করতে বলল।'

ভ্রূকুটি করল অফিসার গ্রেগ। কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জোসেফের দিকে। চেহারা দেখে মনের কথা পড়ার চেষ্টা করছে। 'কথাটা যে উদ্ভট শোনাচ্ছে, বুঝতে পারছ সেটা?'

মাথা ঝাঁকাল জোসেফ। চোখ নামাল।

'তারমানে, তুমি বলতে চাইছ,' জিজ্ঞেস করল মহিলা, 'তুমি ঘুমের ঘোরে হেঁটেছিলে? ডাক শোনাটা তোমার স্বপ্ন নয়তো?'

'না!' তীক্ষ্ণ হয়ে গেল জোসেফের গলা, 'সত্যি সত্যি ঘটেছে ঘটনাটা। স্পষ্ট শুনেছি। ওই ডাক আমার ঘুম ভাঙিয়েছে। বুঝতে পারছি আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করছেন না...'

'আমি সেকথা বলিনি,' কোমল স্বরে জবাব দিল অফিসার। হাতের ইশারায় শান্ত হতে অনুরোধ করল জোসেফকে। 'আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছে। সেটাই বললাম। ঘুমের বড়িটড়ি কিছু খাও নাকি?'

'অ্যাঁ!' অফিসারের দিকে তাকিয়ে আছে জোসেফ, 'না।'

'কাল রাতে কিছু খেয়েছিলে? বীয়ার বা ওই জাতীয় কিছু?'

'না।'

'বাড়ির ঠিকানা কি তোমার?' নোটপ্যাডের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল অফিসার।

ফায়ারপ্লেসের দিকে তাকাল জোসেফ। হাঁটু গেড়ে বসে দস্তানা পরা হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কি যেন খুঁজছে।

জবাব দিতে দ্বিধা করল জোসেফ। 'তিনশো তেরো নম্বর গোস্ট লেন, ব্ল্যাক ফরেস্ট। রকি বীচের কাছে। এখান থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণে।'

'জানি,' জবাব দিল গ্রেগ। 'অফিসার ওরটনের বাড়ি ওখানে,' হাত তুলে একজন অফিসারকে দেখাল সে। 'ব্ল্যাকফরেস্টে।... তোমার রহস্যময় কণ্ঠস্বরটা নিয়ে আরেকটু আলোচনার ইচ্ছে ছিল, জোসেফ। কিন্তু এখন তোমার যা অবস্থা, তাতে...যাকগে, পরে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল জোসেফ।

উঠে দাঁড়াল গ্রেগ। নিজের সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখি, আরও দু'চারজনের সঙ্গে কথা বলে।'

টেবিলের কাছে এগিয়ে এল রবি আর ব্র্যান্ডন।

কিং-এর চেয়ার একটু বেশি পেছনে হেলে গেল। আরেকটু হলে চিত হয়ে পড়ে যেত। কোনমতে সামলে নিল।

জোসেফের পেছনে এসে দাঁড়াল ডিউক। হাত রাখল জোসেফের কম্পমান কাঁধে। নিচু হয়ে কানে কানে কি যেন বলল।

শোনার চেষ্টা করল রবি। শুনতে পেল না।

সন্দেহ হলো ওর। গোপনে কি বলাবলি করছে দুজনে? জোসেফকে বোধহয় সান্ত্বনা দিচ্ছে ডিউক।

নোটপ্যাডে খসখস করে লিখেই চলেছে গ্রেগ। অনেকগুলো পাতা খরচ করার পর মুখ তুলল। কালো চোখের দৃষ্টি গেরির ওপর নিবদ্ধ করে জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাতে রীমার সঙ্গে বেরিয়েছিলে তুমি?'

গেরির লাল গালে বেগুনি ছাপ পড়ল। 'হ্যাঁ। ডিনারের পর শহরে গিয়েছিলাম।' নার্ভাস ভঙ্গিতে একটা চাবির রিঙ ঘোরাচ্ছে আঙুলে। 'সিনেমায় গিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছবি দেখা আর হয়নি। ঘুরেই বেড়িয়েছি শুধু।'

'ফিরলে কখন?' জানতে চাইল গ্রেগ।

'সকাল সকালই। ক'টার সময় বলতে পারব না।' হাত তুলে দেখাল সে, 'ঘড়ি পরি না আমি, দেখুন? সময় দেখিনি, তবে তাড়াতাড়িই ফিরেছি।'

'ফিরে এসে কি করলে?' জানতে চাইল গ্রেগ।

'পুলের ধারে বসে থাকলাম খানিকক্ষণ,' রিঙ ঘোরাতে ঘোরাতে জবাব দিল গেরি। 'তারপর যার যার ঘরে চলে গেলাম।'

'রীমাকে তার ঘরে যেতে দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল গেরি। 'হ্যাঁ। হলের মাথায় তার ঘর। ঢুকতে দেখেছি ওকে।'

'আমি ওর রুমমেট,' বলে উঠল সুজি। কাঁদতে কাঁদতে চোখমুখ ফুলে গেছে। 'আমি তখন শুয়ে পড়েছি। চোখটা লেগে আসছিল। এই সময় ওকে আসতে শুনলাম। তখন এই সাড়ে এগারোটা মত হবে।'

'ঘর থেকে আর বেরোতে শুনেছ?' জানতে চাইল গ্রেগ।

চিন্তিত ভঙ্গিতে ভ্রূকুটি করল সুজি। 'না। আমার ঘুম খুব গাঢ়। ঘুমিয়ে গেলে দুনিয়ার আর কিচ্ছু কানে ঢোকে না।'

লিখে নিল গ্রেগ। বন্ধ করল নোটপ্যাডটা। ঘড়ি দেখল। 'অনেক দেরি করিয়ে দিলাম। এখন ঘুমোতে যেতে পারো সবাই। আমরা আমাদের কাজ করি।'

জানালা দিয়ে রবি দেখল দুজন পুলিশ অফিসার পুলের কিনারে গিয়ে দাঁড়াল। ঝুঁকে দেখতে শুরু করল। পানি থেকে প্রতিফলিত হয়ে আসা আলোর আভায় উজ্জ্বল ওদের মুখ।

'ক্লাব আর সম্ভবত খুলতে পারছেন না আগামী দিন,' ব্র্যান্ডনকে বলল গ্রেগ। 'সারাদিনই লেগে যাবে আমাদের তদন্ত সারতে। এর আগে আর কোন কিছুতে হাত দেয়া চলবে না বাইরের কারও।'

কি যেন বলতে গিয়েও বলল না ব্র্যান্ডন। বিড়বিড় করে বলল অন্য কথা, 'আমার ডিরেক্টরকে জানাতে হবে।'

ফায়ারপ্লেসের কাছে দাঁড়িয়ে আছে অফিসার ওরটন। জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটার

বাবাকে খবর দেয়া হয়েছে?'

চুপ হয়ে গেল সবাই।

প্লাস্টিকের চাদরে ঢাকা দেহটার দিকে তাকাল রবি। বিশ্বাসই করতে পারছে না, ওই চাদরের নিচে রীমা শুয়ে আছে।

এক এক করে বেরিয়ে যেতে শুরু করল লাইফগার্ডেরা। সুজি কাঁদছে। ওকে সান্ত্বনা দিয়ে চুপ করাতে চাইছে জোসেফ আর ডিউক।

ব্র্যান্ডনকে সাহায্য করার জন্যে থাকতে চাইল রবি। কিন্তু তাকে চলে যেতে ইশারা করল ব্র্যান্ডন। বলল, 'ঘুমাওগে। কাল তোমার সাহায্য দরকার হবে আমার।'

হলে এসে রবির দিকে ঘুরে তাকাল জেরি। তার কালো চোখে উত্তেজনা। 'প্রতি বছর গরমকালেই এই কাণ্ড ঘটে এখানে,' বিড়বিড় করল সে। 'প্রত্যেক বছর একটা না একটা দুর্ঘটনা ঘটবেই।'

'কি বললে?' কথাটা যেন বুঝতে পারেনি রবি।

'পুলিশকে জানানো দরকার,' জেরি বলল। 'প্রতি বছর এখানে লোক মারা যায়।'

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে জোসেফও কথাটা শুনল। অস্ফুট একটা শব্দ করল সে।

জেরির মুখে অদ্ভুত হাসি।

অঘটন ঘটাতে যেন আনন্দ পাচ্ছে সে।

ষোলো

পুলিশ চলে গেল। দিনটা খুব গরম। জুনের চেয়ে বরং আগস্টের মত লাগছে। পুলের কাছে ভিড়। হট্টগোল হচ্ছে।

সব কিছু আবার যেন স্বাভাবিক হয়ে আসছে—প্ল্যাটফর্মের উঁচু বেদিতে বসে ভাবল জোসেফ।

সবাই না হলেও কিছু কিছু ছেলেমেয়ে স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

ওর সামনের প্ল্যাটফর্মটায় বসে আছে গেরি। কতগুলো মেয়ের সঙ্গে হাসাহাসি করছে। সাদা বিকিনি পরা একটা মেয়ে হঠাৎ গেরির হুইসেলটা কেড়ে নিয়ে দিল দৌড়। হেসে উঠল বাকি মেয়েগুলো।

কয়েক মিনিট পর ওর বিশ্রামের ছুটি হলে টেনিস কোর্টের ওপাশে ওকে হারিয়ে যেতে দেখল জোসেফ, লাল বিকিনি পরা একটা মেয়ের সঙ্গে।

নাহ্, আবার সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে—দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল জোসেফ। ও নিজে যদি স্বাভাবিক হতে পারত!

পুলের সাঁতারুদের দিকে নজর দিল সে। অগভীর অংশে দাপাদাপি করছে কয়েকটা অল্প বয়েসী ছেলে। পানি ছিটাচ্ছে। ওর পায়ের কাছে এসে পড়ছে পানি।

বাঁশি বাজাল সে। চিৎকার করে বলল, 'অই, আস্তে।'

কিন্তু বললে কি আর শোনে। তবে দাপাদাপি বন্ধ না হলেও পানি ছিটানো কমে গেল।

হঠাৎ খেয়াল করল জোসেফ, পুরো পাঁচটা মিনিট রীমার কথা মনে আসেনি তার। খুশি হয়ে উঠল মনটা। ডাইনিং রুমে ফায়ারপ্লেসের সামনে পড়ে থাকা রীমার ভয়ঙ্কর বিকৃত লাশটার কথা যত কম ভাবা যায়, ততই ভাল। যাক, ভুলতে শুরু করেছে। পাঁচ মিনিট দীর্ঘ সময়।

কিন্তু আগের দিন, যে রাতে খুন হয়েছে রীমা, তার পরের দিনটা ভয়াবহ একটা দিন গেছে তার জীবনের। যতবার চোখ বন্ধ করেছে ততবার চোখের সামনে এসে উদয় হয়েছে রীমার লাশ।

সারাটা দিন নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রেখেছিল। ওর অবস্থা দেখে কিছু একটা করার পরামর্শ দিয়েছিল ডিউক। হাঁটতে যাবে কিনা জিজ্ঞেস করেছিল। যায়নি জোসেফ।

রবিও খুব ভাল আচরণ করেছে। বার বার এসে খোঁজখবর নিয়েছে। কথা বলার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। সারাক্ষণ মন জুড়ে ছিল রীমা, চোখে ভাসছিল রীমার লাশ। কানে আসছিল রহস্যময় অদ্ভুত ফিসফিসে কণ্ঠ। ঘর থেকে ডেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল ওকে।

সে বুঝতে পারছিল অফিসার গ্রেগ তার কথা বিশ্বাস করেনি। যে ভাবে চোখ সরু সরু করে তাকাচ্ছিল, বোঝাই যাচ্ছিল সন্দেহ যাচ্ছে না।

তাকে দোষ দেয়া যায় না।

এ রকম অদ্ভুত গল্প কে বিশ্বাস করবে?

কিন্তু সমস্যাটা হলো, কথাটা সত্যি। বানানো গল্প নয়।

ভয়ঙ্কর মৃত্যু ঘটেছে রীমার। ওর চিন্তা এমন করে মন জুড়ে রয়েছে ওর, আর কিছু ভাবতেই পারছে না।

হঠাৎ করেই বাবা-মায়ের কথা মনে পড়ল ওর। এখানে আসার পর আর যোগাযোগ হয়নি। প্রায় একটা হপ্তা কেটে গেছে, কথা বলতে পারেনি। তারাই বা যোগাযোগ করল না কেন? সে ঠিকমত পৌঁছল কিনা সেই খোঁজও নিল না!

সে-ই বা ওদের কথা ভুলে গেল কি করে? খোঁজ নিল না কেন!

এটাও আরেকটা অদ্ভুত কাণ্ড বলে মনে হলো ওর। কখনোই তো দু'চার দিনের বেশি খবর না নিয়ে থাকে না ওর বাবা-মা।

বিশ্রামের ছুটির সময় তাড়াহুড়ো করে নিজের ঘরে চলে এল সে। মা-বাবার সঙ্গে কথা বলা একটা সাংঘাতিক স্বস্তি আর আনন্দের ব্যাপার। রীমার ভয়ঙ্কর খুনটার কথা ওদের জানাতে হবে বিস্তারিত।

হয়তো কিছু রহস্যের সমাধানও করে দিতে পারবে তারা। হয়তো বলতে পারবে পুরানো আই-ডি কার্ড নিয়ে কেন এসেছে সে। ডিউক হ্যানসনের ব্যাপারেও জানা থাকতে পারে ওদের। গত বছর গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়ে যাওয়ার পর নিশ্চয় ওর কথা তাদের বলেছে সে।

নিজের ঘরে এসে ঢুকল সে। ধপ করে বসে পড়ল বিছানায়। ফোনের রিসিভার

তুলে কানে ঠেকাল। ডায়াল টোন শুনল। নম্বর টিপল।

দু'বার রিঙ হলো।

তারপর নীরবতা।

এবং তারপর একটা মহিলা কণ্ঠ ভেসে এল দুঃখিত, এই নম্বরটা এখন বাতিল।

সতেরো

তার মনে হলো ভুল নম্বরে রিঙ করেছে। লাইন কেটে দিয়ে আবার টিপল নম্বরগুলো। প্রতিটি নম্বর ধীরে ধীরে সময় নিয়ে টিপল।

দুই বার রিঙ হলো। তিনবার। তারপর আবার সেই টেপ করা মেসেজ দুঃখিত, এই নম্বরটা এখন বাতিল।

একঘেয়ে যান্ত্রিক কণ্ঠে একই কথা বলে গেল টেপটা। তিনবার শোনার পর লাইন কেটে দিল সে। বিছানায় এলিয়ে পড়ে তাকিয়ে রইল ফোনটার দিকে। ভুলটা কোনখানে বোঝার চেষ্টা করছে।

ওদের বাড়ির নম্বরটা বাতিল হয়ে যাওয়ার কোন কারণই নেই।

পেটের মধ্যে কেমন খামচি মেরে ধরা অনুভূতি হলো।

গোলমালটা কোথায়?

হঠাৎ ভাবনাটা যেন বিদ্যুৎ চমকের মত ঝিলিক দিয়ে গেল মনে।

ঝড়। গতকাল বিকেলে সামান্য সময়ের জন্যে ঝড় বয়ে গিয়েছিল। মাত্র ঘণ্টাখানেক স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু টেলিফোনের লাইন এলোমেলো করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। এ কারণেই বাড়িতে লাইন পাচ্ছে না সে।

পেটের অস্বস্তি বোধটা স্বাভাবিক হতে আবার তুলে নিল রিসিভার। অপারেটরকে বলল, 'বাড়ির নম্বরটা পাচ্ছি না। আপনি কি একবার ডায়াল করে দেখবেন?'

'নাম্বারটা বলুন, প্লীজ,' বহুদূর থেকে ভেসে এল যেন কণ্ঠটা। প্রচুর ঝড়-তুফানের আর খড়খড় শব্দ করছে লাইন।

নম্বরটা বলল জোসেফ। ছেলেটার ডায়াল করার খটখট শব্দ শুনতে পেল।

দুইবার বাজল। তারপর আবার ভেসে এল সেই একই মেসেজ।

গলার কাছে আতঙ্ক যেন আটকে গেল। অদ্ভুত। বড়ই অদ্ভুত কাণ্ড।

ভুল নম্বরে ফোন করছে নাকি? নিজের বাড়ির নম্বর ভুলে বসে আছে?

বিশ্বাস করা কঠিন। লাইন কেটে দিয়ে লং ডিসট্যান্স ইনফরমেশনে ডায়াল করল। গলাটা শুকিয়ে গেছে। হাত কাঁপছে।

'কোন্ শহরের জন্যে ইনফরমেশন চান?' জিজ্ঞেস করল একটা পুরুষ কণ্ঠ।

'ব্ল্যাকফরেস্ট,' জানাল সে। 'মিস্টার উইনারের নম্বরটা বলতে পারবেন?'

দীর্ঘ নীরবতা।

খোদা, পাওয়া যাক নম্বরটা! মনে মনে বলল সে। পেয়ে যাক! বলতে পারুক!
বাড়িতে ফোন করাটাও যে এত কঠিন হয়ে উঠবে কল্পনাই করেনি সে। শীতল ভয় যেন চেপে ধরল ওকে। এ কি ঝামেলায় পড়ল!
কি ঘটছে এখানে? কি?
হঠাৎ ভেসে এল অপারেটরের গলা, 'নামটা বানান করে বলবেন কি, প্লীজ?'
যদি ভুল শোনে এ জন্যে চিৎকার করে থেমে থেমে বলল জোসেফ। শেষে বলল, 'উইনার, শুনলেন তো? ব্ল্যাকফরেস্টে থাকে।'
আবার যেন গায়েব হয়ে গেল অপারেটর। আবার দীর্ঘ নীরবতা।
রিসিভার চেপে ধরে রেখে কান ব্যথা করে ফেলল জোসেফ। খড়খড় আর ঝড়-তুফানের একটানা শব্দ হয়েই চলেছে। তবে, মৃদু। নইলে সহ্য করা কঠিন হত।
অবশেষে আবার উদয় হলো অপারেটর, 'সরি, মিস্টার। উইনার বলে কারও নাম আমাদের তালিকায় নেই।'

আঠারো

স্তব্ধ হয়ে বসে ফোনটার দিকে তাকিয়ে রইল সে। হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে অনেক। চাঁদিতে চাপ দিতে শুরু করেছে রক্ত।
বাবা-মা'র সঙ্গে কেন যোগাযোগ করতে পারছে না সে?
নামের তালিকায় তার বাবার নাম নেই এ কথা কেন বলছে অপারেটর?
তালিকায় আছে। অবশ্যই আছে। মাত্র সাতদিন আগেও দেখা হয়েছে ওদের সঙ্গে।
কি ঘটছে? আবার অবাক হয়ে ভাবল সে। ওরাই বা এতদিনে একবারও খোঁজ নিল না কেন তার?
সাংঘাতিক কিছু ঘটল? ভয়ানক কিছু?
জানতে হবে। এখুনি।
ভারী দম নিয়ে হৃৎপিণ্ডের দুরুদুরু কমানোর চেষ্টা করতে করতে তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে বেরিয়ে এল সে।
রবিকে দেখতে পেল, জেরির সঙ্গে কথা বলছে। জেরির লাইফসেভিং ক্লাস সবেমাত্র শেষ হয়েছে। ওর ছাত্রছাত্রীরা পুলের অগভীর অংশে প্র্যাকটিসে ব্যস্ত এখনও।
ক্লিপবোর্ডটা তুলে ধরল রবি। মাথাটা কাত করে ভালমত দেখতে লাগল জেরি।
'রবি, তোমার গাড়িটা একটু ধার দেবে?' তাকে অনুরোধ করল জোসেফ। দৌড়ে আসার কারণে হাঁপাচ্ছে। গরম চত্বর পায়ের তালু পুড়িয়ে দিচ্ছে ওর। রবির ছায়াতে গিয়ে দাঁড়াল, পায়ে গরম সামান্য কম লাগবে এই আশায়।

জেরির সবুজ সুইম-স্যুটটা ভেজা। মাথা ভেজা। ক্লিপবোর্ড থেকে মুখ তুলে তাকাল ভুরু কুঁচকে। 'আমি ভেবেছিলাম আমার বিকেলের শিফটটা তোমাকে করে দিতে অনুরোধ করব।' কাঁধ ডলল সে। 'ক্লাস নেয়ার সময় মাংসপেশীতে টান লেগেছিল। খিঁচ ধরে গেছে।'

'কিন্তু···আমি···আমি তো পারব না!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল জোসেফ। 'আমাকে বাড়ি যেতে হবে। খুব জরুরী!'

চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে নিয়ে অবাক চোখে জোসেফের দিকে তাকাল জেরি। জোসেফের ব্যবহারে রীতিমত অবাক হয়েছে।

ক্লিপবোর্ড নামিয়ে জিজ্ঞেস করল রবি, 'বাড়ি থেকে কোন খারাপ খবর এসেছে নাকি?'

মাথা নাড়ল জোসেফ। 'না, কিন্তু আমাকে বাড়ি যেতেই হবে। বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

ভ্রূকুটি করল রবি। ক্লিপবোর্ডের তালিকায় দ্রুত চোখ বোলাল। 'ফোনে কথাটতা বলেছিলে নাকি?'

'পারিনি!' আবার তীক্ষ্ণ হলো জোসেফের কণ্ঠস্বর। 'কোনভাবেই লাইন পেলাম না। কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে!'

কাঁধ ডলল জেরি। গুঙিয়ে উঠল, 'উফ্! এমন সময়েই কাঁধে ব্যথা পেলাম···'

'গাড়িটা নেব?' আবার রবিকে অনুরোধ করল জোসেফ। 'ব্ল্যাকফরেস্টে যেতে বড় জোর এক ঘণ্টা লাগবে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে ক্লিপবোর্ডের দিকে তাকাল আবার রবি। 'বিকেলের শেষ শিফটে তোমার ডিউটি। কিং ডিউটি করছে এখন। তাকে রিলিভ করতে পারবে?'

'পারব,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল জোসেফ। 'যাব আর আসব। শুধু দেখে আসা।'

গুঙিয়ে উঠল আবার জেরি। 'উফ্, পেশীগুলো একেবারে পেঁচিয়ে গেছে মনে হচ্ছে। তিনটায় আবার ক্লাস. কি করে যে নিই!'

জোসেফের দিকে তাকাল রবি, 'এসো। চাবি নিয়ে যাও।' গেস্ট হাউসের দিকে রওনা হলো সে।

দ্রুতপায়ে তার পেছনে হাঁটতে লাগল জোসেফ। কিছুদূর এগিয়ে জেরির দিকে ফিরে তাকাল রবি, 'সাঁতার কেটে দেখতে পারো। পানিতে অনেক সময় এ ধরনের ব্যথা সেরে যায়।'

'থাক, আর ডাক্তারি করা লাগবে না!' তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল জেরি।

'দেখা হবে, জেরি!' বলে, আবার রবির পিছে পিছে চলল জোসেফ।

বাড়ির কথা ভাবতে ভাল লাগছে ওর। অসময়ে মা ওকে দেখলে একেবারে চমকে যাবে।

ব্ল্যাকফরেস্টে যেতে ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগে না। কিন্তু যেদিন অঘটন শুরু হয়, ঘটতেই থাকে।

ক্লাব থেকে আধঘণ্টার পথ দূরে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। বিরাট এক মালবাহী

ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে একটা নীল রঙের কনভারটিবল গাড়ি। দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। সামনের দিকটা একেবারে ভর্তা। ট্রাকটা আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তা জুড়ে। সারা রাস্তায় ছড়িয়ে আছে গম।

ট্রাকটা এমনভাবে দাঁড়ানো, রাস্তায় ফাঁক খুব সামান্যই। তাতে ট্রাফিক জ্যাম লেগে গেছে।

পার হয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই। রবির সবুজ ছোট করোলাটাতে বসে বসে ঘামতে লাগল জোসেফ। এয়ার কন্ডিশনার নেই গাড়িতে। সবগুলো কাঁচ নামিয়ে দিয়েও ঠাণ্ডা পাওয়া যাচ্ছে না। বাতাস আসছে, তবে ভীষণ গরম।

ট্রাফিক পরিষ্কার হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগল অস্থির হয়ে। অধৈর্য ভঙ্গিতে নিজের অজান্তেই হুইলের ওপর দুই হাতের সমস্ত আঙুল দিয়ে টাট্টু বাজাতে আরম্ভ করেছে।

বাড়ি যাওয়ার জন্যে এত অস্থির আর জীবনে হয়েছে কিনা সন্দেহ।

ওর দৃঢ় বিশ্বাস, বাড়ি গেলেই সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিতে পারবে মা।

কিন্তু এতদিন ধরে তার কাছ থেকে সাড়া না পেয়েও কেন যোগাযোগের চেষ্টা করল না মা-বাবা?

সে-ই বা টেলিফোনে লাইন পেল না কেন? টেপের মেসেজটাও আরেক আশ্চর্য। হুট করে এ ভাবে লাইন কেটে দেয়ার কথা নয় বাবার। আর বিল বাকি পড়ার তো প্রশ্নই ওঠে না যে কোম্পানি এসে কেটে দিয়ে যাবে।

তার আই-ডি কার্ডটা আরেক রহস্য। পুরানো কেন? নীল শার্ট পরা ছেলেটার লাশ বার বার কল্পনা করে কেন? কেন ভুল দেখে?

কেন? কেন? কেন? প্রশ্নগুলো যেন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল ওকে।

অবশেষে পরিষ্কার হলো জ্যাম। সময় বাঁচানোর জন্যে তীব্র গতিতে ছুটল সে। ব্ল্যাকফরেস্টে পৌঁছে মোড় নিয়ে যখন গোস্ট লেনে ঢুকল, বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে।

দ্রুত পাশ কাটাতে থাকল পরিচিত বাড়িগুলোর। বেশির ভাগ বাড়িই পুরানো। তারচেয়েও পুরানো, আঁকাবাঁকা, ঝাঁকড়া পাতাওয়ালা বুড়ো গাছপালায় ঘিরে ফেলে দিনের বেলাতেও অন্ধকার ছায়া তৈরি করে রেখেছে বাড়িগুলোতে। দেখলেই গা ছমছম করে। রাস্তার দুই পাশ থেকে বড় বড় গাছের ডাল এসে পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে খিলান তৈরি করেছে। ওপর থেকে দিনের আলো ঢুকতে বাধা দেয়।

একমাত্র ব্যারনদের বাড়িটাতে আলো আছে। চতুর্দিক থেকে আসছে রোদ। আলোয় আলোকিত। এমনকি বাড়ির পেছনে পাহাড়ের ঢালের পুরানো কবরস্থানটায়ও ঝলমলে রোদ।

কয়েক সেকেন্ড পরেই নিজেদের ব্লকটা চোখে পড়ল জোসেফের। টেম্পলারদের বাড়ির লনে পিটুনিয়া ফুলের বেডের মাঝখানে কুৎসিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ভয়ঙ্কর হাসি হাসছে একটা রত্নদানোর মূর্তি। কল্পিত এই দানবগুলোর বাস নাকি মাটির নিচে। চ্যাপ্টা, সমতল আঙিনাটায় লম্বা লম্বা ঘাস, ছোটবেলায় তাতে বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল আর সফটবল খেলত সে। পাশে টিউগদের পুরানো রঙচটা বাড়িটা

দেখলে মনে হয় ওই বাড়িরই মাটির নিচে বাস করে এখনও রত্নদানোর দল।

অবশেষে নিজেদের বাড়িটাও দেখা গেল। কাছাকাছি এসে গতি কমাল সে। কাঠের দোতলা বাড়ি। দেয়ালে সাদা রঙ করা, জানালার রঙ সবুজ।

'মা, আমি এসে গেছি!' গাড়ির মধ্যে বসে আপনমনেই বলে হাসল সে। বুকের কাঁপুনি বেড়ে গেছে।

বাবা নিশ্চয় বাড়ি নেই, অফিসে গেছে। মা'র বাড়ি থাকার কথা। জরুরী কাজ না থাকলে এ সময়টায় সাধারণত বেরোয় না।

কোন গাড়ি চোখে পড়ছে না। তীক্ষ্ণ একটা মোড় নিয়ে গেটের মধ্যে গাড়ি ঢুকিয়ে ফেলল সে। ড্রাইভওয়ে ধরে এগোল।

সামনের দরজাটা খোলা। স্ক্রীনডোরের ওপাশে শুধু অন্ধকারই চোখে পড়ল ওর।

গাড়ি থামিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল সে। প্যাসেঞ্জার সীটের জানালা দিয়ে তাকাল।

আরি! আপেল গাছটা গেল কোথায়?

ড্রাইভওয়ের পাশে ছিল ওটা। কেটে ফেলা হয়েছে। গোড়াটাও নেই। কয়েক বছর ধরেই ওটা কাটব কাটব করছিল বাবা; কারণ ড্রাইভওয়েতে আপেল ছড়িয়ে দিত গাছটা।

গাড়ি থেকে নেমে দড়াম করে দরজা লাগাল সে।

মাথার ওপর হাত তুলে টানটান করে আড়মোড়া ভাঙল। নীল জিনসের ওপরে সবুজ গেঞ্জি পরেছে সে। ঘামে ভিজে পিঠে লেপ্টে গেছে গেঞ্জিটা।

বারান্দার সিঁড়ির একপাশে নতুন একটা ফুলের বেড করা হয়েছে। লাল আর সাদা ঝলমলে ফুল। খুব সুন্দর।

সামনের দিকের একটা জানালায় নড়াচড়া চোখে পড়ল।

যাক! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। মা বাড়িতেই আছে।

সিঁড়ি টপকে বারান্দায় উঠে একটানে খুলে ফেলল স্ক্রীনডোর। চেঁচিয়ে ডাকল 'মা মা!' বলে।

উনিশ

হাতের ফুলের ভাসটা হাত থেকে ছেড়ে দিল নিগ্রো মহিলা।

ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙল। পায়ের কাছে পানি সহ ছড়িয়ে পড়ল ফুলগুলো।

মহিলার ফ্যাকাসে নীল চোখে কঠিন দৃষ্টি। চিৎকার করে উঠল, 'কে তুমি?'

কালো খাটো চুল মহিলার। দুই পাশে ধূসর হয়ে এসেছে। ছোটখাট, রোগাটে শরীর। ঢোলা একটা অনেক লম্বা বেমানান গাউনের নিচে কাঁধ দুটো কেমন ঝুলে রয়েছে।

এই মহিলাকে জীবনে দেখেনি জোসেফ।

পড়শী হবে হয়তো। কিংবা কাজে সাহায্য করার জন্যে নতুন রেখেছে মা।

'সরি, চমকে দিলাম,' সাবধানে বলল জোসেফ। লজ্জিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেঝেতে ভেঙে পড়া কাঁচের টুকরো আর ফুলগুলোর দিকে। 'মা কোথায়?'

'তোমার মা?'

পানির কাছ থেকে পিছিয়ে গেল মহিলা। জুতোয় আটকে আছে একটা ফুল।

'বাড়ি নেই?' গলার ভেতরটা হঠাৎ করেই শুকিয়ে গেছে জোসেফের।

'বাড়িতে আমি একমাত্র মানুষ,' পা তুলে ঝাড়া দিয়ে জুতো থেকে ফুলটা ফেলে দিল মহিলা। 'ভুল জায়গায় ঢুকে পড়েছ তুমি।'

'না না,' মাথা নাড়ল জোসেফ, 'আমাদের বাড়ি এটা...'

ছোট লিভিং রুমটায় চোখ বোলাল সে। সবুজ চেয়ার। মানানসই কাউচ। দেয়ালে ফুল আঁকা নতুন পেইন্টিং।

বাড়িতে নতুন করে ডেকোরেশন করিয়েছে নাকি মা?

'জোর করে ঢুকেছ তুমি,' কোমরে দুই হাত রাখল মহিলা। চোখ সরু করে সাবধানী দৃষ্টিতে দেখতে লাগল জোসেফকে।

'এটা আমাদের বাড়ি,' জোসেফ বলল। 'আমার মা-বাবা কখন ফিরবে জানেন? আমার মা...'

চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মহিলা। তার কালো চোখে ভয় দেখতে পেল জোসেফ।

মহিলা কি ভাবছে? ডাকাতি করতে ঢুকেছে সে?

'তুমি চলে যাও,' শীতল কণ্ঠে বলল মহিলা।

'আপনি বুঝতে পারছেন না,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে জোসেফের কণ্ঠ। 'এটা আমাদের বাড়ি। এখানে আমি থাকি। আমি এসেছি...'

'কাকে খুঁজছ তুমি?' মহিলার কণ্ঠও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। 'তুমি কে?'

'আমি জোসেফ,' জবাব দিল সে, 'জোসেফ উইনার। দেখুন...'

মহিলার মুখ থেকে ছোট্ট একটা চিৎকার বেরোতে গিয়ে মাঝপথে চাপা পড়ে গেল। হাত উঠে গেল মুখের কাছে। 'উইনারদের ছেলে...'

'হ্যাঁ।'

'উইনারদের ছেলে! তাকে খুঁজছ?' মহিলার ঘোলাটে চোখে পানির স্তর দেখা দিল।

'না।'

কিন্তু তার কথা যেন শুনতে পায়নি মহিলা, 'উইনারদের ছেলেকে খুঁজছ? শোনোনি খবরটা?'

'কি খবর?' গলার কাছে একটা দলা আটকে এল জোসেফের।

'কি বলব তোমাকে,' দুই তালুতে থুঁতনি রেখে গাল চেপে ধরল মহিলা। 'ও মারা গেছে।'

'কি বলছেন!' চিৎকার করে উঠল জোসেফ।

'উইনারদের ছেলে...মারা গেছে,' জোসেফের চোখে চোখ আটকে আছে মহিলার। 'এক বছর হয়ে গেল।' ধীরে ধীরে হাত নামাল মহিলা। তার ঝোলা কাঁধ

আরও ঝুলে পড়ল। 'উফ্, কি মর্মান্তিক! সত্যিই বড় কষ্ট লাগে!'

'তা কি করে হয়!' অদ্ভুত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল জোসেফ, নিজের গলা নিজেই চিনতে পারল না।

চোখ বন্ধ করল মহিলা। কেঁপে উঠল। 'বাড়িটা যখন ওদের কাছ থেকে কিনি, তখন ওদের যা অবস্থা! বিধ্বস্ত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে পালিয়ে যেতে চাইছিল। বাড়ি বেচে দিয়ে, কোনদিন যাতে আর ফিরে আসতে না হয়। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল ওরা।'

'কি বলছেন আপনি! না না, এ ঠিক না! আপনি ভুল বলছেন!'

চোখ মেলল মহিলা। ভয় ফিরে এল চোখে। জোসেফকে দেখে ভয় পাচ্ছে মহিলা।

'সরি!' বলে আরেক পা পিছিয়ে গেল।

আবার চারপাশে চোখ বোলাল জোসেফ। লিভিং রুম। ওদের লিভিং রুম। আসবাবপত্র সব অপরিচিত। পেইন্টিংগুলো নতুন। আগে দেখেনি।

ওদের লিভিং রুম। ওদের বাড়ি।

'কিন্তু আমিই তো জোসেফ উইনার!' চিৎকার করে উঠল সে। 'আমি, জোসেফ...'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে মহিলার। তাকিয়ে আছে পানিভরা চোখের ঘোলাটে দৃষ্টি দিয়ে। জোসেফের কথা হয় বুঝতে পারছে না, নয়তো বুঝতে চাইছে না। 'সরি,' বিড়বিড় করল সে, 'খুবই দুঃখিত আমি। খবরটা আমাকেই জানাতে হলো, এটা আমার দুর্ভাগ্য।'

'না না!' আবার চিৎকার করে উঠল জোসেফ।

তারপর চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল আচমকা। দৌড় দিল। দৌড়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

পেছনে দড়াম করে পাল্লা লেগে যাওয়ার শব্দ কানে এল। ফিরে তাকাল না সে। লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নেমে ড্রাইভওয়ে ধরে ছুটল।

গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তীব্র গতিতে গাড়ি ছোটাল।

'আমি জোসেফ উইনার!' নিজেকে শোনানোর জন্যে চিৎকার করে উঠল আবার। 'আমি জোসেফ! আমি জোসেফ!'

কিন্তু মহিলা কেন বলল জোসেফ মরে গেছে?

বিশ

নিশ্চয় কয়েক ঘণ্টা একনাগাড়ে গাড়ি চালিয়েছে জোসেফ।

কারণ ক্লাবে ফিরতে ফিরতে অন্ধকার হয়ে গেল।

সারাটা বিকেল আর সন্ধ্যা কোথায় ছিল সে মনে করতে পারছে না। মনে আছে কেবল ঘুরে বেরিয়েছে চক্রাকারে। কিন্তু ঘুরেছেটা কোথায়? তার পুরানো এলাকায়?

পড়শীদের বাড়ির আশেপাশে? কোথাও কি গাড়ি থামিয়ে নেমেছিল? লাঞ্চ খেয়েছিল?
বাড়ি থেকে বেরোনোর পর কি কি ঘটেছে, কিছুই মনে করতে পারছে না সে।
রবির গাড়িটা যখন এমপ্লয়ি লটে ঢোকাল, শূন্য পুলের কালো পানিকে ফ্লাডলাইটের নিচে চকচক করতে দেখল। উষ্ণ রাত। ভাপসা গরম। কিছু নড়ছে না। গাছের একটা পাতাও না।
ছবির মত নিথর হয়ে আছে যেন সব কিছু। মৃত্যুর মত স্তব্ধ।
গাড়ি থেকে নামল সে। শব্দ করে দরজা লাগাল। ঘোরের মধ্যে যেন এগোল গেস্ট হাউসের দিকে।
ইগনিশনে কি চাবিটা ফেলে এসেছে? হেডলাইট কি নিভিয়েছে?
মনে করতে পারল না।
'কারও সঙ্গে দেখা করতে চাই না আমি!' চিৎকার করে নিজেকে বলল সে।
সবাই বোধহয় ডাইনিং রুমে। ডিনার খাচ্ছে। ওদের মুখোমুখি হতে পারবে না। ওদের প্রশ্নে ভরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে পারবে না।
ওকে দেখলেই হাজারও প্রশ্ন ছুটে আসবে তীক্ষ্ণ তীরের মত
জোসেফ, কোথায় গিয়েছিলে তুমি?
জোসেফ, শিফট মিস করলে কেন?
জোসেফ, হঠাৎ করে বাড়ি গেলে কেন?
জোসেফ, এমন বিধ্বস্ত লাগছে কেন তোমাকে?
জোসেফ? জোসেফ? জোসেফ?
সাইড ডোর দিয়ে ঢুকে কার্পেট বিছানো করিডর ধরে দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল সে। ডাইনিং রুমের পাশ কাটিয়ে আসার সময় দরজার ওপাশে ওদের হই-হট্টগোল, হাসাহাসির শব্দ কানে এল। কমন রুমের পাশ কাটাল সে। তারপর তীক্ষ্ণ একটা বাঁক। এবং তারপর সরু, শূন্য হলওয়ে।
ব্র্যান্ডনের অফিসের দিকে চলেছে সে।
নিজের ফাইলটা দেখবে। দেখবে, কি লেখা রয়েছে তাতে।
ফোন নম্বরটা দেখবে।
কার্পেটে ঢাকা থাকার পরেও ওর স্নীকার পরা পায়ের শব্দ হচ্ছে জোরে জোরে। লম্বা, শূন্য করিডরে প্রতিধ্বনি তুলছে।
ফোন নম্বরটা জোগাড় করতে হবে। জানতে হবে নিজের ঠিকানা। বাবা-মাকে ফোন করতে হবে।
ফাইলে সবই থাকে। সব। যা যা দরকার, সব।
তাতে সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। সব রহস্যের সমাধান।
যুক্তিসঙ্গত একটা ব্যাখ্যা নিশ্চয় আছে সব কিছুর।
নিজেদের লিভিং রুমে দাঁড়িয়ে থাকা রোগাটে মহিলার কথা মনে পড়ল তার। পানিতে ভেজা মেঝে। জুতোয় আটকে যাওয়া ফুল। পানি ভরা ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকা। ওর মৃত্যুর খবর শোনাচ্ছিল ওকেই।
মহিলার কথামত সে মারা গেছে এক বছর আগে।
কি মর্মান্তিক ঘটনা! আহা! বেঁচে থাকা মানুষকে মেরে ফেলা!

কিন্তু সন্তোষজনক একটা জবাব নিশ্চয় আছে।
সেই জবাবটা পাওয়া যাবে ওর ফাইলে।
দরজায় যদি তালা দেয়া থাকে? ভেঙে ফেলবে।
মূল বাড়ির পশ্চিম অংশের শেষ মাথায় রয়েছে ব্র্যান্ডনের অফিস। দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল সে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।
ভারী দম নিয়ে হাত বাড়াল দরজার নবের দিকে।
সহজেই খুলে গেল ওটা। দরজা ঠেলে খুলে অন্ধকার অফিসে পা রাখল সে।
বাতির সুইচের জন্যে দেয়াল হাতড়াতে শুরু করল। আলো জ্বললে দেখা গেল ব্র্যান্ডনের ছোট, সবুজ রঙ করা ধাতব ডেস্কটা। একটা মাত্র ফাইল ফোল্ডার রয়েছে তার ওপর। আর আছে ছোট একটা ঘড়ি, একটা স্পীকারফোন, একটা ক্লিপবোর্ড, আর একটা ধাতব হুইসেল।
দেয়াল ঘেঁষে রাখা তিনটে উঁচু উঁচু ফাইল কেবিনেট।
আসল ড্রয়ারটা কিভাবে খুঁজে বের করবে? ঠিক ফাইলটা? দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দ্বিধা করতে লাগল সে।
আস্তে করে পেছনে লাগিয়ে দিল দরজাটা।
কেউ এসে দেখে ফেললে জবাব দেয়া কঠিন হয়ে যাবে। কিন্তু পরোয়া করে না সে। ব্যাখ্যা দরকার তার। এবং এখনই।
বাঁয়ের কেবিনেটটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। প্রতিটি ড্রয়ারের লেবেল পড়ল। ওপরের ড্রয়ারটায় লেখা : ফিনানশিয়াল। দ্বিতীয়টায় লেখা : মেম্বারশিপ।
হাঁটু গেড়ে বসে তৃতীয় ড্রয়ারের লেবেল পড়ল। ওটায় লেখা : এমপ্লয়মেন্ট।
'হ্যাঁ!' ফিসফিস করে নিজেকে শোনাল সে।
টান দিয়ে ড্রয়ারটা খুলল। ফাইলে ঠাসা।
হাঁটুতে ভর দিয়ে থেকেই ওগুলো দেখতে লাগল সে। এমপ্লয়িদের নাম লেখা রয়েছে অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে।
'তারমানে বের করা অত কঠিন না,' আবার নিজেকে শোনাল সে।
সামনের ফাইলগুলো আঙুল দিয়ে ঠেলে ঠেলে দেখতে লাগল। ডব্লিউতে এসে পেয়ে গেল : উইনার। জোসেফ উইনার।
হাত কাঁপছে ওর। ফাইলটা তুলে আনতে তিনবার হাত ফসকাল।
'এই তো আমারটা!' ফিসফিস করে শোনাল নিজেকে। 'এখানেই আছে!'
ফাইলটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। দেখার সুবিধের জন্যে ডেস্কে এনে ফেলল।
ফাইলের ওপরে লেখা 'জোসেফ উইনার' নামটা আরেকবার পড়ল, নিশ্চিত হবার জন্যে।
খুলতে দ্বিধা করছে।
হঠাৎ করে গরম হয়ে গেছে শরীর। শীত লাগছে। অদ্ভুত ব্যাপার। শরীর হয় গরম, লাগে শীত। চামড়ায় কাঁটা দিল। মুখের মধ্যে শুকনো।
হাতের কাঁপুনি বেড়ে গেছে।
ফাইল ফোল্ডারটা খুলতে বেশ অসুবিধে হলো। হাত কাঁপার কারণে।
অবশেষে খলতে পারল। এক এক করে কাগজগুলো টেনে বের করে রাখল

ডেস্কের ওপর। ঝুঁকে দাঁড়াল পড়ার জন্যে।

পরিচিত তথ্যগুলো জেনে নিল প্রথমে। নিজের জন্মদিন। জন্মস্থান। বাবা-মা'র নাম।

প্রথম পৃষ্ঠার তলায় নেমে গেল দৃষ্টি।

লেখাগুলো বার বার পড়তে লাগল।

'না না!' চিৎকার করে উঠল কোথায় রয়েছে সব কিছু ভুলে। 'আমি বিশ্বাস করি না!'

একুশ

কোথাও কিছু একটা ভুল হয়েছে। নিজেকে বোঝাল জোসেফ।

ডেস্কের কিনার খামচে ধরেছে দুই হাতে। মনে হচ্ছে ছেড়ে দিলেই পড়ে যাবে।

পড়ে যাবে। পড়তেই থাকবে। কোনদিন আর উঠতে পারবে না।

গাঢ় নীল কালি দিয়ে পাতাটার নিচে লেখা একটিমাত্র অক্ষরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে : মৃত।

'অসম্ভব!' আবার চিৎকার করে উঠল সে। 'এই যে আমি! জীবিত!'

সবচেয়ে ওপরের পাতাটা তুলে নিয়ে একপাশে ফেলে দিল সে। দ্বিতীয় পাতায় টেপ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে খবরের কাগজের একটা কাটিং। হেড লাইনে বলা হয়েছে

ব্ল্যাকফরেস্টের ছেলে ডুবে মরেছে
ক্লাবের পুলে

দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়ে আসছে ওর। চোখের সামনে অদ্ভুত ঝিলিমিলি। জোর করে আর্টিকেলটা পড়তে চাইল।

পারল না। চোখেই দেখছে না যেন কিছু। ভাবতে পারছে না।

কাটিংটা খুলে এনে চোখের সামনে ধরল। চোখ কুঁচকে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে তাকাল লেখাগুলোর দিকে। পড়তে পারল অবশেষে :

প্যাসিফিক সাইড কান্ট্রি ক্লাবে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে...জোসেফ উইনার নামে একটা ছেলে ডুবে মারা গেছে...লাইফগার্ড ছিল সে। সাঁতার জানত। মাথায় বাড়ি খেয়ে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল বলে আর উঠতে পারেনি...

শব্দগুলোর মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছে না জোসেফ।

লেখার ওপরে তারিখটা দেখল। এক বছরের পুরানো।

কাটিংটাতে বলছে জোসেফ মারা গেছে এক বছর আগে। অথচ দিব্যি বেঁচে আছে সে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে তার নিজের মৃত্যুর খবর।

নাহ্, কিছুই মাথায় ঢুকছে না। মানে বুঝতে পারছে না।

কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল মাটিতে।

হাঁটু দুটো পেটের কাছে জড়ো করে এনে দুই হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল। কিছুতেই বুঝতে পারছে না তার মৃত্যুর খবর ছাপা হলো কেন!

বাইশ

দুদিন পরের ঘটনা।

'কিং,' রবি ডাকল, 'ফোন রেখে দয়া করে এসে এখন খেতে বসো।'

ডাইনিং রুমের একধারে দাঁড়িয়ে রিসিভারে প্রায় মুখ লাগিয়ে আরও কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করল সে। তারপর টেবিলের কাছে এসে বলল, 'বাপরে, এতটা জনপ্রিয় হয়ে গেলাম কবে? খালি ফোন আসে...'

'ফোন আসে, নাকি মাকে করো? এসে দুদু খাইয়ে দিয়ে যাওয়ার জন্যে?' রসিকতা করল সুজি।

হেসে উঠল সবাই।

লাল হয়ে গেল কিং-এর মুখ। 'মাকে ফোন করি না আমি!' শুকনো স্বরে বলে বসে পড়ল চেয়ারে। প্রায় থাবা দিয়ে প্লেট থেকে তুলে নিল একটা বার্গার।

'কাকে ফোন করেছে ও, আমি জানি,' হাসতে হাসতে গেরি বলল। 'একটা ছাগলকে। ছাগলটা ছিল ওর ওস্তাদ। ঘাস-পাতা-লতা কি করে খেতে হয় শিখিয়েছে। এখন পয়সা দাবি করছে।'

রাগ ফুটল কিং-এর চেহারায়। জবাব দিল না।

'আমার মনে হয়, কিংকে এভাবে অপমান করা বাদ দেয়া উচিত আমাদের,' রবি বলল। 'সারাক্ষণ কেন এভাবে ওর পেছনে লেগে থাকা?'

'কারণ ও কিং, রাজা,' গেরি বলল। 'রাজার পেছনে প্রজারা লেগে থাকবেই।'

বার্গারটা প্লেটে ফেলে দিয়ে জ্বলন্ত চোখে গেরির দিকে তাকাল কিং। 'ওয়েইট রুমে চলো, দেখাচ্ছি তোমাকে মজা!'

হাসিটা বেড়ে গেল আরও গেরির। 'হাহ্ হাহ্! আরে বলে কি রে।'

'হ্যাঁ, চলো, ওয়েট লিফটিঙের প্রতিযোগিতা হবে,' গাল এখনও লাল হয়ে আছে কিং-এর। নার্ভাস ভঙ্গিতে টোকা দিচ্ছে প্লেটের কিনারে। 'চলো, বাহাদুর সিপাহী; দেখি তোমার কত ক্ষমতা। শুধু তুমি আর আমি।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল গেরি। কিং-এর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি বলছ? তুমি সিরিয়াস?'

'অ্যাই, কি শুরু করলে! বসো,' কিছুটা ধমকের সুরেই বলল রবি। অস্বস্তি বোধ করছে ও।

কিন্তু শুনল না গেরি। জোসেফের মাথার ওপর দিয়ে হাত বাড়াল।

কিং-এর পাশে বসা ছিল জোসেফ। মাথা নামিয়ে ফেলল ঝট করে।

'ওয়েট লিফটিং কাকে বলে দেখাচ্ছি,' বলেই দুই হাতে ধরে একটানে তুলে ফেলল কিংকে।

'আরে আরে, কি করছ!' বাধা দেয়ার জন্যে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রবি 'শান্তিতে একটু খেতেও দেবে না নাকি?'

রবির কথা যেন কানেই যায়নি গেরির। টারজানের মত করে মাথার ওপর তুলে ধরল কিংকে।

'আহ্, ছাড়ো, ছাড়ো!' চিৎকার করছে কিং।

কিন্তু ছাড়ল না গেরি। একবার হাত সোজা করে ওপরে তোলে কিংকে, আবার নামায়, ওয়েট লিফটিং যে ভাবে করে।

হাত-পা ছুঁড়ে, শরীর মুচড়ে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল কিং।

হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে সবাই, দু'একজন বাদে। খুব মজা পাচ্ছে।

'একে বলে ব্যায়াম,' হাসতে হাসতে বলল গেরি। কিছুটা নামিয়ে এনে হাত থেকে ছেড়ে কিংকে।

মেঝেতে পড়েই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিং। ঘুষি পাকিয়ে এল গেরির নাকে মারার জন্যে।

দেয়ালের মত এসে দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল রবি। দুজনকে হাত মিলিয়ে মিটমাট করে নিতে বাধ্য করল।

'এমনি এমনি,' কিং-এর দিকে তাকিয়ে বলল গেরি, 'একটু মজা করছিলাম। সত্যি সত্যি লাগিনি।'

কিন্তু স্বাভাবিক হলো না আর কিং। তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'তুমি আসলে মানুষ না!'

আড়ষ্ট হয়ে গেল ঘরটা। সেটা কাটানোর জন্যে অভিনয় শুরু করল ডিউক। একজন ধনী মহিলা ক্লাবে এসেছিল বিকেলে। কি করে একহাতে একটা শিশুকে ধরে রেখে আরেক হাতে সিগারেট টানছিল, অভিনয় করে দেখাল।

ধনী মেম্বারদের কেন যেন দেখতে পারে না ডিউক। ওদের কথা উঠলেই খেপে যায়। তবে কি সে গরীবের ছেলে?

ওর অভিনয় দেখে হাসাহাসি শুরু হলো আরেকবার। জোসেফের ভাল লাগল না। সে চুপ করে রইল। ব্ল্যাকফরেস্টে যেদিন গিয়েছিল, তারপর থেকে একটাই ভাবনা তার–নিজের সম্পর্কে ভাবনা। গত গ্রীষ্মের কথা মনে করার চেষ্টা করে সর্বক্ষণ।

কিন্তু একটা কথাও মনে পড়ে না।

শুধু এটুকু বলতে পারে জোর দিয়ে, সে মারা যায়নি।

ও জানে, ব্র্যান্ডনের অফিসের ফাইলটায় ভুল লেখা হয়েছে কোনভাবে ব্ল্যাকফরেস্টে ওদের বাড়িটাতে যে মহিলা বাস করছে এখন, সে-ও ভুল করছে।

কোন ধরনের অদ্ভুত ভুল।

সে বেঁচে আছে।

জেরি যে সব ভূতের কথা বলেছে, ওগুলোর কোনটা নয় সে। জীবন্ত মানুষ।

কিন্তু ভুলের ব্যাখ্যাটা কি?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফোন নিয়ে কাটিয়েছে সে গত দুদিনে। কিন্তু মা-বাবার হদিস করতে পারেনি।

রবি খুব বিবেচক। রাতে দেরি করে ফেরার জন্যে একটা কথাও বলেনি। ও

নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে, কোন কারণে মন অস্থির হয়ে আছে জোসেফের তাকে ভাবার জন্যে, শান্ত হওয়ার জন্যে সময়ও দিচ্ছে প্রচুর।

রবি সত্যি ভাল।

জেরিও ভাল। সে-ও বুঝতে পেরেছে, খুব খারাপ সময় যাচ্ছে জোসেফের। সহানুভূতি জানিয়ে বলেছে, কারও সঙ্গে যদি কথা বলতে ইচ্ছে করে, এবং কাউকে যদি না পাওয়া যায়, তাহলে নির্দ্বিধায় যেন তার সঙ্গে বলে।

কিন্তু মাঝে মাঝেই ঘরে যখন একা থাকে দুজনে, জেরিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছে জোসেফ। যেন ও কোন ধরনের গবেষণার বস্তু, ল্যাবরেটরির আজব কোন গিনিপিগ, ওর ক্রুটের মত জোসেফকেও খাঁচায় ভরে রাখলেই যেন ভাল হত।

জেরি হয়তো মনে করছে জোসেফ পাগল। পাগলের সঙ্গে যে ব্যবহার করা উচিত, সেটাই করছে সে-জন্যে।

মহা সমস্যার মধ্যে থেকেও সব দুশ্চিন্তা দূরে সরিয়ে মনটাকে শান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে জোসেফ।

রীমার মৃত্যুর পর এটাই প্রথম রাত্রি, যেদিন সবাই আবার স্বাভাবিক আচরণ করছে।

উঠে দাঁড়াল আবার ডিউক। পুলের ধারে একজন বুড়ো মানুষ কিভাবে পা টেনে টেনে হেঁটেছে দেখানো শুরু করল। ভাল নকল করতে পারে সে।

জোসেফের দিকে কাত হয়ে ফিসফিস করে কি যেন বলল কিং। মাথা ঝাঁকাল জোসেফ। কিন্তু পুরোপুরি বুঝতে পারেনি কিং-এর কথা।

জেরি আবার ভূতের গল্প শুরু করল। কি করে মানুষ ডুবে মারা যায় পুলের পানিতে। অভিশপ্ত হয়ে আছে ক্লাবটা।

'জেরি, দয়া করে তোমার ভূতের গল্প বন্ধ করো তো। আর ভাল্লাগে না!' টেবিলের অন্য পাশ থেকে অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল গেরি।

'তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না তো?' থামল না জেরি, তার কথা সে চালিয়েই গেল। 'কিন্তু...'

'চুপ করো!' চেঁচিয়ে উঠল গেরি। 'তোমার ওই বোকা ছেলের ভূতের গল্প শুনতে শুনতে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়েছে আমাদের সবারই। একটা আসল খুন হয়ে গেছে আমাদের এখানে। সেটা বাদ দিয়ে শুরু করেছ পেঁচাল।'

'হ্যাঁ!' গেরির সঙ্গে সুর মেলাল সুজি। 'বার বার ওসব আলোচনা করে পুরো ছুটিটাই নষ্ট করতে চাই না।'

জেরির গাল লাল হয়ে গেল। চোখ দুটো জ্বলে উঠল রাগে। টেবিলের নিচে দুই হাতের মুঠো শক্ত করে ফেলল।

'তোমার সমস্যাটা কি?' ভুরু নাচাল গেরি। 'মুখটাকে সব সময় এমন ভার করে রাখো কেন?'

জেরিকে এ ভাবে আক্রমণ করে কথা বলাটা জোসেফের ভাল লাগল না। গেরি আর সুজি, দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের ভাল না লাগলে তোমরা শুনো না। আমার খুব ভাল লাগে জেরির গল্প।'

'তাই নাকি!' চোখ টেরা করে জোসেফের দিকে তাকাল গেরি। 'তুমি নিজেই তো একটা ভূত! ভূতের গল্প আর কি শুনবে?'

'এই, তোমরা থামবে?' বাধা দেয়ার চেষ্টা করল রবি। দুই হাত তুলে সবাইকে থামার ইঙ্গিত করল।

কিন্তু কেউ থামল না। বরং একসঙ্গে চিৎকার শুরু করল।

বাহুতে একটা উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করল জোসেফ। কাত হয়ে কানের কাছে ফিসফিস করে বলল কিং, 'চলো, এখান থেকে চলে যাই। তাজা বাতাসে। দম আটকে দিচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকাল জোসেফ। 'হ্যাঁ। চলো। এখানে থাকার চেয়ে যে কোনখানে যাওয়া ভাল।'

ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। হল থেকেও শোনা যাচ্ছে হট্টগোল।

মাথা নাড়তে নাড়তে আফসোসের ভঙ্গিতে বলল কিং, 'যদি খালি ঘুণাক্ষরেও জানতাম খাওয়ার সময়ও চুপ থাকে না এরা, ঝগড়া, তর্ক বাধিয়েই রাখে, কোন পাগলে বাড়ি থেকে বেরোত। অন্তত এখানে আসতাম না।'

পুলের দিকে এগোল দুজনে। ঢেউয়ের মৃদু শব্দ হচ্ছে পুলের পানিতে।

ভারী দম নিয়ে সন্ধ্যার আকাশের দিকে মুখ তুলল জোসেফ। অনেক বেশি সময় কাটিয়ে দিয়েছে ডিনার সারতে।

সবে অস্ত গেছে সূর্য। আকাশের নিচুতে ঝুলে থাকা মেঘের গায়ে গোলাপী আভা। দিগন্তে দেখা দিয়েছে আধখানা ফ্যাকাসে চাঁদ।

পুলের পাশ কাটাল ওরা। টেনিস কোর্টের দিকে এগোল।

ঢোলা পাজামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাঁটছে কিং। নীল একটা শার্ট গায়ে দিয়েছে। বুকের কাছে তিনটে বোতাম খোলা।

'কি মনে হচ্ছে তোমার?' হাঁটতে হাঁটতে বলল জোসেফ। 'যা অবস্থা দেখা যাচ্ছে, পুরো গ্রীষ্মটা কি কাটাতে পারবে মনে হয় এখানে?'

'কি জানি!' কান চুলকাল কিং। 'অবস্থা তো বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার।'

টেনিস কোর্ট ছাড়িয়ে এল ওরা। অন্ধকার এত বেশি হয়ে গেছে, রাস্তাটাই আর ভালমত চোখে পড়ছে না। গাছপালায় ভরা একটা জায়গায় চলে এসেছে ওরা, ছোটখাট বন বললেও হয়। এখান থেকে শুরু হয়েছে ক্লাবের গলফ কোর্স।

পেছনে ডাক শোনা গেল।

ফিরে তাকিয়ে দেখল, ডিউক আসছে। দ্রুতপায়ে ওদের কাছে চলে এল সে। 'হাঁটতে বেরিয়েছ বুঝি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল জোসেফ।

কেন যেন ডিউকের আসাটা পছন্দ করতে পারল না কিং। বেশি মানুষ হয়ে গিয়ে আবার হট্টগোল বাধতে পারে, এই আশঙ্কাতেই হয়তো। কথাবার্তা আর জমাতে পারল না ও। কিছুটা রাগ করেই আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে হনহন করে হেঁটে চলে গেল গেস্ট হাউসের দিকে।

'আমার আসাটা বোধহয় ভাল লাগেনি তার,' কিং-এর দিকে তাকিয়ে থেকে

বলল ডিউক।

জোসেফ ফিরল না। ডিউকের সঙ্গে সঙ্গে এগোল বুনো পথ ধরে। শান্ত এই নীরবতা খুব ভাল লাগছে তার।

ডিউকেরও লাগছে, বলল সে। জেরি, সুজি আর গেরির ঝগড়াঝাঁটি সহ্য করতে পারেনি বলেই চলে এসেছে।

বনের মধ্যে দিয়ে কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল জোসেফ। ডিউকের একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'ডিউক, একটা কথা জিজ্ঞেস করব। সত্যি জবাব দেবে?'

'কি কথা?' অবাক হলো ডিউক।

বনের মধ্যে অন্ধকার বেশি। ঝিঁঝি ডাকতে শুরু করেছে।

'ডিউক...' কিভাবে শুরু করবে, কথা খুঁজে পাচ্ছে না জোসেফ। 'গত গ্রীষ্মে, তোমার আর আমার মাঝে কি কোন আন্তরিকতা ছিল?'

অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা না গেলেও জোসেফ বুঝতে পারছে তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে ডিউক। 'জোসেফ,' কোমল স্বরে বলল সে, 'হঠাৎ করে এমনভাবে তুমি চলে গেলে, বন্ধুত্ব করার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও করতে পারিনি।'

জবাবটা অবাক করল জোসেফকে। মুখের মধ্যে শুকিয়ে যাচ্ছে আবার। 'হঠাৎ করে চলে গিয়েছিলাম?'

'হ্যাঁ।'

'কেন? বলো, ডিউক, হঠাৎ করে কেন চলে গিয়েছিলাম আমি?'

জবাব দিল না ডিউক। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলল, 'কি অন্ধকার! কিছুই দেখা যায় না। চলো, ফিরে যাই।'

দমে গেল জোসেফ। প্রসঙ্গটা এভাবে এড়াল কেন ডিউক? ভয় পেল? সে-ও তাকে ভূত ভাবতে আরম্ভ করেনি তো!

তেইশ

পরদিন বিকেল। আরেকটা ভাপসা গরমের দিন। পুলের গভীর অংশে ডিউটি পড়েছে জোসেফের। অগভীর অংশের ওদিকটায় চোখ পড়তে দেখতে পেল পে-ফোনের রিসিভার ঝুলিয়ে রাখছে কিং। জোসেফের দিকে চোখ পড়তেই হাত নাড়ল। এদিকেই আসছে।

ঢোলা কমলা রঙের সুইম ট্রাংক পড়েছে। এতই ঢোলা, ঊরুর কাপড় নেমে গেছে হাঁটুর কাছে। খোলা বুকে একটা পশমও নেই। রোদে পুড়ে গোলাপী হয়ে গেছে। কুৎসিত লাগে। বাঁ কানের একমাত্র রূপালী রিঙটায় রোদ ঝিক করে উঠছে।

জোসেফের প্ল্যাটফর্মের কাছে এসে দাঁড়াল। গম্ভীর।

'কি, কিং?' জিজ্ঞেস করল জোসেফ।

'কাল অমন করে চলে এলাম বলে কিছু মনে করোনি তো?'

'না। কেন করব?'

'আসলে...ডিউকটাকে আমি দেখতে পারি না।'

'সে তো বোঝাই গেছে। কিন্তু দেখতে পারো না কেন? সে তো খারাপ না।'

'কি জানি কেন পারি না। কিছু কিছু মানুষকে কেউ কেউ কোন কারণ ছাড়াই অপছন্দ করে, এটাও তেমনি।'

কিছু বলল না জোসেফ।

বাচ্চাদের পুলের দিকে তাকাল দুজনেই। রবারের ভেলায় ভাসছে তিনটে বাচ্চা ছেলে। একটা বীচ বল ছুঁড়ে ওদের গায়ে লাগানোর চেষ্টা করছে অন্য আরেকটা ছেলে।

জোসেফের দিকে ফিরল আবার কিং। 'সন্ধ্যায় কি করবে আজ? চলো, শহরে যাই। সিনেমা দেখব...'

'নাহ্। ইদানীং সিনেমা আমার একদম ভাল্লাগে না।' কিং-এর সঙ্গ ভাল লাগছে না জোসেফের। ওর মধ্যে একটা গায়েপড়া স্বভাব আছে, যেটা বিরক্তিকর।

'ঠিক আছে, তাহলে অন্য কিছু,' প্ল্যাটফর্মের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল কিং।

চুপ করে রইল জোসেফ। আসলে কোন কিছুই করতে ভাল লাগবে না তার, যতক্ষণ না রহস্যগুলোর সমাধান করতে পারছে।

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে ব্র্যান্ডন। চিৎকার করে কিংকে ডেকে বাচ্চাদের পুলে পাহারা দিতে যেতে বলল।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল জোসেফ। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না ওর। তারচেয়ে বসে বসে চুপ করে ভাবা অনেক ভাল, এ মুহূর্তে।

কিংকে বাচ্চাদের পুলের দিকে যেতে দেখছে সে। কি মনে করে চোখ ফেরাতেই চমকে গেল। কখন নীরবে এসে কাছে দাঁড়িয়েছে একজন মোটা মহিলা। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

কি দেখছে?

মহিলা মাঝবয়েসী। বেঁটে। গোল মুখ। কালো কোঁকড়া অতিরিক্তি পাতলা চুল। কালো সুইম স্যুটের ওপরে উজ্জ্বল হলুদ একটা শার্ট পরেছে, কোনা দুটো বেঁধে নিয়েছে কোমরের কাছে। কাঁধে ঝোলানো হলুদ রঙের একটা বড় বীচ ব্যাগ।

'তুমি...' কথাটা শেষ করল না মহিলা। ভীষণ চমকে গেছে। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

জোসেফও তাকিয়ে রইল। মহিলা কি তার পরিচিত?

মনে করতে পারছে না।

'তুমি সেই ছেলেটা না?' গাল লাল হয়ে গেছে মহিলার। দৃষ্টি কঠিন হয়ে গেল আরও। সরু হয়ে এল চোখের পাতা। 'তুমি...ঠিক হয়ে গেছ?'

দ্বিধায় পড়ে গেল জোসেফ। কি বলতে চায় মহিলা?

'হ্যাঁ, ঠিকই তো আছি আমি,' জবাব দিল সে।

'কিন্তু...' আবার কিছু বলতে গিয়েও বলল না মহিলা। গালের কাছে হাত নিয়ে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইল তার দিকে। দ্বিধায় পড়ে গেছে। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'সরি। আমি ভেবেছি...না, ভুল হয়েছে আমার!'

দ্রুতপায়ে চলে গেল মহিলা।

কি বলতে চাইল মহিলা? বলল না কেন? আমাকে দেখে এতটা চমকেই বা গেল কেন–ভাবছে জোসেফ। কথাই বেরোচ্ছিল না মুখ দিয়ে। যেন ভূত দেখছে।

'আমি বেঁচে আছি!' মহিলার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল সে। 'শুনছেন? আমি জোসেফ উইনার! আমি বেঁচে আছি!'

জবাব পাওয়া গেল না। কারণ মহিলা নেই কাছাকাছি। তার ডাক শুনতে পেল না।

চব্বিশ

ডিনারের সময় টানটান উত্তেজনা সবার মধ্যে। আগের রাতের মত ঝগড়া-বিবাদ তর্কাতর্কি চায় না আর কেউই। অপ্রীতিকর কিছু যাতে না ঘটে সে-চেষ্টা করছে সবাই। তিন বাচ্চার মা এক ধনী মহিলা কি করেছে পুলের ধারে, অভিনয় করে দেখাল ডিউক। গেরি শোনাল তার ফুটবল জীবনের ইতিহাস। সবাই হাসার চেষ্টা করছে, হাসি আসছে না। কথা বলতে চাইছে, জমছে না। কেউ তর্ক শুরু করলেও বাকি সবাই মিলে চেপে ধরে থামিয়ে দিচ্ছে তাকে।

জোসেফ একেবারে চুপ। মহিলা দেখা দিয়ে যাওয়ার পর মনের অবস্থা তার আরও শোচনীয়। মনের এই চাপ আর সে সহ্য করতে পারছে না।

জেরির দিকে তাকাল। যদি ওকে বলে দেয়, সে একজন মৃত লাইফগার্ড, কি ভাববে জেরি? যদি বলে প্রমাণ আছে–অফিসে নিয়ে গিয়ে ফাইল খুলে খবরের কাগজের কাটিংটা দেখিয়ে দেয়?

কাউকে কিছু বলল না সে। বলতে পারল না।

ঘটনাটার একটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা না পাওয়া পর্যন্ত বলতে পারবেও না।

পত্রিকায় কেন এ রকম একটা মিথ্যে খবর ছাপল সেটা জানতে হবে আগে।

ডিনারের পর বেরিয়ে চলে এল সে। পুলের কাছে এসে দাঁড়াল। ভীষণ গরম পড়েছে। আকাশের রঙ ফ্যাকাসে নীল। বহুদূরে আকাশের সীমানায় ভেসে বেড়াচ্ছে কিছু হালকা মেঘ। কালো মেঘ। ছড়িয়ে পড়লেই বৃষ্টি নামবে। গলফ কোর্সের ওপাশে গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে অস্ত যাচ্ছে টকটকে লাল সূর্য।

পুলের পাড়ে বসে সঙ্গে করে আনা একটা বই পড়ার চেষ্টা করল জোসেফ। কিন্তু মন বসাতে পারল না। একটা লাইনও ঢুকল না মগজে।

অস্থিরতা, অস্বস্তিতে ভরে আছে মন। পিঠে লাগছে লাউঞ্জ চেয়ারের শক্ত হেলানটা।

উঠে হাঁটতে শুরু করল। এগিয়ে চলল গলফ কোর্সের দিকে।

গেস্ট হাউস পার হয়ে ছোট বিল্ডিংটার কাছে চলে এল যেটাতে ব্যায়াম করা হয়। কানে এল কণ্ঠস্বর। রাগত কণ্ঠ।

রাস্তায় বেড়া দিয়ে রাখা পাতাবাহারের ঝোপের ওপর দিয়ে উঁকি দিল সে।

অস্তগামী সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ে পরিচিত সব কিছুকেই কেমন অপরিচিত, অবাস্তব করে তুলেছে।

লাল রোদ চোখে লাগছে। তার ভেতর দিয়েই সুজি আর গেরিকে দেখতে পেল সে। ওয়েইট রুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দুজনে।

'শয়তান কোথাকার!' গালাগাল করছে সুজি। 'শুয়োর! কুত্তা! আগে জানলে তোকে আমি খুন করতাম! মেয়েমানুষ দেখলে আর হুঁশ থাকে না তোর। যাকে দেখিস তার পেছনেই লাগিস।'

'সুজি, শোনো! শান্ত হও!' বোঝানোর চেষ্টা করছে গেরি।

শুনল না সুজি। আরও জোরে চিৎকার করে উঠল।

কোনমতেই থামছে না ঝগড়া। গেরি যতই বোঝানোর চেষ্টা করে, সুজি ততই উত্তেজিত হয়।

গাছের আড়ালে হারিয়ে গেল সূর্য। লম্বা লম্বা ছায়া পড়ল মাটিতে।

'তোকে আমি খুন করব একদিন! দেখিস!'

ওদের ঝগড়া শুনতে আর ভাল লাগল না জোসেফের। নিজের মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে এমনিতে। অন্যের ঝগড়া কি আর সহ্য হয়।

আবার হেঁটে চলল সে যেদিকে যাচ্ছিল।

রাতে ঘরে ফিরে এসে আবার বাবা-মাকে ফোন করার চেষ্টা চালাল। সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। একঘেয়ে যান্ত্রিক কণ্ঠে ভেসে আসে রেকর্ড করা মেসেজ। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে চোখে পানি এসে গেল তার।

বুঝতে পারছে অনন্তকাল ধরে চেষ্টা চালালেও বাবা-মা'র কোন খোঁজ পাবে না আর সে।

বিছানার কিনারায় বসে ফোনটার দিকে তাকিয়ে রইল। আকুল হয়ে চাইতে লাগল বাজুক, বেজে উঠুক। রিসিভার কানে ঠেকালেই যাতে শুনতে পায় মা'র সুরেলা গলা, 'জোসেফ, কেমন আছিস, বাবা? কি যে ঝামেলায় জড়িয়েছিলাম, খোঁজ নিতে পারিনি। তুই কেমন আছিস?'

কিন্তু আশা করাই সার হলো। ফোন আর বাজল না।

ক্রুটের খাঁচাটার দিকে তাকাল সে। খাঁচার ভেতরে দেয়ালে দেয়ালে ঠোকর খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। বেরোনোর পথ খুঁজছে। ইঁদুরটার পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের অনেক মিল খুঁজে পেল সে।

বিদ্যুৎ চমকের মত ঝিলিক দিয়ে গেল আইডিয়াটা।

তাই তো, আগে মনে পড়েনি কেন?

থাবা দিয়ে তুলে নিল রিসিভার। তার এক খালু, আঙ্কেল ব্রাইটনকে ফোন করলেই তো জবাব পাওয়া যায়। নম্বরটাও জানা আছে।

দ্রুত নম্বরগুলো টিপে চলল সে। রিঙ হতে লাগল ওপাশে। বারো বার বাজার পরও যখন কেউ তুলল না নিরাশ হয়ে আবার রিসিভারটা ক্রেডলে ফেলে দিল সে।

আর কি করবে?

প্যাসিফিক সাইডে এসেছে দুই হপ্তার কাছাকাছি হতে চলল। আত্মীয়-স্বজন

বন্ধু-বান্ধব কেউ তার খোঁজ নিচ্ছে না। কেউ একটা চিঠি লিখছে না।
কেন নিচ্ছে না?
জবাবটা মাথায় আসতে ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত শিহরণ তুলে নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। সবারই ধারণা, সে মৃত। পানিতে ডুবে মরে গেছে।
এগারোটা পর্যন্ত একভাবে বসে রইল সে। জেরি এখনও ফিরছে না। চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে বোধহয়। জোসেফও দিতে পারত। যদি মনে শান্তি থাকত।
সময় আর কাটে না। ওয়াকম্যানে গান শোনার চেষ্টা করল। বই পড়তে চাইল। সব বৃথা। কোন কিছুতেই মন বসাতে পারছে না।
বারোটার কয়েক মিনিট পর, সবে অস্থির তন্দ্রাটা লেগে এসেছে চোখে, এই সময় কি জানি কেন ভেঙে গেল ঘুমটা।
ঘুটঘুটে অন্ধকার।
বিমূঢ়ের মত উঠে বসল বিছানায়। দরজার বাইরে থেকে ডাকছে সেই রহস্যময় ফিসফিসে কণ্ঠটা 'জোসেফ··· বেরোও!··· বেরিয়ে এসো!···কত আর ঘুমাবে?'

পঁচিশ

'কে?' চিৎকার করে ডেকে জিজ্ঞেস করল জোসেফ।
বিছানায় বসে থেকেই পা নামাল মাটিতে। উঠে টলমল পায়ে এগিয়ে চলল বন্ধ দরজার দিকে।
নীরব হয়ে আছে হলের মধ্যে।
'কে ওখানে?' আবার জিজ্ঞেস করল জোসেফ। দম বন্ধ করে কান পেতে রইল জবাব শোনার আশায়।
'জোসেফ, প্লীজ, এসো!' মোলায়েম ফিসফিসে কণ্ঠস্বর।
বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে জোসেফের। গরমের মধ্যেও গায়ে চাদরটা জড়িয়ে চোখ বোলাল অন্ধকার ঘরের মধ্যে। জেরি কোথায়?
'জোসেফ, প্লীজ। জোসেফ···'
টান দিয়ে দরজা খুলে হলওয়েতে মাথা বের করে দিল জোসেফ।
কেউ নেই।
বাতাস ভীষণ গরম। ভাপসা গন্ধ। বেরিয়ে এসে আস্তে করে পেছনে লাগিয়ে দিল দরজাটা। 'কে?'
জবাব নেই।
'জেরি?' ডাক দিল জোসেফ।
জবাব নেই।
ঘাড়ের কাছে শিরশির করে উঠল তার। নাইটগাউনের কলার তুলে দিল। কোমরের বেল্ট বেঁধে নিল শক্ত করে।

'জোসেফ, প্লীজ, এসো!' পুলে বেরোনোর দরজার কাছ থেকে শোনা গেল ডাকটা।

পিছু নেবে?

উচিত হবে না।

কিন্তু থামাতে পারল না নিজেকে।

জটিল এই রহস্য ভেদ করতে হলে যে কোন ঝুঁকি নিতে হবে তাকে।

ফিসফিসে কণ্ঠকে অনুসরণ করে কাঁচের দরজাটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। বাইরে কালো আকাশের ছায়া প্রতিফলিত হচ্ছে পুলের পানিতে। ফ্লাডলাইটের আলোয় চকচক করছে পানি।

দরজা খুলে বাইরে বেরোল সে। গরম বাতাসের ঘূর্ণি যেন তাকে ঘিরে পাক খেয়ে চলল। হ্যাঁচকা টান মারছে নাইটগাউন ধরে। পুলের ওপাশে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে গাছের ডাল। পাতায় নাড়া দিয়ে বিচিত্র ফিসফিসে সুর তুলছে।

পুলে যাওয়ার মাঝপথে থেমে গেল সে। গাছগুলো যেন ফিসফিস করে সাবধান করছে ওকে : এসো না...এসো না...এসো না...

কেঁপে উঠল শরীর। তাকিয়ে আছে পুলের পানির দিকে। তার মনে হলো নীল শার্ট পরা ছেলেটাকে দেখতে পাবে এখনই। মুখ ডুবিয়ে ভাসছে।

কিন্তু শূন্য পুল।

'জোসেফ, এসো, প্লীজ!' আবার শোনা গেল অনুরোধ, বাতাসের কোমল ফিসফিসানির মত।

দ্বিধা করতে লাগল সে।

সত্যি শুনছে? নাকি কল্পনা?

নিজের মনের ভেতর থেকে আসছে না তো?

না!

গেস্ট হাউসের পেছনে টেনে নিয়ে এল তাকে ডাকটা। অন্ধকার ডাইনিং রুমের পাশ কাটিয়ে এল। তারপর দূরের রুমগুলোর।

'জোসেফ, জলদি করো!'

ডাকটা কোথায় টেনে নিয়ে যেতে চায় ওকে?

সামনে মাটিতে এক চিলতে আয়তাকার আলো এসে পড়েছে। কোনখান থেকে পড়ল দেখার জন্যে চোখ তুলে দেখতে পেল ওয়েইট রুমের জানালা দিয়ে আসছে।

আলো কেন?

থেমে গিয়ে কান পাতল। বাতাসে বড় বেশি টানাটানি করছে নাইটগাউনের কাপড় ধরে। এটা পরে আসাটাই ভুল হয়ে গেছে। প্যান্ট পরে আসা উচিত ছিল।

'জোসেফ, প্লীজ, এসো!' ডাক শোনা গেল ওয়েইট রুমের দরজা থেকে।

সেদিকে এগোল সে। খালি পায়ে লাগছে ভেজা ভেজা, ঠাণ্ডা ঘাস।

'কে ওখানে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডেকে জিজ্ঞেস করল সে। 'কি চাও?'

টান দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল সে।

সিলিঙে লাগানো সবগুলো আলো জ্বলছে। ভেতরটা দিনের মত উজ্জ্বল। বাতাস

গরম। আঠা আঠা। ঘামের গন্ধে ভরা।

কালো রঙের ওয়েইটগুলো সব জমা করে রাখা একপাশের দেয়াল ঘেঁষে। রূপালী ওয়েইট মেশিনগুলো ঝকঝক করছে উজ্জ্বল আলোয়।

এক কদম আগে বাড়ল সে। দৃষ্টি ঘুরছে চতুর্দিকে। 'অ্যাই, কেউ আছ?' ছোট্ট ঘরটায় অতিরিক্ত জোরাল হয়ে বাজল ডাকটা। কর্কশ। 'কে ওখানে?'

নীরবতা।

গেরিকে দেখতে পেল সে। দুটো ওয়েইট মেশিনের মাঝখানে চিত হয়ে আছে।

'গেরি, এত রাতে এখানে কি করছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল জোসেফ।

দ্রুত এগোল গেরির দিকে। মোজাইক করা মসৃণ মেঝেতে ভেজা পা পিছলে যেতে চায়।

আচমকা তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা চিরে।

নিষ্প্রাণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে গেরি। ফাঁক হয়ে আছে মুখ। নীরবে সাহায্যের আবেদন জানানোর ভঙ্গিতে।

গুঙিয়ে উঠল জোসেফ।

একটা বারবেল পড়ে আছে গেরির গলায়। দুটো ভারের মাঝখানের দণ্ডটা এমন করে চেপে আছে, দম বন্ধ হয়ে গেছে গেরির। ঘাড়ের হাড়ও ভেঙে গিয়ে থাকতে পারে।

মারা গেছে গেরি।

হাঁপাতে হাঁপাতে নিচু হয়ে গলার ওপর ঝুঁকে বারবেলের ডাণ্ডাটা চেপে ধরল জোসেফ। অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন আর সরানোর কোন মানে হয় না।

আতঙ্কিত জোসেফ যেন ঘোরের মধ্যে করে চলেছে কাজগুলো। ঠিক করছে না বেঠিক করছে তা-ও ভাবছে না।

বারবেলটা তোলার জন্যে টান দিয়েছে, এই সময় পেছনে শোনা গেল পদশব্দ। বারবেল ছেড়ে দিয়ে ঘুরে তাকাল জোসেফ।

'ব্র্যান্ডন! আপনি!'

ছাব্বিশ

লাল আলো ঘোরাতে ঘোরাতে হুইসেল বাজিয়ে এসে হাজির হলো পুলিশ। গম্ভীর মুখে কাজ শুরু করল। ওয়েইট রূমের ভেতরে-বাইরে ছড়িয়ে পড়ল। কথা বলছে নিচু স্বরে।

কয়েকটা চেনা মুখ দেখতে পেল জোসেফ। রীমা যেদিন খুন হয়েছিল, সেদিনও এসেছিল ওরা। তাদের মধ্যে রয়েছে মহিলা অফিসার গ্রেগ। ব্র্যান্ডনের সঙ্গে কথা বলার সময় দ্রুত লিখতে লাগল নোটপ্যাডে।

বাকি লাইফগার্ডদেরও জড়ো করা হয়েছে। একপাশের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে

আছে ওরা। বিষণ্ণ। গম্ভীর।

কাঁদতে শুরু করেছে সুজি। দেয়ালে হেলান দিয়ে। দুই হাতে মুখ ঢেকে।

জেরিকেও খুঁজে পাওয়া গেছে। ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য হয়ে আছে চেহারা। চোখ আধবোজা। চুল ভেজা। পুলের কিনার দিয়ে হাঁটতে গিয়ে নাকি পিছলে পড়ে গিয়েছিল।

এককোণে দাঁড়িয়ে আছে রবি আর কিং। কিংকে উদ্‌ভ্রান্ত লাগছে। নার্ভাস ভঙ্গিতে বার বার টোকা দিচ্ছে দেয়ালের গায়ে।

ডিউক দাঁড়িয়ে আছে জোসেফের প্রায় গা ঘেঁষে। ভয় পাচ্ছে, পড়ে যাবে জোসেফ। তাহলে যাতে ধরে ফেলতে পারে।

'শুতে যাচ্ছিলাম,' গ্রেগের প্রশ্নের জবাবে ব্র্যান্ডন বলছে। 'ওয়েইট রুমে আলো চোখে পড়ল। এত রাতে আলো জ্বলার কথা নয়। দেখতে গেলাম। ভেতরে গিয়ে দেখলাম জোসেফকে। প্রথমে বুঝতে পারিনি কি করছে। এগিয়ে গিয়ে দেখি গেরির গলার ওপর থেকে বারবেল তুলছে।'

জোসেফের দিকে তাকাল গ্রেগ। দৃষ্টিটা আটকে রইল দীর্ঘ এক মুহূর্ত। তাকিয়ে থাকতে পারল না জোসেফ। চোখ সরিয়ে নিল।

আমাকে কি অভিযুক্ত করছে–ভাবল সে। কেঁপে উঠল। গ্রেগ কি ভাবছে আমিই গেরিকে খুন করেছি? ব্র্যান্ডনও কি তা-ই ভেবেছিল?

গেরির লাশের দিকে তাকাল সে। বারবেলটা সরানো হয়েছে। লাশটাও সরিয়ে এনেছে। এখনও আতঙ্কিত ভঙ্গিতে মুখ ফাঁক করে নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চোখ দুটো।

কালো একটা মাকড়সাকে গুটি গুটি কপালের দিকে এগিয়ে যেতে দেখল জোসেফ। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। মাকড়সাটাকে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে হলো।

গেরি সরাতে পারবে না। ওর হয়ে কাজটা করে দেয়ার ইচ্ছে হলো জোসেফের।

ওর হাত চেপে ধরল ডিউক, 'অ্যাই, তোমার খারাপ লাগছে?'

'না,' খসখসে গলায় জবাব দিল জোসেফ। 'দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।'

মাকড়সাটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। কপাল থেকে গালে নামল ওটা। তারপর ঘুরে এগোল নাকের দিকে। ঢুকে পড়ল নাকের ফুটোয়।

তীব্র একটা গোঙানি বেরিয়ে এল জোসেফের মুখ থেকে। বোঁ করে চক্কর দিয়ে উঠল মাথাটা।

আধঘণ্টা পর। সবাইকে কমন রুমে যেতে বলল পুলিশ। কেউ কাউচে, কেউ চেয়ারে গিয়ে বসল ওরা। অফিসার গ্রেগ ওদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। চামড়ার একটা আর্মচেয়ারে পা তুলে শরীরটাকে কুঁকড়ে বসল জোসেফ।

নীল একটা উলের চাদর ওকে এনে দিয়েছে রবি। শরীরে জড়িয়ে নিয়েছে সে ভালমত। গরম লাগছে এখন। তবু কাঁপুনি বন্ধ হচ্ছে না।

রান্নাঘর থেকে গিয়ে এক কাপ গরম চা এনে দিল ওকে ডিউক। চুমুক দিতে

গেল। হাতের কাঁপুনির চোটে ঠিকমত লাগাতেই পারছে না ঠোঁটে।

শান্ত হও, জোসেফ। শান্ত করো নিজেকে। বোঝাল সে। কেউ তোমাকে খুনী ভাবছে না এখনও। শক্ত হও।

দুই হাতে কাপটা ধরে চুমুক দিল সে। গরম বাষ্প লাগছে মুখে। আরাম লাগছে তাতে।

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল তার দিকে চেয়ে আছে অফিসার গ্রেগ। নিচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে। 'আবার সেই রহস্যময় শব্দটা শুনেছ?' কোন ভাবাবেগ নেই প্রশ্নটাতে। অতি সাধারণ। যেন চায়ে লেবু দেয়া হয়েছে কিনা, জিজ্ঞেস করছে।

মাথা ঝাঁকিয়ে চাদরটা আরও ভাল করে টেনে দিল গায়ে।

'কার গলা চিনতে পারোনি নিশ্চয়,' প্রশ্ন নয়, যেন সাধারণ আলোচনা। নিচের ঠোঁট কামড়ে চলেছে গ্রেগ।

'না,' ঢোক গিলল জোসেফ।

'অনুসরণ করলে কেন?'

নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল জোসেফের। বন্ধ করল। গ্রেগের চোখ থেকে চোখ সরাল না আর। 'জানি না।'

প্যাড নামাল গ্রেগ। 'কেন গেলে? আগের বার ওই কণ্ঠটা তোমাকে একটা খুন হওয়া মেয়ের লাশের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। এবারও যখন ডাকল, যেতে দ্বিধা হয়নি?'

চোখ বন্ধ করল জোসেফ। 'যেতে বলল, গেছি। এমন অনুরোধ শুরু করল, না গিয়ে পারলাম না। আমাকে তাড়াতাড়ি করতে বলল। আমি...'

চোখ মেলল সে। রাগ চেপে রাখতে পারল না আর, 'আমার কথা আপনি বিশ্বাস করছেন না, না?' চিৎকার করে উঠল সে। 'আপনি ভাবছেন বানিয়ে বলছি আমি। আপনি ভাবছেন গেরিকে আমি খুন করেছি, দুটো খুনই আমি করেছি।'

'আরে, থামো, থামো,' হাত তুলে থামতে বলল গ্রেগ।

'গেরিকে খুন করার কোন কারণ নেই আমার,' চিৎকার করে বলল জোসেফ। 'কোনই কারণ নেই।'

'কারও তো আছে,' দরজার কাছ থেকে বলল একটা পুরুষ-কণ্ঠ। একজন তরুণ পুলিশ অফিসার। লাল টুকটুকে গাল। সোনালি কোঁকড়া চুল বেরিয়ে আছে ক্যাপের তলা দিয়ে। গ্রেগের পাশে এসে দাঁড়াল। 'কারও জন্যে কারণ আছে। সেই কারণ থাকাতেই কোন একজন একের পর এক খুনগুলো করে যাচ্ছে।'

বিড়বিড় করে গ্রেগকে কি বলল সে। তারপর চোখের পাতা সরু করে তাকাল আবার জোসেফের দিকে।

'গ্র্যান্ট, মৃত্যুর সময়টা জানা গেছে?' জিজ্ঞেস করল তাকে গ্রেগ।

'জনসন বলছে, অন্তত এক ঘণ্টা আগে খুন হয়েছে ছেলেটা। প্রথমে ভারি কিছু দিয়ে মাথার পেছনে বাড়ি মেরেছিল। বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাওয়ার পর নিশ্চয় বারবেলটা চাপিয়ে দিয়েছে তার গলায়। দম আটকে মারা গেছে তখন,' জোসেফের দিকে তাকিয়ে থেকেই জবাবটা দিল গ্র্যান্ট।

কেঁপে উঠে আবার চাদরের নিচে লুকানোর চেষ্টা করল জোসেফ।

'তোমাকে এত চেনা চেনা লাগছে কেন?' জোসেফের দিকে দুই কদম এগিয়ে এল গ্র্যান্ট।

প্রশ্নের জবাবে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল জোসেফের কারণ আমি এক বছর আগে এখানে এসেছিলাম!

কিন্তু করল না। বরং মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে বলল, 'জানি না কেন চেনা লাগছে। আগেও এখানে লাইফগার্ডের চাকরি করে গেছি, সেজন্যে হতে পারে।'

'তুমি কি এখানকার স্থানীয় লোক?' চড় মেরে চওড়া কপাল থেকে একটা মাছি তাড়াল গ্র্যান্ট।

জবাব দিতে যাচ্ছিল জোসেফ, কিন্তু জেরিকে প্রশ্ন শুরু করে দিয়েছে ততক্ষণে গ্রেগ, 'গেরির সঙ্গে জোসেফের সম্পর্ক কেমন ছিল? ঝগড়া-বিবাদ করেছে নাকি?'

কি জবাব দেয় শোনার জন্যে গ্রেগের দিক থেকে ঘুরে জেরির দিকে তাকাল জোসেফ।

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল জেরি। অস্বস্তি বোধ করছে। মাথায় হাত বোলাল। তারপর বলল, 'জোসেফ যা বলেছে সত্যি কথাই বলেছে। গেরিকে খুন করার কোন কারণ নেই ওর।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রবির দিকে ঘুরতে গেল গ্রেগ, কিন্তু জেরির কথা শেষ হয়নি। সে বলল, 'একটা কথা বোধহয় বলা দরকার।' মাথায় এখনও হাত বোলাচ্ছে সে।

'কি?' ভুরু নাচাল গ্রেগ।

গ্র্যান্ট তাকিয়ে আছে জেরির দিকে।

'ডিনারের পর হাঁটতে বেরিয়েছিল জোসেফ,' জেরি বলল। 'ওয়েইট রুমের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল গলফ কোর্সের দিকে। ওর সঙ্গে আমিও যাব বলার জন্যে ডাকতে যাচ্ছিলাম। এই সময় ঝগড়া শুনলাম। জোরে জোরে কথা বলছিল গেরি আর সুজি। সুজি ওকে খুন করার হুমকি দিচ্ছিল বার বার...'

জেরি কথা শেষ করার আগেই চিৎকার করে উঠল সুজি, 'ঝগড়া করেছি, সত্যি! কিন্তু আমি ওকে খুন করিনি! আমি খুন করিনি!' একটু থেমে বলল, 'জোসেফকে গলফ কোর্সের দিকে এগোতে আমিও দেখেছি। কিন্তু সামান্য কিছুদূর গিয়েই আবার ফিরে এসেছিল ওয়েইট রুমের দিকে। চুপচাপ সরে গিয়েছিল একপাশের অন্ধকার ছায়ায়। ওর হাঁটাচলাটা মোটেও স্বাভাবিক মনে হয়নি আমার। কেমন উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা, যেন মাথাটা ঠিকমত কাজ করছিল না ওর!'

সাতাশ

পালাতে হবে। জোসেফ ভাবছে।

পুলিশের তদন্তের কারণে আবার পুরো একটা দিন বন্ধ রাখতে হয়েছে ক্লাব। প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা খুঁজেছে পুলিশ, সূত্রের আশায়; আর অনন্তকাল ধরে যেন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেছে একেকজনকে।

ক্লাব আবার খোলার পর স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করছে ওরা। কিন্তু কোনভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। রোবট হয়ে গেছে যেন একেকজন। যান্ত্রিক চালচলন।

খাওয়াটা হচ্ছে এখন সবচেয়ে অস্বস্তির কাজ। ডিনারের পর যার যার মত শহরে চলে গেল। কেউ কারও কাছে সহজ হতে পারছে না। এড়িয়ে চলছে। ঘটনাটা নিয়ে কোন রকম আলোচনার মধ্যে যাচ্ছে না।

মাঝে মাঝেই লক্ষ করেছে জোসেফ, আড়চোখে তার দিকে তাকানো হচ্ছে। যেই সে তাকায়, অমনি চোখ সরিয়ে নেয়।

ওদের ভাবনাটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না তার।

ওরা সন্দেহ করছে, রীমা আর গেরিকে সে-ই খুন করেছে।

গেরির মৃত্যুর চারদিন পরের ঘটনা এটা। ডাইনিং রুমের টেবিলে বসে সবাইকে উৎসাহ দেয়ার চেষ্টা করল ব্র্যান্ডন। বলল, সমস্ত ঝামেলার অবসান হয়েছে। ছুটিটা এরপর ভালই কাটবে।

কেউ বিশ্বাস করল না তার কথা। জোসেফ অন্তত করল না।

রবি জিজ্ঞেস করল, দুজন তো কমে গেল; তাদের জায়গায় লোক নেয়া হবে কিনা।

ব্র্যান্ডন জানাল, চেষ্টা চলছে।

ও বলল, পুলিশ এখন ভাবছে রাতের বেলা বেড়া ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকে কেউ খুন দুটো করে গেছে।

কিন্তু মেনে নিতে পারল না জোসেফ। ওর স্থির বিশ্বাস, খুনী ওদের মধ্যেই কেউ।

এই টেবিলে বসা মানুষগুলোর মধ্যে কোন একজন।

কথাটা এই প্রথম মাথায় এল। আসার সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তিকর সম্ভাবনাটা ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিতে চাইল।

সে নিজে যে খুনী নয়, এটা তারচেয়ে ভাল আর কেউ জানে না; পুলিশ যতই সন্দেহ করুক।

তাহলে কে? টেবিলে বসা প্রতিটি মুখের ওপর দৃষ্টি ঘুরতে লাগল তার। ব্র্যান্ডন, রবি, সুজি, কিং, ডিউক, জেরি…এদের মধ্যে কোন একজন ভয়ঙ্কর খুনী। মারাত্মক বিপজ্জনক। ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে।

সুতরাং পালানো দরকার।

ওই মুখগুলোর কাছ থেকে দূরে। ক্লাব থেকে দূরে। লাইফগার্ডের চাকরি থেকে দূরে। সব কিছু থেকে দূরে।

রবির গাড়িটা আরেকবার ধার নিল সে। বলতেই চাবিটা দিয়ে দিল রবি। তবে তার আগে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জোসেফের মুখের দিকে, মোলায়েম গলায় বলল, 'সাবধানে থেকো।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে হাইওয়েতে বেরিয়ে এল জোসেফ। কোথায় যাবে? জানে না। কেয়ারও করে না।

গাড়ির সবগুলো জানালা নামিয়ে দিয়েছে। ক্রমাগত গরম বাতাস এসে ঝাপটা মারছে শরীরে। ভাপসা গরম। মুহূর্তে আঠা করে দেয় চামড়া। ভীষণ অস্বস্তিকর।

এটাকেও কেয়ার করল না এখন সে। বরং গরম বাতাস মুখে লাগাটাই যেন অনেক আরামের।

গ্যাস পেডালে পায়ের চাপ বাড়িয়ে দিল সে। মুহূর্তে ছোট্ট করোলাটার গতি তুলে দিল সত্তর মাইলে।

নির্জন হাইওয়ে। গাড়িঘোড়া প্রায় নেই। একটা মাত্র ট্রাক আর গোটা দুয়েক ভ্যানের পাশ কাটাল। রাস্তার দুই ধারে ছড়ানো চষা জমি। অস্তগামী সূর্যের আলোয় লাল।

গাড়ির ভেতর দিয়ে গর্জন করে প্রবাহিত হতে লাগল গরম বাতাস।

রেডিওর সুইচ অন করার জন্যে হাত বাড়াল। রিয়ারভিউ মিররে চোখ পড়তেই হাতটা থেমে গেল। একটা মুখ।

পেছনে বসে আছে।

আটাশ

চাকার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলে নিয়ন্ত্রণ হারাল গাড়িটা।

পেছনে একটা ট্রাকের রাগত হর্ন শোনা গেল।

ঘাসে ঢাকা এবড়ো-খেবড়ো মাটিতে গাড়ি নেমে যাওয়ার প্রচণ্ড ঝাঁকুনি, ছাতে মাথা ঠুকে গেল তার। থেমে গেছে যেন হৃৎপিণ্ডটা। ওই অবস্থাতেই স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে আবার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এল গাড়িটাকে। রাস্তার ওপর ফিরিয়ে আনল। থামিয়ে দিল।

'কিং!' রিয়ারভিউ মিররের দিকে তাকিয়ে ভাঙা, খসখসে গলায় চিৎকার করে উঠল সে, 'তুমি এ ভাবে চুরি করে এলে কেন!'

'সরি,' হাসিটা চওড়া হলো কিং-এর। 'তোমাকে ভয় দেখাতে চাইনি, বিশ্বাস করো।'

'ভয় তো ভয়, আরেকটু হলে খুনই করে ফেলেছিলে! আমাকে তো মারতেই, নিজেও মরতে!' আবার চিৎকার করে উঠল জোসেফ। 'কেন এসেছ?'

সীটের ওপর দিয়ে সামনে ঝুঁকল কিং। তার গরম নিঃশ্বাস লাগছে জোসেফের ঘাড়ে। ভীষণ বিরক্ত লাগল। সরে গেল ঝটকা দিয়ে।

স্টিয়ারিঙে দুই হাত রেখে নিজেকে শান্ত করতে চাইল। মাথা গরম করে গাড়ি চালালে দুর্ঘটনা ঘটতে বাধ্য। কিন্তু কোনমতেই রাগ কমাতে পারছে না। ইচ্ছে করছে ওর বেজিমার্কা মুখটায় ঘুষি মেরে থ্যাবড়া বানিয়ে দেয়। মুছে দেয় শয়তানি হাসি।

'আসতে ইচ্ছে করল,' জবাব দিল কিং। 'তা ছাড়া ভাবলাম আমি এলে তোমার মন ভাল লাগবে। হাসাহাসি করে মন ভাল করতে পারব।'

'মন আরও খারাপ করেছ!' চিৎকার করে উঠল জোসেফ। 'খুন করে খুশি করতে চেয়েছিলে, তাই না!'

'কি বলছ তুমি জোসেফ, শান্ত হও। আমি তোমার পক্ষে।'

‘আমার পক্ষে মানে?’

‘কে কি ভাবল তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না,’ জবাব দিল কিং। ‘আমি জানি, তুমি খুন করোনি।’ উঁচু স্বরে খলখল করে হাসল সে। বিরক্তিকর হাসি। শুনলেই পিত্তি জ্বলে যায়।

হাসি শুনেই মেরুদণ্ডের ভেতরে কেমন শিরশির করে উঠল জোসেফের।

‘এ রকম করেই হাসানোর চেষ্টা করছ নাকি আমাকে?’

হাসি তো দূরের কথা, ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে জোসেফের।

সীট ডিঙিয়ে এসে প্যাসেঞ্জার সীটে বসল কিং। ‘শোনো, আমাকে দেখে বিরক্ত হওয়ার কিছু নেই। আসলে কেন এসেছি, বলি। একা থাকতে ভাল লাগছিল না। যখন দেখলাম তুমি বেরোচ্ছ, একটা ফ্রি-রাইড নিয়ে নিলাম। তখন বললে হয়তো সঙ্গে নিতে না আমাকে। তাই চুরি করেই আসতে হলো। শহরে যাওয়ার জন্যে। চলো। দুজনে মিলে অনেক মজা করতে পারব।’

‘দেখো, কিং, আমার মনটা ভাল নেই…’

কিন্তু জোসেফকে কথা শেষ করতে দিল না কিং। খপ করে কব্জি চেপে ধরল। ‘আমি বলছি, আমি সঙ্গে গেলে তোমার ভাল লাগবে, দেখো।’

কব্জিতে চাপটা শক্ত হলো।

‘ছাড়ো!’ ঝাড়া দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল জোসেফ। এক ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল নিজের পাশের দরজা। তারপর ঘুরে এসে হ্যাঁচকা টানে খুলল পেছনের দরজা। কিঙের দিকে আঙুল নেড়ে বলল, ‘বেরোও!’

‘জোসেফ!’ অবাক হয়ে গেছে কিং। চোখ বড় বড় হয়ে যাওয়ায় সাদা অংশটা অনেক বেরিয়ে পড়েছে।

গরম বাতাসের ঝাপটা মেরে পাশ দিয়ে চলে গেল একটা বড় ট্রাক।

‘বেরোও!’ চিৎকার করে উঠল জোসেফ। ‘দেখো, শেষবারের মত সাবধান করছি। না বেরোলে ঘাড় ধরে বের করে এনে ট্রাকের নিচে ছুঁড়ে ফেলে দেব।’

‘জোসেফ, তুমি শুধু শুধু…’

ওর হাত চেপে ধরল জোসেফ। একটানে বের করে নিয়ে এল গাড়ি থেকে। ছুঁড়ে ফেলল ঘাসের ওপর।

চিত হয়ে পড়ল কিং। বিস্ময়ের ঘোরটা কাটতে উঠে বসল। চোখ লাল করে দাঁতে দাঁত চেপে হিসিয়ে উঠল, ‘কাজটা ভাল করলে না, জোসেফ! মস্ত ভুল করলে! এর জন্যে পস্তাতে হবে তোমাকে!’

ঊনত্রিশ

জোসেফের জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে রবির। মাঝরাত হতে আর দেরি নেই। এখনও আসছে না জোসেফ।

কিং-এরও খবর নেই। ডিউকের ধারণা, সে শহরে চলে গেছে। তবে

পেরোতে দেখেনি তাকে কেউ।

'অ্যাই রবি, অন্যমনস্ক কেন? বল ধরো,' জেরি বলল।

পানি থেকে হাত তোলার আগেই একটা রবারের বল তার মাথায় ড্রপ খেয়ে চলে গেল। হেসে উঠল সবাই।

দ্রুত সাঁতরে বলের কাছে চলে গেল রবি। পানির ওপর ভেসে থেকে ডুবে ডুবে যেন লুকোচুরি খেলছে ওটা। তুলে নিয়ে যতটা সম্ভব জোরে জেরির দিকে ছুঁড়ে মারল। হাসতে হাসতে সহজেই ধরে ফেলল জেরি।

'দেখি, এদিকে মারো!' চিৎকার করে বলল সুজি। নীল একটা বিকিনি পরেছে, দিনের বেলা যেটা কখনও পরে না। বেশ সুন্দরী লাগছে তাকে।

সুজির দিকে বলটা ছুঁড়ে মারল জেরি। ধরার জন্যে হাতও উঁচু করল সুজি। কিন্তু মাঝখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ল ডিউক। বলটা ধরে ফেলে হাসতে লাগল।

হাসাহাসি করছে সবাই। স্বাভাবিক মেজাজে ফিরে আসছে। দেখে ভাল লাগল রবির। গেরির মৃত্যুর পরের বিষণ্ন, গম্ভীর, ভারী পরিবেশ ভাল লাগছিল না তার।

এত রাতে পানিতে এসে নামার কারণ, সাংঘাতিক গরম। ঘরে থাকতে মনে হচ্ছিল গরম বাষ্পের মধ্যে রয়েছে।

ডিউক আর রবি কয়েক ঘণ্টা ধরে পোকার খেলেছে। এত গরম, বিছানায় যেতেই ভয় লাগছিল। শেষমেষ এসে তাই পানিতে নেমেছে। শরীর শীতল করার জন্যে। ওদের দেখাদেখি একে একে সুজি, ব্র্যান্ডন আর জেরিও নেমেছে।

দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে ওরা। ছেলেমানুষের মত চিত হয়ে ভেসে থাকার প্রতিযোগিতা করছে। বল ছুঁড়ে মারছে এদিক ওদিক।

এত রাত হয়ে গেল, জোসেফ ফিরে না আসাতে দুশ্চিন্তা বাড়তে লাগল রবির। পেটের মধ্যে থেকে থেকেই এক ধরনের অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছে।

ডাইভিং বোর্ডে গিয়ে উঠল রবি। অস্বস্তিটা দূর করার জন্যে, অন্যমনস্ক হওয়ার জন্যে ঝাঁপ দিতে যাবে, এই সময় গাড়ির শব্দ শোনা গেল। ফিরেছে অবশেষে জোসেফ।

গাড়ি থেকে নেমে গেস্ট হাউসের দিকে যাচ্ছিল, চিৎকার করে ডাক দিল রবি। 'জোসেফ, শুনে যাও।' ডাইভিং বোর্ড থেকে মাটিতে নেমে এল সে।

দ্বিধা করছে জোসেফ।

ডিউকও ডাক দিল, 'আরে এসো না।'

'কাপড় পরা তো,' জবাব দিল জোসেফ।

'তাতে কি?'

এগিয়ে গেল রবি। 'কি হয়েছিল?'

গাড়ির চাবির রিঙটা আঙুলে ঢুকিয়ে ঘোরাচ্ছে জোসেফ। 'কিং।'

'কিং মানে? কি হয়েছে ওর? কোথায়?' ঘাবড়ে গেছে রবি।

'আসছে। হেঁটে হেঁটে।' শুকনো গলায় জবাব দিল জোসেফ।

'বুঝলাম না!'

'চুরি করে পেছনের সীটে বসে আমার সঙ্গে চলে গিয়েছিল। পেছন থেকে

হঠাৎ এমন ভাবে চমকে দিল, আরেকটু হলে অ্যাক্সিডেন্ট করেই মরেছিলাম,' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল জোসেফ। 'এমন রাগ লাগল, রাস্তায় ঘাড় ধরে নামিয়ে দিয়েছি। হাতে-পায়ে ধরে কাউকে যদি রাজি করাতে পারে, লিফট পাবে; নয়তো হাঁটা ছাড়া গতি নেই। তবে চিন্তা নেই, চলে আসবে।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে রবি বলল, 'নাহ্, কিংকে নিয়ে আর পারা গেল না। এত বেশি ফাজিল!'

'জোসেফ, কাপড় বদলে এসো,' ডেকে বলল ডিউক। 'পানিতে এসে নামো। শরীর জুড়িয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, পানিটা সত্যি চমৎকার,' ব্র্যান্ডন বলল। 'চলে এসো।...আরে আরে, তোমরা আবার কি শুরু করলে!'

জেরি আর সুজি পানি ছিটাচ্ছে একে অন্যকে। তারপর হাঁসের মত ডুব মারল সুজি।

ব্যাপারটা আকর্ষণীয় মনে হলো জোসেফের। রবির দিকে তাকিয়ে বলল, 'চট করে কাপড়টা বদলে আসি আমি। যা গরমের গরম, বাপরে বাপ! চামড়া জ্বলে যাচ্ছে। পানিতে না নেমে ঠাণ্ডা হবে না।'

গেস্ট হাউসের দিকে চলে গেল জোসেফ।

চিন্তিত ভঙ্গিতে গেটের বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল রবি। কিং আসে কিনা দেখছে।

সাঁতার প্রতিযোগিতা শুরু করেছে ওদিকে ব্র্যান্ডন আর ডিউক। শরীরটা ডিউকের চেয়ে ব্র্যান্ডনের ছোট হলেও সাঁতারু হিসেবে অনেক ভাল।

ওদের সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্যে আবার পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রবি। কিন্তু সাঁতারে দুজনের কারও সঙ্গেই পারল না সে।

পানি থেকে উঠে ডাইভিং বোর্ডের দিকে এগিয়ে চলেছে সুজি আর জেরি। কি কথা নিয়ে যেন হাসাহাসি করছে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এসে হাজির হলো জোসেফ। কালো সুইম স্যুট পরে এসেছে। কোন রকম দ্বিধা না করে নেমে পড়ল পুলের গভীরতম অংশে।

ডুব দিয়ে ভেসে উঠতেই রবি জিজ্ঞেস করল, 'কেমন?'

'দারুণ!' জবাব দিল জোসেফ।

'এর চেয়ে ভাল আর হতে পারে না,' জোসেফের কথার প্রতিধ্বনি করল যেন ডিউক।

শরীরের ওপর চাপ না ফেলে আস্তে আস্তে সাঁতরে চলল জোসেফ। খুব ভাল সাঁতারু সে, জোসেফের সাঁতরানোর কায়দা দেখেই বুঝে ফেলল রবি।

ব্র্যান্ডন ডাকল রবিকে, 'কি, একবারেই শখ উধাও? আরেক দফা হয়ে যাক, এসো।'

ওর দিকে এগিয়ে গেল রবি।

পুলের কিনারে হাসাহাসি করছে সুজি আর জেরি। জেরিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল সুজি। আরও জোরে হেসে উঠল। ভুস করে মাথা তুলে থাবা দিয়ে সুজির পা ধরে ফেলল জেরি। মারল হ্যাঁচকা টান। সুজিও পানিতে পড়ে গেল।

দাপাদাপি, পানি ছিটানো, সেই সঙ্গে হাসাহাসি, চেঁচামেচি-চিৎকার চলল সমানে।
ওদের সঙ্গে যোগ দিল ডিউক, ব্র্যান্ডন আর রবি। জোসেফের দুশ্চিন্তাটা মাথা থেকে চলে যাওয়ায় আবার মন খুলে হাসতে পারছে রবি।
পুলের কিনারে পানি থেকে উঠতে যাচ্ছিল জেরি, পা ধরে টান মেরে আবার তাকে ফেলে দিল সুজি।
পানিতে পড়ার ঝপাং শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকারে চমকে গিয়ে ঘুরে তাকাল সবাই।
কে চিৎকার করছে বুঝতে বেশ খানিকটা সময় লাগল রবির।
চিৎকার করে গলা ফাটাচ্ছে জোসেফ। অদ্ভুত, কলজে-কাঁপানো সে-চিৎকার। তীক্ষ্ণ, চড়া, যেন ফাঁদে পড়া কোন জানোয়ারের চিৎকার।
সবার আগে জোসেফের কাছে পৌঁছে গেল ডিউক। বাকিরাও পৌঁছল। টেনে-হিঁচড়ে জোসেফকে নিয়ে গেল অগভীর অংশের দিকে।
'জোসেফ! জোসেফ!' ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে লাগল রবি। 'কি হয়েছে তোমার?'
কিন্তু চিৎকার করেই চলেছে জোসেফ। পাগল হয়ে গেছে যেন। বদ্ধ উন্মাদ। রবির কথা যেন কানেই ঢোকেনি।
'জোসেফ!' ওর কাঁধ ধরে আবার ঝাঁকি দিল রবি। 'এই জোসেফ, হয়েছে কি?'
থেমে গেল চিৎকার। কেঁপে উঠল থরথর করে। গুঙিয়ে উঠল, 'আমি জোসেফ নই!'
সবাই ঘিরে এসেছে তাকে।
'কি হলো ওর? কি বলছে?' জেরি জানতে চাইল।
'আমি জোসেফ নই!' আবার বলল সে।
'জোসেফ, বড় করে দম নাও,' ব্র্যান্ডন বলল। 'গরমে মাথা গরম হয়ে গেছে। ভালমত দম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে...'
'আমি জোসেফ নই!' চিৎকার থেমে গেছে। গোঙানিও। দ্রুত সামলে নিচ্ছে সে। 'আমার স্মৃতিশক্তি...ফিরে আসছে আবার...সুজি যখন জেরির পা ধরে টান মারল, তখন।'
জোরে জোরে শ্বাস টানছে জোসেফ। তালে তালে ওঠানামা করছে বুক।
'জোসেফ...' কোমল গলায় বলল ব্র্যান্ডন, 'জোসেফ, শোনো...'
'কিন্তু আমি জোসেফ নই! জোসেফ মরে গেছে!' উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থাটা কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তবে খুব দুর্বল বোধ করছে। সেটা মানসিক কারণেও হতে পারে।
অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল জেরির মুখ থেকে।
ভয় পেয়ে গেল রবি। জোসেফ পাগল হয়ে গেছে ভেবে।
'আমি জোসেফ নই। মুসা। মুসা আমান। এক বছর আগে জোসেফ উইনারকে আমিই খুন করেছিলাম।'
রবির দিকে তাকাল ব্র্যান্ডন। 'ঘরে নিয়ে যাও ওকে। শান্ত করার চেষ্টা করো। নাহলে ডাক্তার ডাকতে হবে।...আমি ঘরেই থাকব। দরকার মনে করলে ডেকো।'

ত্রিশ

গেস্ট হাউসের কমন রুমে মুসাকে প্রায় ধরে ধরে নিয়ে এল রবি আর ডিউক। দুজনেই খুব আন্তরিক ব্যবহার করছে ওর সঙ্গে। ওর কাঁধে বড় একটা তোয়ালে জড়িয়ে দিয়েছে রবি। দৌড়ে গিয়ে মুসার ঘর থেকে পাজামা আর ঢোলা শার্ট এনে দিল ডিউক।

অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে মুসার। উত্তেজিত, দ্বিধাগ্রস্ত, ভীত। একসঙ্গে এত কিছু!

তবে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেও। এই জন্যে যে সে এখন জানে সে কে। ও জোসেফ উইনার নয়। সেই মৃত লাইফগার্ড নয়।

আগের গ্রীষ্মে ঘটেছিল ঘটনাটা। আতঙ্কে ভরা এক গ্রীষ্ম, যার রেশ আজও কাটেনি।

এক বছর অনেক দীর্ঘ সময়। কিন্তু স্মৃতিতে এখনও জ্বলজ্বলে, স্পষ্ট সব কিছু, মনে হচ্ছে যেন কালকের ঘটনা।

চামড়ায় বাঁধানো গদিওয়ালা কাউচটাতে ওর সঙ্গে প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছে রবি আর ডিউক। রবি জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাও?'

'হ্যাঁ, বলব,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জবাব দিল মুসা। বললে মনের ভার পাতলা হবে ভেবেই রাজি হলো সে।

'গত বছর এখানে লাইফগার্ডের কাজ করে গেছ তুমি?' রবি জানতে চাইল। তার চোখ মুসার চোখে স্থির।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল মুসা। 'জোসেফ উইনারও লাইফগার্ড ছিল। লাইফগার্ড ডরমিটরিতে ও আমার রুমমেট ছিল। স্কুল থেকে[illegible]ন্ধুত্ব। ওদের বাড়িতে বহুবার গেছি আমি। আমার মতই নিগ্রো ছিল। ও এসেছিল ব্ল্যাকফরেস্ট থেকে। আমি রকি বীচ।'

পাজামার পকেটে হাত ঢোকাল সে। জোসেফ উইনারের চেহারাটা ভাসছে মনের পর্দায়। 'খাতির মোটামুটি খারাপ ছিল না ওর সঙ্গে আমার। এক বিকেলে ক্লাব খোলার পর অতি সাধারণ কথা নিয়ে ঝগড়া বেধে গেল আমাদের।'

'কি কথা?' কালো ভেজা চুলে আঙুল চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করল ডিউক।

'মনে পড়ছে না এখন। তবে খুব সাধারণ কোন ব্যাপার,' মুসা বলল। 'পুলের কিনারে দাঁড়িয়েছিলাম দুজনে। খানিক আগে যেখানটায় জেরিকে টান মেরে ফেলে দিয়েছিল সুজি। কথা কাটাকাটি করতে করতে হঠাৎ ওর কি হলো কে জানে, ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। বোকা হয়ে গেলাম। ও যে এমন করবে, কল্পনাই করিনি। কিছুদিন মাথায় খানিকটা গোলমাল হয়েছিল, সেরেও গিয়েছিল জানতাম, কিন্তু পুরোপুরি সারেনি সেদিন বুঝতে পারলাম।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল সে। স্মৃতিটা খুব উজ্জ্বল। সে-জন্যেই ভয়ঙ্কর। 'নীল একটা শার্ট পরা ছিল জোসেফের। ওকে সরানোর জন্যে ধাক্কা মারলাম। কোন ক্ষতি

করতে চাইনি, কেবল সরাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু…' পরের দৃশ্যটা মনে হতেই কেঁপে উঠল সে। কথা আটকে গেল।

'প্যানিতে পড়ে গিয়েছিল সে?' জানতে চাইল রবি।

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'শানের মধ্যে পড়ে গিয়ে মাথায় বাড়ি খেয়েছিল। ডুবে গিয়েছিল পানিতে।…কিন্তু ব্যাপারটা ছিল নিছক একটা দুর্ঘটনা। একেবারেই দুর্ঘটনা। ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা।'

শার্টের হাতা দিয়ে চোখ মুছল সে। নিঃশ্বাস ভারী হয়ে গেছে। বুকের মধ্যে বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ডটা।

'মরে গিয়েছিল?' জানতে চাইল ডিউক।

আবার মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'হ্যাঁ। পানিতে নেমে ওকে তুলে এনে ওর অবস্থা দেখে বোকা হয়ে গিয়েছিলাম। মাথা ফেটে গেছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। পুলের কিনারে শুইয়ে রেখে দৌড় দিলাম ডাক্তার ডাকতে।'

চোখের সামনে সব ঘোলাটে, অস্পষ্ট হয়ে আসছে জোসেফের–ঘর, আসবাবপত্র, দেয়ালে লাগানো ডাইভিং পোস্টার, সব।

'ফিরে এসে আগের জায়গায় পাওয়া গেল না ওকে,' বলল সে। 'আমি চলে যাওয়ার পর বোধহয় জ্ঞান ফিরেছিল। ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল আবার পানিতে। তোলার কেউ ছিল না। নিজে নিজেও উঠতে পারেনি। কিংবা আবার বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল। মোট কথা, বাঁচতে পারেনি সে আর।…তারপর বহুদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছে আমাকে,' মুসা বলল।

'থাক, মুসা,' রবি বলল, 'তোমার কষ্ট হলে বলার দরকার নেই।'

মাথা নাড়ল মুসা, 'না, বলতে দাও আমাকে। মনটা হালকা হোক।'

উঠে গিয়ে কোণের ওয়াটার কুলার থেকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি এনে দিল ওকে ডিউক। কৃতজ্ঞ হয়ে গেল মুসা। ঢকঢক করে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলল। তারপর আবার বলতে লাগল, 'মানসিক রোগের হাসপাতালে পাঠানো হলো আমাকে। কারণ…জোসেফের মৃত্যুর পর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার…অদ্ভুত এক রোগ, নিজেকে জোসেফ ভাবতে আরম্ভ করেছিলাম।'

বিস্ময় দেখা গেল রবি আর ডিউক দুজনের চোখেই। আবার দেয়ালের দিকে নজর ফেরাল মুসা। গড়গড় করে বেরিয়ে আসতে শুরু করল মনের কথাগুলো, 'আমি ভাবতাম আমিই জোসেফ। রোগটা হওয়ার কারণ, ডাক্তাররা বলেছেন, এত দুঃখ পেয়েছিলাম, এত অপরাধবোধে ভুগছিলাম, এতটাই বেশি, যে মগজ সে-চাপ সহ্য করতে পারেনি। কি জানি ঘটে গিয়েছিল মগজের মধ্যে, একদিন নিজের কাছে নিজে হয়ে গেলাম জোসেফ। জোসেফের ঘর থেকে তার অনেক কাপড়-চোপড় আর ব্যবহারের জিনিস নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে করে। পরতাম ওগুলো। ব্যবহার করতাম। ভাবতাম, ওগুলো বুঝি আমারই। তাতে আরও বেশি করে জোসেফ বনে গেলাম। এখন মনে পড়ছে, ওখান থেকেই জোগাড় করেছিলাম আই-ডি কার্ডটা। ঘষা খাওয়া ছবি, তা ছাড়া দুজনেই নিগ্রো বলে চেহারাটা আলাদা করতে পারোনি তোমরা। বুঝতে পারোনি ছবিটা আমার নয়।

'যাই হোক, কয়েক মাস ধরে হাসপাতালে পড়ে রইলাম। ঠিক কতদিন, মনে

করতে পারব না। সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলাম। আবার মুসা হতে শুরু করলাম–মাঝে মাঝে মুসা হতাম, আবার জোসেফ হয়ে যেতাম। মগজ থেকে আমার অপরাধবোধ সাফ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন ডাক্তাররা। বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, ওটা খুন নয়, দুর্ঘটনা। মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। এর জন্যে দুঃখ করে করে আমার সারাটা জীবন ধ্বংস করে দেয়ার কোন যুক্তি নেই।'

মাথা নিচু করে শুনছে রবি। ওর সদা হাসিখুশি মুখে বিষণ্নতার ছাপ। কাউচের হাতলে ধীরে ধীরে টোকা দিচ্ছে ডিউক। মুসার দিকে তাকাচ্ছে না সে-ও।

'যখন দেখল, আমি ভাল হয়ে যাচ্ছি, আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল হাসপাতাল থেকে,' বলল মুসা। 'প্রায় একটা বছর স্কুলে যেতে পারিনি। গত বছরের গ্রীষ্মের ছুটির পর সেই যে স্কুল ছেড়েছি, আর যাইনি। জোসেফ বনে থাকার ঘোরে কোনদিক দিয়ে যে উড়ে চলে গিয়েছিল সময়টা, টেরই পাইনি। বাড়ি ফিরতে পেরে খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু...'

ঢোক গিলল সে। বলার জন্যে অস্থির হয়ে উঠে মনে করেছিল বলাটা কতই না সহজ। কিন্তু বড় কঠিন। বার বার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

লম্বা দম নিল। 'হাসপাতালওলারা বেশি তাড়াতাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল আমাকে। আরও কিছুদিন আটকে রাখা উচিত ছিল, একশো ভাগ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত।...পালালাম। এক সকালে কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে।'

অবাক হলো ডিউক। 'তুমি যে এসেছ তোমার বাবা-মা জানেন না?'

মাথা নাড়ল মুসা। বাবা-মা'র চেহারাটা কল্পনা করল। উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় তাদের অবস্থা কি হয়েছে আন্দাজ করে দুঃখ পেল।

'চুরি করে বেরিয়ে পড়লাম,' বলল সে। পকেট থেকে হাত বের করে ফেলল। তালু ঘেমে গেছে। শার্টে মুছে নিয়ে হাত দুটো আড়াআড়ি রাখল বুকের ওপর 'আবার জোসেফ হয়ে গেলাম আমি। বাস ধরে সোজা চলে এলাম এখানে নিজেকে জোসেফ ভাবাতেই এখানে এসেছি।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'কেন ফিরেছি? নিজেই জানি না। হয়তো সুপ্ত, অবচেতন মন আমাকে তাগাদা দিচ্ছিল কোন কারণে, যেখানে জোসেফ খুন হয়েছে সেখানে ফিরে আসতে।'

মুসার কথা শেষ। কাউচে হেলান দিল সে। পানি ঠেকাতে পারছে না চোখের

ভারী স্তব্ধতা যেন চেপে বসল ঘরের মধ্যে। কেউ কথা বলছে না। কেউ নড়ছে না।

অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করল জোসেফ। মুসার দিকে ফিরল। ওর কালো চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অন্তর ভেদ করতে চাইছে মুসার। 'একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না,' দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে বলল ডিউক, 'বাকি দুজনকে খুন করলে কেন? গেরি আর রীমা?'

বরফ শীতল একটা শিহরণ বয়ে গেল যেন মুসার মেরুদণ্ড বেয়ে।

'কি বলছ! আমি খুন করব কেন?'

একত্রিশ

ডিউকের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মুসা। প্রশ্নটা প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়ে থামিয়ে দিয়েছে ওকে।

রবির চোখে বিস্ময়।

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে ডিউকের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল মুসা, 'না, আমি খুন করিনি ওদের! করলে মনে করতে পারছি না কেন?'

'তুমি নিজে কে, সেটাই তো মনে করতে পারো না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল ডিউক। 'হয়তো তুমিই ওদের খুন করেছ। তারপর স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে সব।'

'না! মনে করতে না পারলে কি হবে, আমি খুন করিনি!' কোমরে দুই হাত রেখে দাঁড়াল মুসা। 'কিন্তু তোমার কেন মনে হলো আমি ওদের খুন করেছি? কেন করব? কোন কারণ নেই...'

থেমে গেল কথা শেষ না করেই।

একটা কথা মনে পড়েছে।

ডিউকের সামনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে মুসা বলল, 'এক মিনিট, ডিউক। তুমি বলেছিলে সেই গ্রীষ্মে তুমি এখানে ছিলে। আমাকে চিনতে পেরেছিলে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু...' ঝিক করে উঠল ডিউকের কালো চোখ। গাল লাল হয়ে গেল।

'কেন তাহলে আমাকে মুসা বলে ডাকলে না? আমার নাম যখন জোসেফ বললাম, কেন কিছু বললে না?'

এমন করে দুই হাত তুলল ডিউক, যেন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে মুসাকে। 'আমি আসলে মনে করতে পারিনি।...সরি...সত্যি আমি দুঃখিত।'

'কিন্তু, ডিউক...' মুসা বলতে গেল।

'মুসা, দেখো, ওই গ্রীষ্মে সাংঘাতিক খারাপ অবস্থা গেছে কিছুদিন ক্লাবটাতে,' ডিউক বলল। 'সবে তখন এসেছি আমি। কয়েক দিন হয়েছে মাত্র ক্লাব খুলেছে। সবাই নতুন জায়গায় অভ্যস্ত হতে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ করেই একজন লাইফগার্ড মারা গেল, আরেকজনকে সরিয়ে নেয়া হলো। তোমাকে নিয়ে যেতে দেখেছি বটে আমি, কিন্তু নাম-পরিচয় কিছুই আর জানা হয়নি। তারপর তো কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলাম। জানার কথা আর মনেই এল না।'

ওর মুখের দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে মুসা।

উঠে দাঁড়াল রবি। 'ব্র্যান্ডনকে জানানো দরকার।' জানালা দিয়ে পুলের দিকে তাকাল। বাইরেটা শান্ত। 'সবাই বোধহয় ঘরে শুতে চলে গেছে। ব্র্যান্ডনকে জাগাতে হবে। ব্যাপারটা সিরিয়াস মনে হচ্ছে আমার। শেষে হয়তো বলবে আগে জানালে না কেন আমাকে।'

'বাড়িতে ফোন করতে হবে আমার,' মুসা বলল। 'অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর না। মাকে ফোন করে এক্ষুণি বলে দিতে হবে যে আমি ভাল আছি।'

'ব্র্যান্ডনের অফিসের ফোনটাই ব্যবহার করতে পারবে,' ডানের একটা দরজা দেখাল রবি। মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল। কাঁধে ফেলল তোয়ালেটা। 'তুমি ভাল হয়ে যাওয়াতে আমার খুব খুশি লাগছে, জোসেফ…মানে, মুসা!'

একই ভাবে বসে আছে ডিউক। মুসার দিকে তাকাল। 'আমি আসব?'

'আমাকে সাহায্য করতে?' মাথা নাড়ল মুসা, 'না, তোমার আর কষ্ট করে দরকার নেই। অনেক করেছ। অনেক ধন্যবাদ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল ডিউক। রবির সঙ্গে বেরিয়ে গেল। রবি যাবে ব্র্যান্ডনের সঙ্গে কথা বলতে।

মুসা চলল ব্র্যান্ডনের অফিসে, বাড়িতে ফোন করতে। এতটাই উত্তেজিত সে, ঠিকমত চিন্তা করতে পারছে না। সব যেন ধোঁয়াটে।

মাকে কি বলবে? কি ঘটেছে, কি করে বোঝাবে?

জানে, ওর কণ্ঠ শুনেই ম. কান্নায় ভেঙে পড়বে। প্রথমে কাঁদবে কিছুক্ষণ। তারপর বকাবকি করবে। তারপর লাইফগার্ডগিরি বাদ দিয়ে জলদি জলদি বাড়ি ফিরে যেতে বলবে। আর বাবার সঙ্গে কথা বলতেই ভয় লাগছে তার। কি জবাব দেবে?

মা আর বাবা নিশ্চয় ভেবে বসে আছে কোথাও মরে পড়ে আছে সে। ভাবতেই বুকের মধ্যে আবার কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল তার। একটা নোট পর্যন্ত রেখে আসেনি। কোথায় যাচ্ছে, কোন হদিসই রাখেনি।

ইস্, কি কষ্টটাই না দিয়েছে!

ভীষণ অন্যায় করেছে!

ব্র্যান্ডনের অফিসে ঢুকতে বুকের কাঁপুনি আরও বেড়ে গেল। সুইচ টিপে ছাতের আলোটা জ্বেলে দিল। ডেস্কের সামনে গিয়ে হাত বাড়াল ফোনের দিকে।

রিসিভার তোলার আগেই পদশব্দ কানে এল। ফিরে তাকিয়ে দেখল, দরজায় ডিউক দাঁড়িয়ে আছে।

'মুসা, তুমি ঠিক আছ তো?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ভাবলাম, মনের যা অবস্থা তোমার কিছু যদি হয়ে যায়। দেখতে এলাম।'

'থ্যাংকস,' জোর করে মুখে হাসি ফোটাল মুসা। 'না, আমি ঠিকই আছি। স্মৃতি ফিরে আসার পর এখন অনেক ভাল। ভয়টা বরং এখন মাকে কি করে বোঝাব…'

কথা শেষ হওয়ার আগেই ফোন বেজে উঠল।

আচমকা শব্দ চমকে দিল মুসাকে।

ঘরে ঢুকল ডিউক। 'এত রাতে কে?'

রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল মুসা। মহিলা কণ্ঠে প্রশ্ন হলো, 'এটা কি নর্থ বীচ কাউন্টি ক্লাব?' মানসিক অবস্থা ভাল না মহিলার কথা শুনেই বোঝা গেল।

ব্র্যান্ডনের স্পীকার ফোনটা অন করা। তাতে মুসা আর ডিউক দুজনেই শুনতে পেল মহিলার কথা।

'হ্যাঁ, বলুন?' জবাব দিল মুসা।

'আমি মিসেস হ্যানসন,' মহিলা বলল। 'আরও আগে জানাতে পারিনি

আপনাদের. সরি। আপনারা নিশ্চয় ভেবে অবাক হচ্ছেন. এখনও কেন ডিউক কাজে যোগ দিতে গেল না।'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে মুসা, 'মানে?'

মহিলার কম্পিত কণ্ঠ ভেসে আসছে খুদে স্পীকারে. 'যাবার মত অবস্থা নেই তার।'

'বুঝলাম না! আপনি বলছেন ডিউক আসছে না...'

'আর কোনদিন যেতে পারবেও না সে। ও খুন হয়েছে!' ফুঁপিয়ে উঠলেন মিসেস হ্যানসন। 'ক্লাবে যেদিন যাবার কথা, তার আগের দিন। আরও আগেই জানানো উচিত ছিল আমার, আপনারা নিশ্চয় খুব ঝামেলায় পড়েছেন। কিন্তু আমার উপায় ছিল না। সুযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাই ফোন করলাম...একটুও দেরি করিনি...'

দীর্ঘ নীরবতা। মহিলার ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসছে মুসার। নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

অবশেষে আবার বলল, 'ডাক্তাররা আমাকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। সময় কিভাবে গেছে জানতাম না আমি। দিন না রাত, বুঝতে দেয়া হয়নি।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে,' গলা কাঁপছে মুসার। 'আমি বুঝতে পেরেছি...'

'দেখুন, আমি সত্যি দুঃখিত,' কাঁদতে শুরু করল মহিলা। 'ডিউক...আমার এত ভাল ছেলেটা মরে গেল...কত আশা ছিল ভাল লাইফগার্ড হবে...কিন্তু...'

কান্নার চোটে কথাই বলতে পারল না আর মহিলা। কেটে গেল লাইন।

ফোনের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। হতবাক। মাথায় কিছু ঢুকতে চাইছে না। দরজার দিকে তাকাল ডিউকের সঙ্গে কথা বলার জন্যে।

কিন্তু ডিউক নেই।

দৌড়ে এসে হলে ঢুকল মুসা. 'ডিউক!'

পদশব্দ কানে এল। দৌড়াচ্ছে। হলের শেষ মাথায় ছায়ার মত ছুটে হারিয়ে যেতে দেখল কাউকে।

'ডিউক?'

পেছনে দৌড় দিল মুসা। মহিলার বুকভাঙা কান্না কানে বাজছে।

কেন বলল ডিউক মারা গেছে?

শেষ মাথায় চলে এল মুসা। হাঁপাচ্ছে। ছায়াটা যেদিকে গেছে সেদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না।

কাঁচের দরজাটা দিয়ে পুলের দিকে বেরোনো যায়। সেদিকেই গেল নাকি?

দরজা খুলে বাইরে বেরোল সে। গরম, নিথর রাত। শূন্য পুল। সাদা ফ্লাডলাইটের আলোর নিচে পানি চিকমিক করছে। কেউ নেই। লাইফগার্ডেরা যারা ছিল কিছুক্ষণ আগে, সবাই ঘুমাতে গেছে।

'ডিউক?' ডাক দিল মুসা। কিন্তু ভালমত স্বর বেরোল না। তার কণ্ঠ থেকে বেরোনো কোলাব্যাঙের ডাকের মত ঘড়ঘড়ে শব্দটা কঠিন চত্বরে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে দিল যেন নীরব রাত্রিতে।

পুলের দিকে এগিয়ে গেল। কয়েকটা অনিশ্চিত পদক্ষেপ। খুঁজে বেড়াচ্ছে

ডিউককে। চোখ কুঁচকে রেখেছে তীব্র আলো থেকে বাঁচানোর জন্যে।

লাফ দিয়ে এসে সামনে পড়ল ছায়াটা। পথরোধ করে দাঁড়াল। কালো চোখের তারা যেন জ্বলছে। কঠিন মুখভঙ্গি। চোয়াল খুলছে আর বন্ধ করছে।

'ডিউক, ওই মহিলা কি বলল?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'কেন বলল ডিউক মারা গেছে?'

'এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না,' কর্কশ গলায় জবাব দিল ডিউক। 'লাইফগার্ড হওয়াটা খুব জরুরী ছিল আমার জন্যে। ও মরেছে বলেই আমি লাইফগার্ড হতে পেরেছি।'

এক পা এগিয়ে এল ডিউক। ওর গায়ের ছায়া পড়ল মুসার গায়ে। 'এখন তোমাকেও মরতে হবে, মুসা।'

বত্রিশ

তারপরেও যেন মাথায় ঢুকতে চাইল না মুসার। বিশ্বাস করতে পারল না। ভয়ের চেয়ে বেশি হলো রাগ। চিৎকার করে উঠল, 'তুমি আমাকে খুন করতে চাও!'

ডিউকের কালো চোখ জোড়া তার ওপর স্থির। পাতাও ফেলছে না। কথা বলল যখন, খুব শান্ত শোনাল। 'তোমাকে খুন করা ছাড়া উপায় নেই, মুসা। তুমি অনেক বেশি জেনে ফেলেছ। তোমাকে মারার ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই।'

'তুমি...তুমি গেরি আর রীমাকে খুন করেছ?' পিছাতে গিয়ে ডেক চেয়ারের ওপর পড়ে গেল মুসা। ভয় পাচ্ছে না। ডিউকের হাতে ছুরি বা পিস্তল নেই। যত শক্তিশালীই হোক, খালি হাতে ওকে খুন করার সাধ্য ডিউকের হবে না। তবে ভয় পাওয়ার ভান করতে হবে। সমস্ত কথা বের করতে হবে।

মাথা ঝাঁকাল ডিউক। 'হ্যাঁ, করেছি। এখন এ কথাটাও জেনে গেলে। তোমাকে না সরিয়ে দিয়ে কি করব বলো? খুব শীঘ্রি তোমার স্মৃতিশক্তি পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাবে। তখন আমি কে সেটাও মনে পড়ে যাবে তোমার।'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই ডিউক আসলে কে মনে পড়ে গেল মুসার।

যেন একটা ভারী পর্দা সরে গেল চোখের সামনে থেকে। আঁধার কেটে গেল।

'তুমি ডিউক নও,' বিড়বিড় করে বলল মুসা। 'তুমি টুকি।'

ঠিক। টুকিই। আপনমনে মাথা দোলাল মুসা। মনে পড়ে গেছে।

ওর নাম ছিল আসলে টুয়ার্ক হবসন। খানিকটা তাচ্ছিল্য করেই লাইফগার্ডরা ডাকত টুকি।

'গত বছরও তুমি এসেছিলে এখানে,' টুকির দিকে হাত তুলে বলল মুসা। মনে পড়ে যাচ্ছে। সব পরিষ্কার মনে পড়ে যাচ্ছে। 'চাকরি করতে এসেছিলে। তবে লাইফগার্ড না।'

তিক্ত হাসি ফুটল টুকির ঠোঁটে। 'মনে তাহলে পড়েই গেল। আমি আসার

আগের বছর, মানে দুই বছর আগের গ্রীষ্মে রান্নাঘরে ঠিক এই কাজটাই করেছে রিচি। আমার বন্ধু ছিল। দুনিয়ায় একমাত্র বন্ধু। জানের জান দোস্ত। লাইফগার্ড হওয়ার জন্যে পাগল ছিল!' হাসির সঙ্গে রাগ মিশে গিয়ে দাঁত অর্ধেক বেরিয়ে পড়ল ওর। ভয়ঙ্কর লাগল তাতে। 'কিন্তু হতে হলো রান্নাঘরের বয়-বেয়ারা।

'যাদের খুন করেছি–রীমা আর গেরি, দুই বছর আগে কি শয়তানিটাই না করেছে রিচির সঙ্গে? সেই বছরও ওরা এখানে লাইফগার্ড ছিল।' রাগে গলা চড়ে যাচ্ছে টুকির। 'কি যে অপমান করত রিচিকে? অপদস্থ করত। রিচি আমাকে সব বলেছে।

'লাইফগার্ডের কাজ পাইয়ে দেয়ার লোভ দেখিয়ে তাকে নিয়ে মজা করত ওরা! নিরীহ, গোবেচারা, ভালমানুষটাকে কষ্ট দিত!' রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে যাবে যেন টুকির। 'বলত, লাইফগার্ড হতে হলে প্রচুর প্র্যাকটিস দরকার। গেরি আর রীমা রাতে ওকে পুলে নিয়ে গিয়ে প্র্যাকটিসের নামে পঞ্চাশবার, একশোবার ডুব দেয়াত। পানির নিচে ডুব দিয়ে থেকে দশ-পনেরো মিনিট দম আটকে রাখার নির্দেশ দিত–যা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়; পুলের পানির নিচে ডুবে থেকে থেকে ফুসফুস ফেটে যাওয়ার জোগাড় হত তার, মাথায় রক্ত চাপ দিয়ে শিরা ফাটিয়ে দেয়ার জোগাড় করত, তা-ও লাইফগার্ড হওয়ার আশায় মাথা তুলতে চাইত না সে। তারপর যখন আধমরা হয়ে উঠে আসত, হাসাহাসি করত ওরা। ওদের সঙ্গে যোগ দিত তোমার রুমমেট জোসেফ। সে-ও এসেছিল দুই বছর আগে।'

মানতে বাধ্য হলো মুসা, সত্যি অত্যাচার করেছে ওরা।

'পুরো ব্যাপারটা কি ছিল তাহলে?' ভুরু নাচাল টুকি। 'রসিকতা! নিষ্ঠুর রসিকতা! ওদের কথামত সব করার পর আরও হাসাহাসি করতে লাগল ওরা, হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল–রিচি একটা বোকা ছাগল। লাইফগার্ডের কাজটাজ কিচ্ছু না, বোকা পেয়ে তাকে নিয়ে মজা করেছে ওরা। রিচির মুখে এ সব শুনতে শুনতে মাথায় আগুন ধরে যেত আমার। ভাবতাম, সুযোগ পেলে অবশ্যই প্রতিশোধ নেব আমি। তাই সুযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জোসেফকে সরিয়ে দিয়েছি দুনিয়া থেকে। নরকে গিয়ে যত পারে শয়তানি করুক এখন।'

হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা। 'জোসেফ! কি বলছ? ওকে তো আমি···দুর্ঘটনা ছিল ওটা।'

'তোমার ধাক্কা দেয়াটা দুর্ঘটনা ছিল,' টুকি বলল। 'কিন্তু পানিতে পড়ে ও মারা যায়নি। পুরো ঘটনাটা আমি দেখেছি। তুমি ডাক্তার ডেকে আনতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে আমি ঠেলে পানিতে ফেলে দিয়েছিলাম ওকে। দিয়েই সরে গেছি। তখনও বেহুঁশ ছিল বলে আর উঠতে পারেনি।'

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল মুসার। তাহলে খুনটা সে করেনি, দুর্ঘটনাক্রমেও নয়।

বলার নেশায় পেয়েছে যেন টুকিকে, বলেই চলেছে, 'যাই হোক, গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হলে বাড়ি ফিরে গিয়ে অপমানের জ্বালায় দগ্ধ হতে থাকল রিচি। তারপর একদিন গাড়ির নিচে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করল···'

'তাই নাকি!' আফসোস করে বলল মুসা, 'ওর জন্যে সত্যি আমার কষ্ট লাগছে। আমি সত্যি দুঃখিত।'

'তোমার দুঃখ পাওয়ার আসলে কিছু নেই। তুমি তো আর খারাপ ব্যবহার করোনি আমাদের সঙ্গে,' টুকি বলল। 'যাই হোক, রিচি যেদিন মারা গেল, সেদিন আবারও প্রতিজ্ঞা করলাম, ওর খুনের প্রতিশোধ আমি নেব। যারা যারা দায়ী, তাদের কাউকে ছাড়ব না। ঠাণ্ডা মাথায় প্ল্যান করলাম। গত বছর এসে আর কোন কাজ না পেয়ে রান্নাঘরেই চাকরি নিলাম। জোসেফকে শেষ করলাম। বাকি দুজন আসেনি, তাই ছুটির শেষে কিছুটা মন খারাপ করেই বাড়ি ফিরলাম। তবে নিরাশ হলাম না। জানতাম, সে-বছর আসেনি, এ বছর আসবে, কিংবা তার পরের বছর; যখনই আসুক, খাঁড়া নিয়ে হাজির হব আমি।

'এ বছর আসার সীজন শুরু হওয়ার আগে খোঁজ নিয়ে জানলাম, গেরি আর রীমা আসছে। আমিও আসতে চাইলাম। কিন্তু কোন জায়গা খালি নেই, কাজ পেলাম না। চাকরি ছাড়া এখানে এসে দুজনকে শেষ করার সুযোগ পাব না। ভাবতে ভাবতে ডিউকের কথা মনে পড়ে গেল। গত বছর সে-ও আমার সঙ্গে কম দুর্ব্যবহার করেনি, ওর মা তাকে যত ভাল ছেলেই বলুক। মনে মনে খেপেই ছিলাম ওর ওপর। যখন জানলাম, সে-ও আসবে, ঠিক করে ফেললাম কি করব। ডিউককে খুন করে তার ছদ্মবেশে এসে হাজির হলাম। প্রতিশোধও নেয়া হলো, তার জায়গায় লাইফগার্ড হিসেবে ঢুকে পড়ারও সুযোগ পেলাম। ব্র্যান্ডন নতুন বলে কিছু বুঝতে পারল না। তুমিও পাগল। চিনতে পারলে না। পার পেয়ে গেলাম আমি। সুযোগমত খুন করলাম রীমা আর গেরিকে।'

চুপ করে রইল মুসা। কথা খুঁজে পেল না।

'আমাকে পাগল ভাবছ তো? উন্মাদ খুনী? ভাবো,' মাথা নাড়ল টুকি, 'আমার তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। আমার কাজ আমি করেছি। রিচির আত্মা শান্তি পাবে।'

'কিন্তু, টুকি...'

'এবার তোমার পালা, মুসা,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলল টুকি। 'কোন দোষ করোনি, তা-ও তোমাকে মরতে হবে। এটা তোমার দুর্ভাগ্য।' এক মুহূর্ত থামল টুকি। তারপর বলল, 'আসার পর তোমাকে দেখে খুশি হয়েছিলাম আরও একটা কারণে। কেন জানো? খুনগুলো করব আমি, আগের বারের মতই দোষটা পড়বে তোমার ঘাড়ে। আমি পার পেয়ে যাব। একবার খুন করেছ, তারপর পাগল হয়েছ; পাগলা খুনীকে দিয়ে সব সম্ভব–আরও খুন সম্ভব, পুলিশ তা-ই ভাবত। কিন্তু সব ভজঘট হয়ে গেল তোমার স্মৃতি ফিরে আসাতে। আমার কাজটা জটিল হয়ে গেল।' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল টুকি, 'এখন তোমাকে খুন করার পর হয়তো অত সহজে আর রেহাই পাব না, বাঁচতে পারব না। যা হয় হোক, আর আমি কেয়ার করি না।'

এগিয়ে এল টুকি।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা।

পুলের পাড়ে চলে এসেছে দুজনে। মুসার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল টুকি, সেই সেদিনের মত, জোসেফ যেভাবে পড়েছিল। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। সেদিনের মত টুকিও যদি পানিতে পড়ে মাথায় বাড়ি খেয়ে মরে, এই ভয়ে তাকে ধাক্কা মারারও

সাহস হলো না মুসার। কেবল আত্মরক্ষা করতে লাগল।

দুই হাতে ঠেকাতে ঠেকাতে মরিয়া হয়ে গেস্ট হাউসের দিকে তাকাতে লাগল মুসা। রবি আর ব্র্যান্ডন কই? বেরোচ্ছে না কেন এখনও?

ধাক্কা দিয়ে মুসাকেই পানিতে ফেলে দিল টুকি। তারপর সে নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে। মুসার মাথা চেপে ধরে ডুবিয়ে রাখতে চাইল পানিতে।

কিন্তু অত সহজ হলো না কাজটা। শক্তি মুসার গায়েও কম নেই। কিন্তু হাত কথা শুনছে না তার। জোসেফের অ্যাক্সিডেন্টের পর ফোবিয়া হয়ে গেছে তার। কোন অবস্থাতেই পাল্টা আঘাত হানতে পারছে না। যদি মরে যায় টুকি?

সে খুনী নয়, এই কথাটা জানার পর মানসিকভাবে আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে সে।

টুকির হাত থেকে বাঁচার জন্যে মরিয়া হয়ে পানিতে ডুব দিয়ে ডিগবাজি খেল সে। ডুব সাঁতার দিয়ে সরে গেল কয়েক গজ। ভেসে উঠে ফিরে তাকানোরও প্রয়োজন বোধ করল না। সাঁতরাতে শুরু করল উল্টো দিকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই উন্মাদটার কাছ থেকে সরে যাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল।

কিন্তু পিছু ছাড়ল না টুকি। আহত জানোয়ারের মত চিৎকার করে পিছু নিল মুসার। খুব ভাল সাঁতরায়। কিন্তু মুসার সঙ্গে পারা তার কর্ম নয়। টুকি ধরতে পারল না ওকে কিছুতেই।

পুলের উল্টো ধারে চলে এসেছে মুসা। আর কয়েক গজ পরেই তীর। ওপরে উঠে পড়তে পারলে আর তাকে ধরার সাধ্য হবে না টুকির।

তবে খুব বেশি কষ্ট করতে হলো না আর। মাথা তুলতেই চোখে পড়ল দৌড়ে আসছে রবি আর ব্র্যান্ডন।

'ও ডিউক নয়,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা। 'ওর নাম টুয়ার্ক হবসন। আগের বছর গ্রীষ্মে রান্নাঘরে কাজ নিয়েছিল। লাইফগার্ডেরা তাচ্ছিল্য করে ওকে টুকি বলে ডাকত। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে গত বছর জোসেফকে খুন করেছে ও, এ বছর করেছে গেরি, রীমা আর ডিউককে। জিজ্ঞেস করে দেখো।'

কিন্তু কারও দিকে নজর নেই টুকির। ওকে শক্ত করে ধরে রেখেছে রবি আর ব্র্যান্ডন। ছাড়া পাওয়ারও চেষ্টা করছে না সে। শরীর ঢিল করে দিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে হা-হা করে হেসে উঠল। চিৎকার করে বলল, 'রিচি, তোমার খুনের প্রতিশোধ আমি নিয়েছি। জোসেফ, গেরি, রীমা, ডিউক–একটাকেও ছাড়িনি। সব কটাকে জাহান্নামে পাঠিয়েছি। এবার তুমি খুশি তো, বন্ধু আমার! তোমার আত্মা শান্তি পাচ্ছে তো? তোমার মন শান্ত হয়েছে?' আবার হা-হা করে হেসে উঠল টুকি।

এরপর থেমে থেমে চিৎকার আর অট্টহাসি চলতেই থাকল তার।

দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না আর মুসা। পরিশ্রম, সেই সঙ্গে ভয়াবহ মানসিক চাপ কাহিল করে দিয়েছে ওকে। বসে পড়ল শান বাঁধানো চত্বরে। শেষে চিত হয়ে শুয়েই পড়ল।

হই-চই, হট্টগোল। চোখ বুজে রেখেছিল মুসা। টের পেল কে যেন পাশে এসে বসেছে। চোখ খুলে দেখে, জেরি। মুসাকে চোখ মেলতে দেখে ওর একটা

হাত চেপে ধরল, 'মুসা, আমি দুঃখিত। আমাকে মাপ করে দাও, ভাই।'

বুঝতে পারল না মুসা। 'কি করেছ? কি মাপ করব?'

'আমি বুঝে গিয়েছিলাম, তুমি ভূতের ভয় পাও। আরও বেশি ভয় দেখানোর জন্যে রাতের বেলা ফিসফিস করে ডেকে তোমাকে ঘর থেকে বের করে এনেছিলাম। যাতে পরদিন তুমি সবাইকে বলতে পারো, হলঘরে সত্যি সত্যি ভূত আছে।'

'ও, ফিসফিসানিটা তাহলে তোমার কাজ!'

'হ্যাঁ, প্রথম দিন আমিই বের করেছি তোমাকে। তারপর কেটে পড়েছি। কল্পনাই করিনি, তুমি গিয়ে পড়বে রীমার লাশের কাছে,' জেরি বলল। 'রীমা খুন হয়ে যাওয়ার পর ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ভয়ে ভয়ে ছিলাম খুব। যদি কোনভাবে জানাজানি হয়ে যায় ফিসফিসানিটা আমার কাজ, পুলিশের সন্দেহ পড়ত আমার ওপর।'

'তারপরেও গেরি যেদিন খুন হয়েছে, আবার ওরকম করে ডাকলে কেন?'

'সেদিন আর আমি ডাকিনি। ডিউক, মানে টুকিকে দেখেছি দরজার সামনে। ওকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হলো। সরে গেলাম। দেখি, ও ডাকতে শুরু করেছে। তারমানে আমাকে প্রথম দিন ডাকতে দেখেছিল সে। তুমি যে ঘর থেকে বেরিয়েছিলে, তা-ও দেখেছিল। দ্বিতীয় দিন তাই কায়দাটা ধরল। বুঝে গিয়েছিল, ভাল চালাকি। ডেকে ডেকে তোমাকে সেদিনও টেনে নিয়ে গিয়েছিল লাশের কাছে। তোমাকে দিয়ে লাশটা আবিষ্কার করিয়েছিল, যাতে সবার সন্দেহ তোমার ওপর পড়ে।'

'দেখেও তাহলে বললে না কেন?'

'ওই যে, ভয়,' লজ্জিত কণ্ঠে বলল জেরি। 'ডাকার শয়তানিটা তো আমিই শুরু করেছিলাম। বলতে গেলে যদি আমিও সন্দেহের তালিকায় পড়ে যাই...আমাকে মাপ করে দাও, মুসা। আমার শয়তানির জন্যে অনেক ভোগান্তি হয়েছে তোমার।'

আবার চোখ বুজল মুসা। তারপর খুলল। বলল, 'যা করেছ, করেছ। পুলিশ জিজ্ঞেস করলে এবার সত্যি কথাগুলো বলে দিয়ো, তাহলেই হবে। টুকির বিরুদ্ধে যাবে তোমার সাক্ষী।'

মুসার হাত ধরে টান দিল জেরি। 'চলো, ওঠো, ঘরে যাবে। নিয়ে যাই তোমাকে। বারো ঘণ্টার একটা টানা ঘুম দরকার তোমার।'

হঠাৎ কি মনে হতে ঝটকা দিয়ে উঠে বসল মুসা। 'খাইছে! আসল কাজটাই তো করা হয়নি!'

মুসাকে ওভাবে উঠে বসতে দেখে চমকে গিয়েছিল জেরি। কাজের কথা শুনে জিজ্ঞেস করল, 'কি কাজ?'

'মা'কে ফোন করা!'

'ও। চলো, তোমার সঙ্গে যাব। তোমার যা অবস্থা, একা যেতে কষ্ট হবে।'

'চলো।'

উঠে দাঁড়াল মুসা।

***
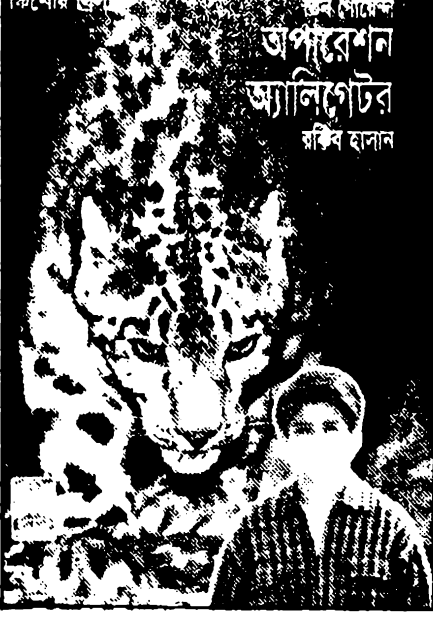
অপারেশন অ্যালিগেটর

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

'ওই যে, মুসার দোস্ত,' হেসে বলল রবিন।

'হাতি আবার মুসার দোস্ত হলো কবে?' বুঝতে পারল না কিশোর।

'অমিলটা দেখলে কোথায়? রঙেও মিল। খাওয়ায়ও।'

হেসে ফেলল কিশোর। রকি বীচ চিড়িয়াখানার রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পাঁচ টন ওজনের হাতিটাকে দেখছে। এ মুহূর্তে খাচ্ছে না হাতিটা। নখের পরিচর্যা চলছে ওর। একজন জু কীপারের নির্দেশে নিতান্ত বাধ্য ছেলের মত সামনের একখানা গোদা পা তুলে ধরেছে। উখা দিয়ে ঘষে ঘষে নখ সমান করে দিচ্ছে জু কীপার। হাতিটার কাছেই রয়েছে তিন গোয়েন্দা।

'শুনে ফেলেছি কিন্তু,' খানিক দূরে হাতির একেবার শুঁড়ের কাছে দাঁড়ানো মুসা ডেকে বলল। একটা টি-শার্ট গায়ে দিয়েছে যেটার বুকের কাছে লেখা জু ইনটার্ন। প্রতি গ্রীষ্মেই উৎসাহী কিছু ছাত্রকে ভলান্টিয়ার নিয়োগ করে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। তাতে চিড়িয়াখানারও প্রয়োজন মেটে, ছাত্ররাও জন্তু-জানোয়ার সম্পর্কে মূল্যবান জ্ঞান আহরণ করে। এবারের গ্রীষ্মে মুসাও ভলান্টিয়ার হয়েছে।

'নখে নেল পলিশও লাগাবে নাকি?' হাসতে হাসতে বলল রবিন।

'মাঝেসাঝে লাগায় না তা নয়,' জবাব দিল কিশোর। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে বিশাল প্রাণীটাকে। যতবার এই খসখসে, বাদামী চামড়া, কুলার মত কান আর অদ্ভুত শুঁড়ওয়ালা প্রাণীগুলোকে দেখে ততবারই অবাক হয়। কত বড় জীব। আর কি অদ্ভুত!

রূপ চর্চা শেষ হলো। মাটিতে শুঁড় নামিয়ে দিল হাতি।

'সরে যাও!' চিৎকার করে মুসাকে সাবধান করে দিয়ে সরে গেল কীপার। কিন্তু মুসা সরার আগেই একগাদা ধুলোবালি শুঁড় দিয়ে মাটি থেকে টেনে নিয়ে ফোয়ারার মত নিজের গায়ে ছিটিয়ে দিল হাতিটা।

'খাইছে!' কোঁকড়া তারের জালের মত চুল থেকে ধুলো ঝাড়তে শুরু করল মুসা।

হো-হো করে হেসে উঠল রবিন। কিশোরও হাসছে। মুসাকে নিয়ে গোলাবাড়ির মত বিরাট এক ছাউনিতে ঢুকে গেল কীপার। খানিক পরেই সাফ-সুতরো হয়ে এসে দুই বন্ধুর সঙ্গে রেলিঙের কাছে দাঁড়াল মুসা। হাতে বড় এক প্যাকেট পপ-কর্ন।

'তোমার দোস্তকে ভাগ দিলে না?' রবিনের মুখে মিটিমিটি হাসি।

'দেখো,' গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করল মুসা, 'হাতিকে নিয়ে হাসাহাসি কোরো না। জঙ্গলের আসল রাজা ওই হাতি। পশুর রাজা যাকে বলা হয়, ওই সিংহ, হাতির কাছে

কিছু না। হাতি মাড়িয়ে গেলেই ভর্তা হয়ে যাবে সিংহ।'

'অত কাছে যে যাও,' হাতিটাকে দেখাল রবিন, 'তোমার গায়ে যদি পা তুলে দেয়?'

'দেবে না। গিনি আমার বন্ধু,' স্নেহের দৃষ্টিতে হাতিটার দিকে তাকাল মুসা। 'সারা চিড়িয়াখানায় ওকেই আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ। চলো, বাঘের এলাকায়। একটা তুষার চিতা এসেছে।'

আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল মুসা। চওড়া, খোয়া বিছানো রাস্তাটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে পার্কের ভেতর দিয়ে। দেখতে দেখতে চলেছে কিশোর। চমৎকার নকশা করা হয়েছে নতুন এই চিড়িয়াখানার। ঝোপঝাড়, গাছপালায় ছাওয়া। প্রায় আসল বনের মতই লাগে দেখতে।

'চিড়িয়াখানায় আসার দিন বটে আজ,' দুই হাত টান টান করে ছড়িয়ে দিল রবিন। আকাশের দিকে চোখ। গাঢ় নীল রঙ। ঝলমলে রোদ।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। দিন ভাল বলে দর্শকও হয়েছে প্রচুর। ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই।

'চিড়িয়াখানা আমেরিকানদের ভীষণ পছন্দ,' মুখের মধ্যে একটা পপ-কর্ন ছুঁড়ে দিল মুসা।

'হুঁ,' রবিনও একমত।

চিড়িয়াখানার অন্য একটা অংশে চলে এল ওরা। কাদায় ভরা। ঘাসে ছাওয়া। দলে-মুচড়ে ভেঙে আছে ঘাসের ডগা। ডোবার মধ্যেও কাদা।

আবার রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ওরা।

'আফ্রিকান জলাভূমি তৈরি করা হয়েছে এখানে,' মুসা বলল। 'যতটা সম্ভব প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি করে দেয়া হয়েছে জন্তু-জানোয়ারদের জন্যে।'

ডোবার মধ্যে মস্ত একটা জিনিসকে নড়তে দেখল রবিন। 'দেখো দেখো,' চিৎকার করে উঠল সে, 'পাথরটা কি রকম নড়ছে!' তারপর চিনতে পারল জিনিসটাকে। 'ও, জলহস্তী।'

বিশাল মুখটা হাঁ করে মানুষের আঙুলের সমান মোটা দাঁতগুলো দেখিয়ে দিল জলের হাতিটা।

এগিয়ে চলল তিনজনে। পার হয়ে এল 'ক্যাট কম্পাউন্ড' লেখা একটা সাইনবোর্ড। এ জায়গাটাতে বড় বড় গাছের জঙ্গল আর ঘন ঝোপঝাড়। এশিয়ান জঙ্গলের মত। একটা ঘেরের মধ্যে গাছের ছায়ায় দুটো বাঘকে শুয়ে থাকতে দেখল রবিন।

রেলিং দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে জায়গাটাকে। বাঘের কাছ থেকে দর্শকদের আলাদা করে রাখার জন্যে। রেলিঙের ওপাশে ঘেরের ভেতরে কংক্রীটের তৈরি গভীর পরিখা। পানি নেই। পরিখার অন্যপারে রাখা হয় জানোয়ারগুলোকে।

'অনেক জায়গাতেই এমন পরিখা আছে,' মুসা জানাল। 'পরিখা বানানো হয়েছে যাতে জন্তু-জানোয়ারেরা পার হয়ে রেলিঙের কাছে আসতে না পারে।'

'ভাল বুদ্ধি,' কিশোর বলল। 'বদ্ধ খাঁচায় থাকতে হচ্ছে না। দর্শকদের কাছেও চলে আসতে পারছে না।'

'আসলেই ভাল বুদ্ধি,' রবিন তাকিয়ে আছে পরিখার ওপারের হলুদের ওপর কালো ডোরাকাটা বিরাট বিড়ালের মত জীবগুলোর দিকে। অলস ভঙ্গিতে শুয়ে বসে আছে, বড়ই নিরীহ চেহারা এখন। প্রয়োজনে যে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, ওই মুখ দেখলে এখন অনুমান করা যাবে না।

কিশোরের মনে হচ্ছে, সত্যিকারের কোন ঘন জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে। আঠা আঠা গরম। গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে বনের মধ্যে বাঘ দেখছে।

আবার হাঁটতে লাগল ওরা। পাথর আর উঁচু উঁচু বালির ঢিবিতে ভরা দক্ষিণ আমেরিকান বনের পরিবেশে এসে ঢুকল। পাথরের ওপর শুয়ে আছে দুটো হালকা বাদামী রঙের কুগার, পাহাড়ী সিংহও বলা হয় এদের।

'পাথরগুলো আসল না,' মুসা বলল। 'গুনাইট নামের একধরনের সিনথেটিক জিনিস দিয়ে তৈরি। বেশির ভাগ পাথর, গুহা, গাছপালা ওই জিনিস দিয়ে বানানো। জন্তু-জানোয়ারের পরিচিত পরিবেশের মত করে সাজানো হয়েছে।'

একটা ঘেরের কাছে অনেক দর্শককে ভিড় করে থাকতে দেখা গেল। সেদিকে আঙুল তুলে রবিন বলল, 'ওখানে কি হচ্ছে?'

গমগম করছে লোক। প্রচুর গুঞ্জন। অনেকের হাতে ক্যামেরা রেডি। বাচ্চাকে দেখানোর জন্যে কাঁধের ওপর তুলে নিয়েছে কেউ কেউ।

পার্বত্য এলাকার মত করে বানানো হয়েছে জায়গাটা। গ্রীষ্মকালেও তুষারের ছোপ দেখা যাচ্ছে ওখানে।

'হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের নকল,' মুসা জানাল। 'ওখান থেকেই আনা হয়েছে তুষার চিতাটা। তুষারগুলোও কিন্তু আসল না।'

'কিছু একটা হবে মনে হচ্ছে ওখানে,' রবিন বলল। 'খবরের কাগজের লোক দেখতে পাচ্ছি।'

একজন লোক আর একজন মহিলাকে দেখা গেল, দুটো সাইন তুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সাইনগুলোতে ইংরেজিতে যা লেখা রয়েছে তার বাংলা করলে দাঁড়ায়: চিড়িয়াখানা অমানবিক; আর: জানোয়ারগুলোকে মুক্তি দাও।

ঘটনাটা কি, ভাবছে রবিন। কি হবে ওখানটায়?

তুষার চিতার ঘেরের মধ্যে একটা মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন এক সুদর্শন ভদ্রলোক। শার্ট-টাই পরা। মুখের চামড়া রোদে পোড়া বাদামী। সোনালি চুল। বয়েস চল্লিশের ঘরে।

'রকি বীচ চিড়িয়াখানায় স্বাগতম,' বক্তৃতার ঢঙে শুরু করলেন তিনি। 'আমার নাম রিচার্ড বোম্যান। এই চিড়িখানার ডিরেক্টর। আজ আমাদের জন্যে একটা মহা আনন্দের দিন। কারণ একটা তুষার চিতাকে আমরা দর্শকদের সামনে হাজির করতে পারছি। একজন মাননীয়া ইয়াং লেডির কাছ থেকে চিতাটা উপহার পেয়েছি আমরা। তিনি প্রিন্সেস চন্দ্রাবতী। ভারতের কান্‌ঝা রাজ্যের রাজকুমারী।...ইয়োর হাইনেস, আপনি নিজেই এসে দয়া করে এই চমৎকার প্রাণীটির কথা কিছু বলুন আমাদের।'

কিশোর দেখল, ওদেরই সমবয়েসী একটা মেয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে মঞ্চে আরোহণ করল। সুন্দরী। বাদামী চামড়া। কালো, লম্বা চুল; কালো বড় বড় চোখ। পরনে গোলাপী শাড়ি।

'হ্যালো,' স্পষ্ট, পরিষ্কার ইংরেজিতে দর্শকদের উদ্দেশে বলল রাজকুমারী। 'আগেই জেনেছেন, আমার নাম চন্দ্রাবতী। ভারতের উত্তরাঞ্চলের কান্‌ঝা নামের এক ক্ষুদ্র রাজ্যে আমার বাড়ি। কয়েক বছর আগে একটা তুষার চিতার বাচ্চা উপহার হিসেবে পাই আমি। নাম রাখি কান্তা। আমার খুব প্রিয় পোষা জানোয়ার।'

মন দিয়ে শুনছে দর্শকরা। আমেরিকায় কেন এসেছে, জানাল প্রিন্সেস। পড়তে এসেছে।

'কান্তাকে কাছে কাছে রাখতে চেয়েছি আমি,' মলিন হাসি হাসল সে। 'তাই দেশ থেকে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু ডরমিটরিতে চিতাবাঘ রাখার অনুমতি মিলল না। তাই ওটা রকি বীচ চিড়িয়াখানাকে উপহার দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল জনতা। কিশোর লক্ষ করল, স্পষ্ট ইংরেজি বললেও মাতৃভাষার টান লুকাতে পারছে না চন্দ্রাবতী।

'দুই মাস আগে রকি বীচে এসেছি আমি,' রাজকুমারী বলল। 'এখানে সবাই আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করছে। আমি আশা করব, আমার কান্তাও এই ব্যবহার পাবে এখ ːকার মানুষের কাছ থেকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।'

আবার হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাল জনতা।

মঞ্চ থেকে নেমে এল রাজকুমারী। তার জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন আবার বোম্যান।

'কান্তাকে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার আগে,' বোম্যান বললেন, 'আরও একজনকে আপনাদের সামনে হাজির করতে চাই। আমাদের জন্যে তিনিও এক বিশেষ উপহার। তিনি একজন বিশিষ্ট প্রকৃতিবিদ এবং জন্তু-প্রেমিক। তাঁর নাম উইলিয়াম এ· বেরিংটন। তুষার চিতার ব্যাপারে তিনি এখন বলবেন আপনাদের।'

তাকিয়ে আছে রবিন আর কিশোর। মঞ্চে উঠলেন মিস্টার বেরিংটন। কর্কশ চেহারা। কেশরের মত ঝাঁকড়া সাদা চুল। খাকি সাফারি পরেছেন। বিশাল এক গ্রিজলি ভালুকের মত লাগল তাঁকে রবিনের কাছে। মনে হলো সিংহের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ, কুমিরকে মুগ্ধ করতে এবং ধূর্ত শেয়ালকে সহজেই ধোঁকা দিতে পারে এই লোক।

'কেমন আছেন আপনারা?' দর্শকদের উদ্দেশে হাত নাড়তে নাড়তে আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন বেরিংটন, 'আমি ওই খামখেয়ালী বুড়ো কোটিপতিদের একজন, যাদের কথা মাঝে মাঝে আপনারা পত্রিকায় পড়ে থাকেন। আমার সৌভাগ্য, এত টাকা আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি যে টাকা রোজগারের জন্যে কখনোই আমাকে খাটাখাটনি করতে হয়নি। এতে করে জন্তু-জানোয়ারের পেছনে ব্যয় করার জন্যে প্রচুর সময় আমি পেয়েছি। আমি ওদের শিকার করেছি, ধরে এনেছি, ওদের নিয়ে গবেষণা করেছি।'

'ভালই যদি বাসে,' ফিসফিস করে বলল রবিন, 'শিকার করতে হাত ওঠে কিভাবে? শিকার মানে তো খুন।'

'অনেক বড় বড় শিকারী ছিলেন, যাঁরা জন্তু-জানোয়ার ভালবাসতেন, এদের জন্যে অনেক কিছু করে গেছেন; জিম করবেট তার বড় প্রমাণ,' জবাব দিল কিশোর। 'অনেক সময় জন্তু-জানোয়ারের সংখ্যা স্বাভাবিক রাখার জন্যে মেরে

ফেলতে হয়। শিকারীরা সাহায্য করে তাতে। কোন বুনো প্রাণী যদি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়—যেমন, বাঘ যদি মানুষখেকো হয়, কিংবা হাতি খেতের ফসল নষ্ট করতে থাকে, মানুষ মারে; তাকেও মেরে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।'

'উপকূল থেকে কিছুদূরে ছোট একটা দ্বীপে আমার বাসস্থান,' বেরিংটন বলছেন। 'ছোটখাট একটা চিড়িয়াখানাও আছে ওখানে আমার। মাস দুই আগে মিস্টার বোম্যানের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলাম। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, আমার কাছে কোন পুরুষ তুষার চিতা আছে কিনা। অনুরোধ জানিয়েছিলেন, থাকলে কিছুদিনের জন্যে সেটা চিড়িয়াখানাকে ধার দিতে পারব কিনা। একটা মাদী চিতা পেতে যাচ্ছেন তিনি। সেটার জন্যে একটা উপযুক্ত স্বামী দরকার।'

বেরিংটন হাসলেন। দেখাদেখি দর্শকদের অনেকেও হাসল।

'যাই হোক,' কোটিপতি জন্তু-প্রেমিক বললেন, 'আমার কাছে একটা পুরুষ চিতা আছে। কয়েক হপ্তার মধ্যেই সেটাকে এখানে নিয়ে আসা হবে। তারপর দেখতে চাই, কি ঘটে। আমি আশা করব, ভাল কিছুই ঘটবে। আরও কিছু তুষার চিতার মুখ দেখতে পাবে পৃথিবী।'

প্রচুর করতালি আর চিৎকারের মাধ্যমে বেরিংটনকে স্বাগত জানাল জনতা। মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন তিনি।

'এখন, আমাদের আসল মেহমানকে দেখানোর পালা,' বোম্যান বললেন। 'অনুরোধ করছি, একে আর হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবেন না। হই-চই একদম সহ্য করতে পারে না তুষার চিতা। ঘাবড়ে যেতে পারে।' টেলিভিশনের উপস্থাপকের মত নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন, 'রকি বীচের প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমাদের কান্তা আসছে।'

ঘেরের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন বোম্যান। নীরব হয়ে গেল জনতা। তুষার চিতার আগমনের অপেক্ষা করছে। কিন্তু আসছে না চিতাটা।

'কি হলো?' রবিনের প্রশ্ন।

'ওই যে, আসছে,' মুসা বলল। 'বেশি মানুষ দেখেই বোধহয় আসতে দ্বিধা করছে।'

ঘেরের কাছে একটা গুনাইট পাথরের ভেতর থেকে বেরোতে দেখা গেল চিতাটাকে।

পুরোপুরি চুপ থাকতে পারল না দর্শক। চাপা গুঞ্জন উঠল। কেন, বুঝতে পারছে কিশোর। তুষার চিতার রূপ দেখে সে-ও মুগ্ধ। বাঘের চেয়ে আকারে ছোট। ধোঁয়াটে-ধূসর চামড়ায় কালো বড় বড় ছোপ।

'হাঁটে কি করে দেখো!' ফিসফিস করে বলল রবিন।

স্বচ্ছন্দ গতিতে, সাপের মত নিঃশব্দে, রাজকীয় ভঙ্গিতে হেলেদুলে কৃত্রিম পাহাড়ের কিনার ধরে এগিয়ে এল চিতাটা। কৃত্রিম তুষারে পড়ে থাকা এক টুকরো লাল কাপড়ের কাছে এসে থামল। শুঁকল কাপড়টা।

'চন্দ্রাবতীর শাড়ির টুকরো,' মুসা জানাল। 'রাজকুমারীর গায়ের গন্ধ পরিবেশটাকে ঘরোয়া ভাবতে সাহায্য করে চিতাটাকে।'

রেলিঙের ধার ঘেঁষে রাজকুমারীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রবিন। কান্তার

দিকে তাকিয়ে নীরবে চোখ মুছছে।

আচমকা চিৎকার শুনে ঝটকা দিয়ে সেদিকে ঘুরে গেল রবিনের চোখ এলোপাতাড়ি দৌড়ানো শুরু করেছে দর্শকরা। চোখে-মুখে আতঙ্ক।

'ভাগো! ভাগো!' চিৎকার করে উঠল একটা ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ে 'বাঘ ছুটে গেছে! ঘের থেকে বাঘ বেরিয়ে এসেছে!'

দুই

কিশোর, রবিন আর মুসার চারপাশ দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে লোকে। বাঘ! বাঘ! পালা! পালা! খেয়ে ফেলল রে!–তীক্ষ্ণ চিৎকার নষ্ট করে দিল বিকেলের শান্ত পরিবেশ।

রিচার্ড বোম্যানকে ছুটে যেতে দেখল রবিন, বাঘটা যেদিকে থাকার কথা সেদিকে। কোমরের বেল্ট থেকে একটা ওয়াকি-টকি খুলে নিয়ে চিৎকার করে হুকুম দিতে শুরু করলেন তিনি।

'জলদি এসো!' কিশোর আর রবিনকে বলল মুসা। 'কি হচ্ছে, দেখে আসি।'

মুসার পেছন পেছন ছুটল দুজনে। দর্শকরা সব ছুটে যাচ্ছে ওদের উল্টোদিকে। আতঙ্কে চিৎকার করছে বেশির ভাগ।

কুগার-পাহাড়ের পাশ কাটিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল মুসা। ঘেরের মধ্যে যে বাঘ দুটোকে অলস ভঙ্গিতে শুয়ে থাকতে দেখেছিল, তার একটা এখন দাঁড়িয়ে আছে ঘেরের বাইরে রাস্তার ওপর। তারমানে বাঘ বেরোনোর খবরটা মিথ্যে নয়। সত্যি সত্যি বেরিয়েছে।

বাঘের কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছেন বোম্যান। মোলায়েম স্বরে, নিচু গলায় কথা বলে শান্ত রাখার চেষ্টা করছেন বাঘটাকে।

দাঁড়িয়ে আছে বাঘটা। বোম্যানের ওপর দৃষ্টি স্থির। দ্বিধায় পড়ে গেছে। অনিশ্চিত ভাবভঙ্গি। কোথায় যাবে, কি করবে যেন বুঝতে পারছে না।

জায়গাটা পুরো জনশূন্য হয়ে গেছে। বোম্যান আর তিন গোয়েন্দা ছাড়া কেউ নেই। রবিন দেখল, অন্য বাঘটা আগের জায়গাতেই ঘুমিয়ে আছে।

এগিয়ে গেল কিশোর। 'আমরা কোন সাহায্য করতে পারি?'

ফিরে তাকালেন বোম্যান। মুসাকে চিনলেন। জু-ইনটার্ন। 'দুজন লক্ষ রাখো দর্শকরা যাতে এদিকে না আসে। আরেকজন এসো, বাঘটার ওপর নজর রাখতে সাহায্য করো আমাকে।'

দুই সহকারীকে ইশারা করে বোম্যানের দিকে এগিয়ে গেল কিশোর, বাঘের ওপর নজর রাখার জন্যে। দর্শকদের দিকে ফিরে তাকাল মুসা আর রবিন। খবরের কাগজের এক ফটোগ্রাফারকে আসতে দেখে এগিয়ে গেল রবিন, 'আসবেন না, আসবেন না! ওখানেই থাকুন!'

ওদিকে বোম্যানের কাছে কিশোর গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, 'আমার সঙ্গে স্বাভাবিক কথাবার্তা বলতে থাকো, যেন কিছুই ঘটেনি। বাঘটাকে কিছু বুঝতে দিয়ো

না।'

'ঠিক আছে,' বাঘের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে কথা শুরু করল কিশোর। 'আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো, চিড়িয়াখানার বাঘ কি মানুষকে আক্রমণ করে?'

'সাধারণত করে না।' বাঘটার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বলিস?'

তাঁর প্রশ্নের জবাবে মৃদু গরগর করল বাঘটা।

বাঘের চেহারাটা যত ভয়ঙ্করই হোক, কিশোর লক্ষ করল, ওটার গোঁফ আর লেজ একেবারেই সাধারণ বিড়ালের মত। কেবল আকারে বড়, আর রঙটা একটু অন্য রকম।

'বেড়াল গোষ্ঠীর বড় বড় প্রাণীরা অকারণে কোন প্রাণীই মারে না, ওদের প্রধান খাবার হরিণও না,' বোম্যান বললেন। 'সাংঘাতিক অলস হয় এরা। শুধু খাবারের প্রয়োজন কিংবা নিজের এলাকা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখলেই হামলা চালায়। এখানে কিছু বলছে না বটে, ওটার সীমানার মধ্যে ঢুকে দেখো, ঠিক ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমার ওপর।'

হলুদ চোখজোড়া কিশোরের ওপর স্থির হলো বাঘটার।

'কি খবর রে, বাঘ?' বোম্যানের মত শান্ত, মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞেস করল কিশোর। চিড়িয়াখানার একটা সবুজ জীপ রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে বাঘটার পেছনে।

'চোখে চোখে তাকিয়ে কথা বলতে থাকো,' ফিসফিস করে কিশোরকে বললেন বোম্যান। 'পেছন দিকে তাকানোর কথা যেন না ভাবে। কি ঘটছে দেখতে দিতে চাই না।'

'শুনলি তো, বোম্যান কি বললেন?' বাঘটাকে বলল কিশোর। 'তোরা নাকি মানুষকে আক্রমণ করিস না। বোকামি করে ফেলে জাতের বদনাম করিস না, দেখিস।'

থামল জীপটা। চিড়িয়াখানার হালকা-সবুজ ইউনিফর্ম পরা দুজন লোক নামল। একজনের হাতে রাইফেল, আরেকজনের হাতে তিন ফুট লম্বা একটা তামার সরু নল।

'নোড়ো না,' কিশোরকে নির্দেশ দিলেন বোম্যান, 'একদম চুপ। ব্লোগান দিয়ে এখন ডার্ট ছুঁড়বে ওরা। কড়া ঘুমের ওষুধ ভরা আছে ডার্টের মধ্যে। বিশ মিনিটের জন্যে নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যাবে বাঘটার।'

আড়চোখে তাকিয়ে আছে কিশোর। পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে নলওয়ালা লোকটা। বাঘের পেছনে এসে থামল। মুখে তুলল নলটা। বাঘকে সই করে জোরে এক ফুঁ দিল। কমলা রঙের পুচ্ছওয়ালা একটা ডার্ট এসে বিঁধে গেল বাঘের চামড়ায়।

ঘাঁই করে চাপা গর্জন করে উঠল বাঘটা। মুখ হাঁ করতেই বেরিয়ে এল তীক্ষ্ণ দুটো শ্বদন্ত। কিশোরের দিকে তাকিয়ে গরগর করতে লাগল। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে চেহারা। চোখে আগুন। ওকে ব্যথা দেয়ার জন্যে কিশোরকেই দায়ী করে ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করল তার ওপর।

দাঁড়িয়ে থাকার সাহস হচ্ছে না আর তার। দু'তিন সেকেন্ড দেরি হলে কি ঘটত

জানে না, হয়তো দৌড়ই দিয়ে বসত। কিন্তু তার ভাগ্য ভাল, বাঘের রক্তে কাজ শুরু করে দিয়েছে ওষুধ। পা ভাঁজ হয়ে ধসে পড়ল যেন বাঘটা। মাটিতে থুতনি রেখে চোখ বুজল।

'উফ্, বাঁচা গেল!' পা দুর্বল লাগছে কিশোরের। তার মনে হলো বাঘটার মত সে-ও পড়ে যাবে।

বাঘটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন বোম্যান। গায়ে হাত রেখে বললেন, 'গেছে।'

রাইফেল আর ডার্টগান রেখে জীপ থেকে স্ট্রেচার নামিয়ে আনল লোক দুজন। বাঘটাকে স্ট্রেচারে তুলতে ওদের সাহায্য করলেন বোম্যান। জীপে তুলে দিলেন স্ট্রেচারটা। লোক দুজন উঠল। মুহূর্ত পরেই চলতে শুরু করল জীপ।

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল কিছু দর্শক আর উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করছিল চিড়িয়াখানার কর্মচারী। হাঁপ ছাড়ল ওরা।

দৌড়ে এল খবরের কাগজের এক রিপোর্টার। বোম্যানকে জিজ্ঞেস করল, 'কি ঘটেছে কিছু বলতে পারবেন?'

'না,' হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর মত লোকটাকে তাড়াতে চাইলেন বোম্যান। তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরলেন। 'অনেক সাহায্য করেছ, থ্যাংক ইউ। তবে এই বিপদে ঢোকা উচিত হয়নি তোমাদের...'

'বিপদ আর কি,' হেসে বলল মুসা। 'আমাকে তো ঢুকতেই হত, কারণ আমি চিড়িয়াখানার ভলান্টিয়ার।' কিশোর ও রবিনকে দেখিয়ে বলল, 'আর বিপদ দেখলে এগিয়ে আসা এদের দুজনের স্বভাব। বাঘের চেয়ে অনেক বড় বড় বিপদকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এসেছে ওরা।'

'তাই নাকি?' হাসলেন বোম্যান। কিশোরের মনে হলো, মুসার কথা বিশ্বাস করেননি তিনি, কিংবা রসিকতা ভেবেছেন।

দুই বন্ধুর দিকে তাকাল মুসা, 'আমাকে এখন একটা উটের সেবা করতে যেতে হবে। পরে দেখা হবে।'

দৌড়ে চলে গেল মুসা। বোম্যানের সঙ্গে সঙ্গে বাঘের ঘেরের রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর আর রবিন। অন্য বাঘটা এখনও নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে ভেতরে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘেরটা দেখতে লাগল কিশোর। কয়েক সেকেন্ড পর বিড়বিড় করে বলল, 'ও, এই তাহলে ব্যাপার!' গাছের মোটা একটা ডাল লম্বালম্বি পড়ে থাকতে দেখল পরিখার ওপর। ব্রিজ তৈরি করেছে ডালটা। ওটা বেয়ে হেঁটে পরিখা পার হয়ে চলে এসেছিল বাঘটা, তারপর লাফ দিয়ে রেলিঙ টপকানো কোন ব্যাপারই ছিল না।

বোম্যানের চোখেও পড়েছে ডালটা। 'সরিয়ে ফেলা দরকার। নইলে ওই বাঘটাও বেরিয়ে চলে আসবে।' গলা চড়িয়ে হাঁক দিলেন তিনি। দৌড়ে এল চিড়িয়াখানার দুজন কর্মচারী। গাছটা দেখিয়ে ওদের সরাতে বললেন।

লম্বা লম্বা লোহার পাইপ নিয়ে এল লোকগুলো, ডালটা ঠেলে সরানোর জন্যে।

রেলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকে গলা বাড়িয়ে দিল রবিন। ভালমত দেখল ডালটা। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কিশোরের দিকে তাকাল। চিন্তিত ভঙ্গিতে ভুরু নাচাল কিশোর।

সে যা ভাবছে, রবিনও তাই ভাবছে।

'ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না,' ঘোষণা করল কিশোর।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালেন বোম্যান, 'কী!'

'ওই দেখুন,' ডালের গোড়ার দিকটা পড়েছে রেলিঙের দিকে। 'করাত দিয়ে কেটে রাখা হয়েছে অনেকখানি। ডালের ওদিকের মাথাটা দেখুন, দড়ি বাঁধা রয়েছে এখনও।'

'গত রাতে কিংবা তার আগের রাতে, কিংবা আরও আগে কেটে রেখেছে ডালটা কেউ,' কিশোর বলল। 'আগায় দড়ি বেঁধে তৈরি করে রেখেছিল।'

'তারপর সুযোগমত,' কিশোরের বক্তব্যটা শেষ করল রবিন, 'দড়ি ধরে দিয়েছে টান। গত আধঘণ্টার মধ্যে কোন সময় করেছে অকাজটা। ওর নিশ্চয় জানা ছিল, আজকের এই সময়টায় বেশির ভাগ দর্শক গিয়ে জমা হবে মঞ্চের কাছে, তুষার চিতা দেখার জন্যে।'

দুজনের দিকে তাকিয়ে আছেন বোম্যান। 'গোয়েন্দা নাকি তোমরা?'

চট করে রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। বোম্যানের দিকে ফিরে আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল।

'ও!' দীর্ঘ একটা মুহূর্ত আবার ওদের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। 'মুসা যখন বলল, বিপদ দেখলে এগিয়ে যাওয়া তোমাদের স্বভাব, আমি ভেবেছি রসিকতা করছে।...আমি অফিসে যাচ্ছি। এসো না, হাঁটতে হাঁটতেই কয়েকটা কথা বলি।'

'কার কাজ, কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?' বোম্যানকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'না,' মাথা নাড়লেন বোম্যান। 'এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম নয়। মাসখানেক আগে দুটো বানর বেরিয়ে গিয়েছিল। হপ্তা দুই আগে একটা অজগর।...চলো, কোন্খানে, দেখিয়েই নিয়ে আসি।'

খানিকটা ঘুরপথে এগিয়ে জাপানী ম্যাকাকু বানরের ঘেরের কাছে কিশোরদের নিয়ে এলেন বোম্যান। পাথরের একটা দ্বীপ তৈরি করা হয়েছে, তাতে কিছু গাছপালা। দ্বীপ ঘিরে পরিখা, পানিতে ভর্তি। খেলা করছে বানরের দল। তীব্র গতিতে পাথরের ওপর দিয়ে গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটা বানর। ঘন, ধূসর রোমশ গা; লাল মুখটা দেখতে প্রায় মানুষের মত।

দ্বীপের পেছনে তারের বেড়া। তার ওপাশে ঘন গাছপালা। বেড়াটা দেখিয়ে বোম্যান বললেন, 'ওটা না থাকলে বেরিয়ে চলে যেত সবগুলো বানর। ওটাতে খুব অল্প ভোল্টেজের বিদ্যুৎ বইছে। বেড়া ধরে বেয়ে উঠতে গেলেই ইলেকট্রিক শক খায় বলে আর ওদিকে যেতে চায় না। মাসখানেক আগে দুটো বানর বেরিয়ে গেলে পরীক্ষা করে দেখা গেল বেড়া কাটা।'

বেড়াটা দেখল কিশোর। অনেক উঁচু। মই দিয়ে উঠেও নাগাল পাওয়া কঠিন।

কয়েক মিনিট পর, কিছুদূরের একটা লাল ইঁটের সুন্দর বাড়ির কাছে ওদের নিয়ে এলেন বোম্যান। 'এটা সাপের ঘর। সামনের দিকে কাঁচের বেড়া দেয়া ছোট ছোট ঘরের মধ্যে সাপ রাখা হয়, দেখেছ নিশ্চয়।'

'সাপের ঘরে বেড়া দিয়ে রাখাই ভাল,' হেসে বলল রবিন। 'বিষাক্ত ওই প্রাণীগুলোকে প্রচণ্ড ভয় পাই আমি।'

'ওই দেখো, এয়ার ভেন্ট,' ড্রেন পাইপের ওপরে বাতাস বেরোনোর ধাতব এয়ার ভেন্টটা দেখালেন বোম্যান। 'সাপের ঘরগুলো সব তাপ নিরোধক। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। বিল্ডিঙের ভেতরে তাই ভেন্ট লাগানো হয়েছে। সেদিন ওই ভেন্ট খুলে দিয়েছিল কে যেন। অজগর সাপের খাঁচার কাছে।'

'বাতাস বেরোনোর নলের ভেতর দিয়ে তখন বেরিয়ে গিয়েছিল সাপটা,' কিশোর বলল, 'তাই তো?'

মাথা ঝাঁকালেন বোম্যান। 'ওয়াকি-টকিতে আমাকে জানানো হলো, রাস্তা দিয়ে একটা অজগর যাচ্ছে। বিষাক্ত সাপ নয়। ভয়ে চেঁচানো শুরু করেছিল তবু অনেক দর্শক

'এর মধ্যে আজকের ঘটনাটাই ছিল তাহলে সবচেয়ে বিপজ্জনক,' রবিন বলল। 'খাঁচা থেকে বাঘ বের করে দেয়াটা ছেলেখেলা নয়।'

মাথা ঝাঁকালেন বোম্যান, 'হ্যাঁ।'

'প্রতিটি ক্ষেত্রেই মনে হচ্ছে,' অনুমান করল কিশোর, 'অফ টাইমে কারসাজিগুলো করে রাখা হয়, যখন দর্শক থাকে না। নইলে কারও না কারও চোখে পড়ে যেত। কারসাজি করে রাখে এমনভাবে, যাতে দর্শক আসার পর বেরোয় প্রাণীগুলো।'

'সিকিউরিটি গার্ড আছে আমাদের,' বোম্যান জানালেন। 'অফ টাইমেও পাহারা দেয়। তবে বিরাট এলাকা। সবখানে সব সময় নজর দিতে পারে না প্রহরীরা। চুরি করে ঢুকে কারও পক্ষে অকাজ সেরে চলে যাওয়া অসম্ভব নয়।'

'কিংবা হয়তো প্রহরীদেরই কেউ কাজটা করছে,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ, তা-ও হতে পারে। এটাই সমস্যা। যে কেউ করে থাকতে পারে। কার কাজ, আমিও বুঝতে পারছি না, পুলিশও পারছে না।'

জু প্লাজায় দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে এলেন বোম্যান। পাকা চত্বর ঘিরে ফুলের কেয়ারি। তার ওপাশে পাতাবাহারের বেড়া। চত্বরের মাঝখানে একটা ফোয়ারা। পাথরের সীলমাছের মুখ থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে পানি।

আরেকটা লাল ইঁটের বাড়ি দেখিয়ে বোম্যান বললেন, 'অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং, আমার অফিস।' বিল্ডিঙের সামনে একটা পুলিশের গাড়ি দেখা গেল। 'ও, এসে গেছে ওরা। যাই, আমাদের সিকিউরিটি হেডকে নিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।...তা, সব তো শুনলে। সাহায্য করো না আমাদের। করবে?'

'করব,' জবাব দিল কিশোর।

'তবে এ মুহূর্তে আপনাদের আলোচনায় থাকতে পারছি না আমরা,' রবিন বলল। 'একটা জিনিস দেখতে যেতে হবে। আচ্ছা, তুষার চিতা দেখানোর সময় ওখানে দুজন প্রতিবাদীকে দেখেছিলাম। কিছু জানেন নাকি ওদের ব্যাপারে?'

'ও, ওরা। লোকটার নাম নিক ওয়ালথ্রপ। মহিলা তার স্ত্রী, রায়না। প্রাণীর অধিকার নিয়ে আন্দোলন করছে। দু'তিন মাস ধরে দেখছি। চিড়িয়াখানায় ঢুকে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। এটা পাবলিকের জায়গা, জোর করে ওদের বেরও করে দিতে পারি না। চিড়িয়াখানা করার বিপক্ষে ওরা।' একটা মুহূর্ত থেমে বললেন বোম্যান, 'কিন্তু তাই বলে চিড়িয়াখানার জানোয়ার খাঁচা থেকে বের করে দেয়ার মত

কোন অপরাধ করবে বলে মনে হয় না।'

পরে আলাপ করবে—বোম্যানকে কথা দিয়ে, ওয়ালথ্রপরা কি করে দেখতে চলল দুই গোয়েন্দা।

পার্কিং লটে পুস্তিকা বিতরণ করছে তখন দুই প্রতিবাদী। সাইন দুটো ল্যাম্প পোস্টে ঠেস দিয়ে রাখা।

'জানোয়ারগুলোকে মুক্তি দাও' লেখা সাইনটার দিকে তাকাল রবিন। পুস্তিকা হাতে এক বৃদ্ধার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তখন রায়না।

'চিড়িয়াখানা জন্তু-জানোয়ারের জায়গা নয়,' বৃদ্ধাকে বোঝাচ্ছে রায়না। একটা পুস্তিকা গুঁজে দিল হাতে। 'ভেতরে ঢোকার আগে দয়া করে এটা পড়ে দেখুন।'

দুটো টিনেজ ছেলেমেয়েকে পাকড়াও করেছে নিক। তার স্ত্রীর মত একই সুরে কথা বলল, 'ভেতরে ঢোকার আগে দয়া করে এটা পড়ুন।'

চিড়িয়াখানা দেখতে পারে না ওয়ালথ্রপ দম্পতি, বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার।

দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কিশোর আর রবিন। নিকের লালচে দাড়ি। মাথার লম্বা চুল ঘোড়ার লেজের মত করে পেছন দিকে বাঁধা। রায়নার চুল সোনালি। খাটো করে ছাঁটা। দুজনেরই ছিপছিপে গড়ন। শক্ত-সমর্থ। বয়েস তিরিশের কোঠায়। দুজনের গায়েই টি-শার্ট, বুকে প্রিন্ট করে লেখা এ.আর.এফ।

গলায় ক্যামেরা ঝোলানো একজন লোক এগিয়ে গেল ওয়ালথ্রপদের দিকে। 'চিড়িয়াখানার মধ্যে গণ্ডগোল করছেন কেন? আমি তো জানি জন্তু-জানোয়ারের ভাল যত্ন নেয় রকি বীচ চিড়িয়াখানা।'

বোঝানোর চেষ্টা করল রায়না, 'বনের মধ্যে, প্রাকৃতিক পরিবেশে আরও অনেক ভাল থাকে ওরা। কারও দেখতে ইচ্ছে করলে ওখানে গিয়েই দেখুক না। শুধু শুধু খাঁচায় বন্দি করে রেখে বেচারাদের কষ্ট দেয়া কেন? আপনাকে যদি বন্দি করে রেখে মজার মজার খাবার দেয়া হয় সেটা কি ভাল লাগবে?'

প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেল লোকটা। 'কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশে গিয়ে দেখার অনেক ঝামেলা, অনেক খরচ। আমিই তো পারব না।'

'তাহলে আপনার দেখারও দরকার নেই, যার ক্ষমতা আছে সে-ই দেখবে,' স্ত্রীর মত স্বর অত নরম করল না নিক। ক্যামেরাওয়ালার বেল্টের দিকে হাত তুলে বলল, 'পরেছেন তো কুমিরের চামড়ার বেল্ট। আপনাদের মত অতি সৌখিনদের জন্যেই প্রশ্রয় পাচ্ছে চোরা-শিকারীরা, প্রাণ দিতে হচ্ছে হতভাগ্য প্রাণীগুলোকে।'

তর্ক শুনে ঘিরে দাঁড়াল কয়েকজন।

'এই গোঁড়াদের সঙ্গে কে কথা বলে!' রেগে উঠল ক্যামেরাওয়ালা। 'অকারণে গোলমাল করতে এসেছেন পাবলিকের জায়গায়।'

'দেখুন মিস্টার,' নিকও রেগে গেল, 'কথাবার্তা সাবধানে বলবেন! গোলমাল তো আপনারা করেন। জন্তু-জানোয়ারের বদলে আপনাদের মত জীবদের ধরেই খাঁচায় ভরা উচিত।'

'ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!' গর্জে উঠল ক্যামেরাওয়ালা।

'কি করবেন?' লোকটার বুকে এক ধাক্কা মারল নিক। 'করবেন কি, শুনি?'

'খবরদার!' চিৎকার করে উঠল ক্যামেরাওয়ালা।

নিকের মাথা গরম, অল্পতে রেগে যায়, বুঝতে পারল কিশোর।

ক্যামেরাওয়ালাও কম যায় না। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দেখা গেল মারপিটের ভঙ্গিতে একজন আরেকজনকে ঘিরে ঘুরতে শুরু করেছে। হঠাৎ ঘুসি বাগিয়ে ছুটে গেল নিক।

জলদি ওদের ঠেকানো দরকার। নইলে সত্যি সত্যি একটা খুনোখুনি কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলবে দুজনে।

তিন

'দাঁড়ান, দাঁড়ান!' দৌড়ে গিয়ে নিকের হাত চেপে ধরল কিশোর। 'করছেন কি? ঝগড়া করে আন্দোলন এগোতে পারবেন না। সহিংসতা পছন্দ করে না লোকে।'

রবিনও এসে দাঁড়াল কিশোরের পাশে।

ফিরে তাকাল নিক। চোখ-মুখ লাল।

'ও ঠিকই বলেছে,' রায়না বলল। 'ছাড়ো ওকে। ছেড়ে দাও।'

ঘুসি নামাল নিক।

'জংলি কোথাকার!' ভ্রূকুটি করল ক্যামেরাওয়ালা। 'সত্যি সত্যি পাগল এগুলো। চিড়িয়াখানা দেখতে দেবে না, হুঁহ!' টিকিট কেনার জন্যে গটমট করে এগিয়ে গেল খড়ের ছাউনি দেয়া টিকিট-কুঁড়ের দিকে।

কিশোরের দিকে তাকাল নিক, 'থ্যাংক ইউ। আমাকে থামিয়ে দিয়ে ভাল করেছ। মাঝে মাঝে আমার কি যে হয়ে যায়, নিজেকে সামলাতে পারি না।'

'বড় কঠিন একটা কাজে হাত দিয়েছেন, এর জন্যে প্রচুর ধৈর্য দরকার,' কিশোর বলল। 'মানুষকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তার ধারণা পরিবর্তন করা সোজা কথা না।'

'হোক কঠিন, হাল আমি ছাড়ব না,' কিশোরের হাতে একটা পুস্তিকা ধরিয়ে দিল নিক। 'আমি আর আমার স্ত্রী মিলে ছোট্ট একটা প্রতিষ্ঠান চালু করেছি, নাম দিয়েছি এ.আর.এফ, অর্থাৎ অ্যানিমেল রাইটস ফোর্স। আমরা জন্তু-জানোয়ারের নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের চেষ্টা করছি।'

'জন্তু-জানোয়ারের নাগরিক অধিকার!' লোকটাকে পাগলই মনে হলো রবিনের।

'এখন নেই বটে,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল রায়নার কণ্ঠ, 'তবে থাকা উচিত। সুযোগ মত আমাদের পুস্তিকা পড়ে দেখো, বুঝতে পারবে।'

'পড়ব,' পুস্তিকাটার দিকে তাকাল কিশোর।

'এসো,' স্বামীর হাত ধরে টান দিল রায়না। 'একদিনের জন্যে যথেষ্ট প্রতিবাদ করা হয়েছে। চলো, বাড়ি যাই। পথে বাজার থেকে কিছু তাজা শাক-সব্জি কিনে নিতে হবে।'

সাইন দুটো তুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল দুজনে। বাস স্টপেজে গিয়ে দাঁড়াল। কিশোরের দিকে চোখ ফেরাল রবিন, 'কি বুঝলে?'

'ওদের ওপর নজর রাখা দরকার,' কিশোর বলল। 'চিড়িয়াখানার জানোয়ার ছেড়ে দেয়ার পেছনে ওদের মোটিভ পরিষ্কার। আপাতত, চলো, আবার চিড়িয়াখানাটা ঘুরে দেখি।'

'চলো। সূত্র খুঁজি। জানোয়ারগুলোকে ছাড়ার সময় কিছু ফেলে যেতেও পারে।'

পরের একটি ঘণ্টা চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেড়াল দুই গোয়েন্দা। তীক্ষ্ণ নজর রাখল সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে কিনা দেখার জন্যে। মনে মনে আরও একবার স্বীকার করতে বাধ্য হলো রবিন, খুবই সুন্দর ভাবে রাখা হয়েছে চিড়িয়াখানাটা। দারুণ একটা পার্ক।

চিড়িয়াখানার বেশির ভাগটাই দেখা হয়ে গেল। অস্বাভাবিক কোন কিছু চোখে পড়ল না।

মাটিতে লম্বা নাক নামিয়ে কি যেন খুঁজছে একটা আরডাভার্ক। সেদিকে তাকিয়ে কিশোর বলল, 'মুসার কাছে যাই। এতক্ষণে উটের সেবা হয়ে গেছে নিশ্চয়।'

আফ্রিকান সমভূমির ওপর দিয়ে কোনাকুনি রওনা হলো ওরা। মাথার ওপর একটা মনোরেল চলছে।

'ওতে চড়ে চিড়িয়াখানা দেখাটা দারুণ উপভোগ্য হবে,' রবিন বলল। 'চড়ব নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'চড়ব। এখন না। পরে।'

তুষার চিতার ঘেরের পেছনে মুসাকে দেখতে পেল ওরা। ভাল ভিড় জমেছে। উটের সেবা শেষ তার। কথা বলছে রাজকুমারী চন্দ্রাবতীর সঙ্গে।

'এই যে, এসে গেছে,' ওদের দেখে বলে উঠল মুসা। 'প্রিন্সেস, আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিই। ও কিশোর পাশা, আর ও রবিন মিলফোর্ড।'

যতই আধুনিক হোক, আমেরিকায় আসুক, হাত মেলানো পছন্দ করে না ভারতের অনেক মেয়ে। হাত তুলে সালাম জানাল তাই কিশোর।

বাউ করার ভঙ্গিতে সামান্য মাথা নোয়াল রবিন।

'বাউ করছ কেন? এ সব রাজকীয় কায়দা-কানুন আমার পছন্দ না,' উষ্ণ আন্তরিক কণ্ঠে বলল রাজকুমারী। হাত দিয়ে ডলে শাড়ির আঁচল সমান করল। মুসার হাতের মিষ্টি দেয়া ক্র্যাকার জ্যাক পপকর্নের বাক্স দেখিয়ে বলল, 'আমাকে একটু দেবে?'

সঙ্গে সঙ্গে বাক্সটা বাড়িয়ে দিল মুসা, 'নিন।'

'কান্‌ঝার নাম এই প্রথম শুনলাম,' কিশোর বলল।

'অনেকেই শোনেনি,' ক্র্যাকার জ্যাক চিবুতে চিবুতে জবাব দিল রাজকুমারী। 'খুব ছোট্ট রাজ্য। খুদে।...হুঁ, সত্যি ভাল স্বাদ। তোমার রুচি খুব ভাল, মুসা।'

'আপনার বাবা কি ওখানকার রাজা?' জানতে চাইল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল চন্দ্রাবতী, 'হ্যাঁ। কিন্তু সেটা নামকা ওয়াস্তে। রাজা একজন থাকা দরকার, আছে। কান্‌ঝায় এখন গণতন্ত্র। তবু প্যারেড, ডাক টিকিট আর কিছু কিছু জায়গায় এখনও রাজ পরিবারের মানুষকে দেখতে চায় লোকে।...আপনি আপনি

করছ কেন আমাকে? তুমি করে বলো।'

'থ্যাংক ইউ...'

উচ্ছকিত হাসি শুনে ফিরে তাকাল কিশোর। দুটো ছোট ছেলে ঘাসের মধ্যে ডিগবাজি খাচ্ছে। খানিক দূরে আরেকটা আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে বড় একটা ওক গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে।

নজর দিত না কিশোর। কিন্তু মনে হলো ছেলেটা ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। ভাল করে দেখে বুঝল, না, ওকে নয়, রাজকুমারীকে দেখছে। অস্বাভাবিক কিছু না। দেখবেই। রকি বীচে রাজকুমারী গণ্ডায় গণ্ডায় আসে না।

'আমেরিকায় পড়তে এলে কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'ভারতে তো স্কুল-কলেজের অভাব নেই।'

'সারা পৃথিবীর কাছেই আমেরিকা এখন একটা বিস্ময়, এখানে আসার লোভ ছাড়তে পারে না। আমার এক খালাত ভাই রকি বীচে পড়ছে। তার মুখে প্রশংসা শুনতে শুনতে আমিও আর না এসে থাকতে পারলাম না।' হাত বাড়াল চন্দ্রাবতী, 'মুসা, দাও তো আরেকটু। সত্যি চমৎকার।'

আচমকা তীক্ষ্ণ এক চিৎকার শুনে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। কোথা থেকে শব্দটা এল দেখতে চাইছে।

'কান্তা ডাকছে,' হাত তুলে ঘেরটা দেখাল রাজকুমারী। রেলিঙের ওপাশে, পরিখার ওপারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিতাটাকে। সবুজ চোখ মেলে তাকিয়ে আছে মনিবের দিকে। চন্দ্রাবতীর লাল শাড়ির টুকরোটা ওর এক পায়ে পেঁচানো। 'একমাত্র তুষার চিতাই এ রকম শব্দ করতে পারে।'

'কি চায়?' মুসার প্রশ্ন।

'আমার দৃষ্টি আকর্ষণ,' মৃদু হেসে বলল রাজকুমারী। 'মাঝে মাঝে এত জেলাস হয়ে ওঠে...' চিতাটার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বিচিত্র, দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলল। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে জবাব দিল কান্তা।

রবিন অবাক। তার মনে হলো, সত্যি সত্যি কথা হচ্ছে জানোয়ার আর মানুষের মধ্যে। চিতাটার অপূর্ব সুন্দর চামড়ার দিকে তাকিয়ে থেকে রাজকুমারীকে জিজ্ঞেস করল সে, 'তোমার দেশে কি তুষার চিতা পাওয়া যায়?'

'ঠিক আমাদের রাজ্যে নয়, তবে কাছেই পাওয়া যায়। হিমালয়ের পার্বত্য এলাকায়। অনেক উঁচুতে, বরফে ঢাকা অঞ্চলে বাস করে তুষার চিতা। মানুষ তো থাকেই না এত ওপরে, আর কোন জন্তু-জানোয়ারেরও বাস নেই। খুব নিরিবিলি থাকতে পছন্দ করে এরা। আমার সঙ্গে মিল আছে।'

কি মনে করে ফিরে তাকাল কিশোর। এখনও গাছের নিচে একভাবে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটা। এদিকেই নজর। পরনে আমেরিকান পোশাক। কিন্তু ওর কালো চুল আর চামড়ার রঙ চন্দ্রাবতীর মত।

ছেলেটার চাহনি ভাল লাগল না কিশোরের। সতর্ক হয়ে উঠল তার সন্দেহপ্রবণ মন।

'দেশে থাকতে কোথায় রাখতে চিতাটাকে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'রাতে আমার ঘরে, আমার বিছানার নিচে পায়ের কাছে শুয়ে থাকত,'

রাজকুমারী জানাল। 'কিন্তু দেখতে দেখতে এতবড় হয়ে গেল, ঘরে রাখাটা কঠিন হয়ে গেল। ওর বাড়ির কাছে পাহাড়েই ছেড়ে দিয়ে আসার কথা ভেবেছি। কিন্তু কোন জানোয়ার শিশুকাল থেকে একবার পোষা হয়ে গেলে বুনো এলাকায় আর টিকতে পারে না। বুনো পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না কোনমতেই। না খেয়ে মরে শেষে। তাই আমেরিকাতে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এখানেও সঙ্গে রাখতে পারলাম না। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে শেষে চিড়িয়াখানায় দিয়ে দেয়াই ভাল মনে করলাম। রোজ সকালে একবার করে দেখে যেতে হবে ওকে।'

দুচোখ ভরা ভালবাসা নিয়ে চিতাটার দিকে তাকিয়ে আছে চন্দ্রাবতী। চিতাটাও তার থাবায় পেঁচানো শাড়ির কাপড় শুঁকছে বার বার।

'এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে বরং হাঁটাহাঁটি করি,' আচমকা ঝটকা দিয়ে চিতাটার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়াল রাজকুমারী। মন সরানোর চেষ্টা করছে। 'কি সুন্দর বিকেল।' রসিকতা করল, 'হাঁটতে গেলে আবার গণ্ডারের সামনে পড়ব না তো?'

হাসতে গিয়ে মুসার গলায় পপকর্ন আটকে গেল। বের করার জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগল। হেসে ফেলল চন্দ্রাবতী। ফিরে তাকাল কিশোর। ওক গাছের নিচ থেকে উধাও হয়েছে রহস্যময় তরুণ।

ছায়াঢাকা একটা হাঁটাপথ ধরে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে এগিয়ে চলল রাজকুমারী।

'ভাল কথা,' হাঁটতে হাঁটতে রবিন বলল, 'মুসা, তুমি জানো, আরও দুবার খাঁচা থেকে জানোয়ার ছুটে গিয়েছিল?'

'জানি। কেন?'

'মিস্টার বোম্যানের কাছে শুনলাম, ব্যাপারটা নাকি সন্দেহজনক। অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না ওগুলো। জানোয়ারগুলোকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করেছে কেউ, আজকের বাঘটার মত। প্রশ্ন হলো: কে, এবং কেন?'

'এখন পর্যন্ত অবশ্য কোন অঘটন ঘটেনি,' কিশোর বলল। 'কিন্তু এ ভাবে বেরোতে থাকলে ঘটে যেতে কতক্ষণ!'

'তোমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে,' রবিন আর কিশোরের দিকে তাকাতে লাগল মুসা, 'আরেকটা কেস পেয়ে গেছি?'

'কেস?' ভুরু উঁচু করল চন্দ্রাবতী। 'পুলিশের লোক নাকি তোমরা? জুনিয়র পুলিশ?'

হাসল মুসা, 'পুলিশ নই। গোয়েন্দা। শখের গোয়েন্দা।'

'গোয়েন্দা! কি সাংঘাতিক!'

'আস্তে, আস্তে!' তাড়াতাড়ি হাত তুলে বাধা দিল রবিন। 'চিড়িয়াখানার সবাইকে শুনিয়ে দেবে নাকি।'

'না না, শোনাব না...' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলল চন্দ্রাবতী।

সরু খালের ওপর একটা ব্রিজ আছে। খালের এক মাথা গিয়ে শেষ হয়েছে একটা পুকুরে। ব্রিজ পেরোনোর সময় মুসাকে বলল কিশোর, 'চিড়িয়াখানায় তুমি কাজ নেয়াতে ভাল হয়েছে আমাদের জন্যে। তদন্তের সুবিধে হবে। গত কয়েক মাসে অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়েছিল নাকি তোমার?'

'মনে করতে পারছি না,' মুসা বলল।

পুকুরের পানিতে ভেসে থাকা নানা রকম হাঁস দেখার জন্যে থামল দলটা।

'চিড়িয়াখানার এমন কোন কর্মচারীর কথা জানো, কোন কারণে যে চিড়িয়াখানার ওপর ক্ষুব্ধ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

হাঁসগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা বলে উঠল মুসা, 'ডক্টর হেমিং। প্রাইমেট কিউরেটর।'

'আমি তো জানতাম,' আবার হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন, 'কিউরেটর থাকে মিউজিয়ামের। চিড়িয়াখানায় কিউরেটরের কি দরকার?'

'এ কিউরেটর সে-কিউরেটর নয়,' মুসা বলল। 'কীপাররা জন্তু-জানোয়ারের দেখাশোনা করে, সেবাযত্ন করে; আর কিউরেটররা মনোযোগ দেয় কোন বিশেষ একটা প্রজাতির ওপর। ডক্টর হেমিং আছেন প্রাইমেটদের দায়িত্বে। বানর থেকে শুরু করে শিম্পাঞ্জি, গরিলা—মোটকথা বানর জাতীয় সমস্ত প্রাণীর ভার তাঁর ওপর।'

'তিনি ক্ষুব্ধ, এ কথা কেন মনে হলো তোমার?' জানতে চাইল কিশোর।

'শিম্পাঞ্জি নিয়ে গবেষণা করে বিখ্যাত হয়ে গেছেন তিনি,' মুসা বলল। 'একদিন তাঁর ল্যাবরেটরিতে শিম্পাঞ্জির খোঁয়াড় মেরামতে সাহায্য করতে গিয়েছিলাম। তাঁকে অভিযোগ করতে শুনলাম, চিড়িয়াখানার ট্রাস্টি বোর্ড সমস্ত টাকা একটা বিশেষ এগজিবিটের ওপর খরচ করতে চায়।'

'তাতে অসুবিধেটা কি?'

'শিম্পাঞ্জিদের ওপর সরেজমিনে একটা গবেষণা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ডক্টর হেমিং।'

কিছুক্ষণ আগে যে হাতিটার সেবা করে এসেছে মুসা, গিনি, সেটার কাছে এসে দেখা গেল কলাগাছ খাচ্ছে।

'চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ গবেষণার জন্যে বরাদ্দ করা টাকা কেটে নিয়ে নতুন এই প্রদর্শনীতে খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে,' মুসা বলল, 'যেটা আহত করেছে ডক্টর হেমিংকে। রীতিমত খেপে উঠেছেন তিনি। খবরটা শোনার পর হাতের সামনের সমস্ত ফাইল ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন মেঝেতে।'

'ইনটারেসটিং!' চন্দ্রাবতী বলল। 'আমেরিকান টিভির নাটকের মত।'

'কবের ঘটনা এটা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'মাসখানেক আগের।'

'এক মাস?' দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। 'জানোয়ার ছুটে যাওয়ার ঘটনাটা তখনই প্রথম ঘটেছিল না?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'তাহলে তো ডক্টর হেমিঙের সঙ্গে একবার দেখা করতে হয়।' রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'কি বলো?'

উহ্ করে উঠল রবিন।

'কি হলো?'

'পিঠে কি যেন লাগল!'

'কই কিছু তো…' কথা শেষ হলো না কিশোরের। থ্যাপ করে তার গায়েও কি যেন একটা লেগে, মাটিতে পড়ে গড়িয়ে চলে গেল ঝোপের ভেতর। রবিনের মত

উহ্ করে উঠল সে-ও। হাতটা চলে গেল কাঁধের কাছে।
'শুয়ে পড়ো! জলদি শুয়ে পড়ো!' গুলি করা হচ্ছে ভেবে চিৎকার করে উঠল সে।

চার

উপুড় হয়ে শুয়ে থেকে মাথা ঘুরিয়ে চন্দ্রাবতীর দিকে তাকাল রবিন।
ভয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে রাজকুমারীর। গুলি খাওয়ার ভয়ে দুই হাতে মাথা চেপে ধরে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে সে।
ঝোপের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। হাত বাড়িয়ে বের করে আনল একটা আপেল। রবিনকে দেখিয়ে বলল, 'মনে হয় এটা লেগেছিল।'
হাঁ হয়ে গেল রবিন। বিড়বিড় করল, 'আপেল দিয়ে ঢিল ছুঁড়েছে...' চোখ পড়ল মুসার ওপর। সে শোয়নি। মুখে নীরব হাসি। রবিনের চোখে চোখ পড়তেই হো-হো করে হেসে উঠল।
'হাসার কি হলো?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।
'তুমি ভেবেছ রাজকুমারীকে কিডন্যাপ করতে এসেছে?' হাসার জন্যে ঠিকমত কথা বলতে পারছে না মুসা। 'মোটেও না। তোমাদের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে।'
'মানে?' উঠে বসল রবিন। বোকার মত তাকিয়ে রইল মুসার দিকে।
'ওই দেখো, কে তোমাদের ঢিল ছুঁড়েছে,' হা-হা করে হেসে নিল আরেক চোট মুসা।
'কে?' উঠে দাঁড়িয়েছে কিশোর।
'গিনি! গিনি!' পাশের ঘেরটার দিকে হাত তুলল মুসা। 'ঢিল ছুঁড়তে ভালবাসে সে। ওর শুঁড়ের কাছে ছোঁড়ার মত কোন জিনিস রাখি না আমরা। দর্শকরা নিশ্চয় আপেল খেতে দিয়েছিল। সেগুলো ছুঁড়েছে।'
মস্ত ধূসর প্রাণীটার দিকে তাকাল কিশোর। তিরিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে এদিকেই। মনে হলো, হাসছে।
'হাসো, আরও হাসো,' মুসা বলল। 'ওর নখে নেল পলিশ লাগানো নিয়ে হাসাহাসি করেছিলে না। প্রতিশোধ নিয়েছে। ঠিকই মনে রেখেছে ও। হাতিরা সহজে ভোলে না।'
উঠে দাঁড়িয়ে শাড়ি থেকে ধুলো ঝাড়তে লাগল চন্দ্রাবতী। হাসি চেপে কিশোর আর রবিনকে জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক আছ তো তোমরা?'
'আছি,' রবিন বলল। 'আস্ত একটা গাধা মনে হচ্ছে নিজেকে।'
আগের প্রসঙ্গে ফিরে এল আবার কিশোর, 'মুসা, ডক্টর হেমিংকে কোথায় পাওয়া যাবে?'
'ল্যাবরেটরিতেই থাকেন এ সময়, এপ অ্যাভিনিউর কাছে।'
'চলো, আমাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেবে।'

'এখন তো নিশ্চয় খুব ব্যস্ত তিনি। সব সময়ই থাকেন অবশ্য। তা ছাড়া আমাকে বিশেষ পাত্তা দেবেন না, হয়তো ঢুকতেই দেবেন না। এক কাজ করো বরং। মিস্টার বোম্যানকে বলো, তিনি সহজেই দেখা করার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।'

'হুঁ।' রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। 'চলো।' মুসাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি যাবে না?'

দ্বিধা করে বলল মুসা, 'আমি আর গিয়ে কি করব? তোমরাই যাও। আমি প্রিন্সেসকে অ্যাভিয়ারি দেখাতে নিয়ে যাই। পাখির এলাকা। সুন্দর সুন্দর কুকাবুরা পাখি আনা হয়েছে। দেখাব বলে রেখেছিলাম প্রিন্সেসকে।'

'ঠিক আছে, যাও তাহলে।' রবিনের দিকে ফিরে, 'এসো,' বলে হাঁটতে শুরু করল কিশোর।

অফিসেই পাওয়া গেল বোম্যানকে। কিশোর জানাল, ডক্টর হেমিঙের সঙ্গে দেখা করতে চায়। ওরা যে রহস্যের তদন্ত করতে যাচ্ছে, এ কথাটা হেমিংকে না জানানোর অনুরোধ করল।

অবাক হলেন বোম্যান। 'সন্দেহ করছ নাকি তাকে?'

'সন্দেহ করার অবস্থায় আসিনি এখনও। তবে সাবধান থাকা ভাল।'

ডক্টর হেমিংকে ফোন করলেন বোম্যান। বললেন, দুটো ছেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। ওরা চিড়িয়াখানার ভাল চায়।

বোম্যানকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। সাইনবোর্ড দেখে খুঁজে বের করল এপ অ্যাভিনিউ। একটা বিল্ডিঙে ঢুকে করিডর ধরে এগোল।

'ওই যে, কিং-কঙের বংশধর,' রবিন বলল।

ঘুরে তাকাল কিশোর। রেলিঙের পরে ফাইবারগ্লাসের শিকের ওপাশে কয়েকটা গরিলা দেখতে পেল।

'শরীরটা যেমনই হোক,' কিশোর বলল, 'গরিলারা খুব ভদ্র জানোয়ার। মায়া-দয়া আছে। দেখো না, বাচ্চাটার গা থেকে কেমন কুটো ফেলছে।'

কয়েক মিনিট পর 'রিসার্চ ল্যাব' লেখা একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। দরজায় টোকা দিল কিশোর। মৃদু গুঞ্জন তুলে খুলে গেল স্বয়ংক্রিয় দরজা। মাথার ওপরে উজ্জ্বল স্কাইলাইট লাগানো একটা লম্বা হলঘরে পা রাখল দুই গোয়েন্দা। ঘরের মাঝখানে ফাইবারগ্লাসের শিক লাগিয়ে আলাদা করা। এ পাশের অংশটা প্রায় ভরে রাখা হয়েছে চার্ট, গ্রাফ, বই, ভিডিও আর সাউন্ড ইক্যুইপমেন্ট দিয়ে। একটা ডেস্ক আর কয়েকটা চেয়ার আছে।

একটা চেয়ারে বসে আছেন ডক্টর হেমিং। কোলে একটা শিম্পাঞ্জির বাচ্চা। ফিডার দিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছেন।

বসতে ইশারা করলেন দুই গোয়েন্দাকে। দুধ খাওয়ানো শেষ করে মুখ তুললেন, 'হুঁ। তো, শিম্পাঞ্জির ব্যাপারে আগ্রহী?'

'হ্যাঁ, শিম্পাঞ্জির বন্ধু হতে চাই,' রসিকতা করে বলল রবিন।

ডক্টর হেমিং হাসলেন। হাসিখুশি চেহারা। ধূসর চুলগুলো মাথার পেছনে ছোট খোঁপা করে বেঁধেছেন। পরনে ল্যাবরেটরির সাদা কোট। বয়েস পঞ্চাশের

কাছাকাছি।

'টবি, খাঁচার তালাটা খুলে দেবে?' পাশের অফিসের দিকে তাকিয়ে বললেন ডক্টর হেমিং। শিম্পাঞ্জির বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গেলেন শিকগুলোর দিকে।

শিকের ওপাশে ঘরের বাকি অর্ধেকটা তৈরি করা হয়েছে শিম্পাজি রাখার মত করে। একটা নকল গাছ, লম্বা হয়ে বেড়ে থাকা ডাল, সবুজ পাতা, আর দড়িতে বেঁধে ডালে ঝুলিয়ে রাখা একটা টায়ার। এক আলমারি খেলনা, একটা খেলনা কাঠের ঘোড়া আর একটা টেলিভিশন রাখা মেঝেতে।

টায়ারের ওপর বসে আছে একটা শিম্পাঞ্জি। আরেকটা ওটাকে ঠেলছে। বাচ্চাদের দোলনা খেলার মত। ছোট বাচ্চাটার চেয়ে এ দুটো অনেকটা বড়। মহা আনন্দে আছে ওরা।

'জীবনটা নেহায়েত মন্দ না,' বিড়বিড় করল রবিন।

কয়েক সেকেন্ড পর যান্ত্রিক শব্দ শোনা গেল। ডেকে বলল টবি, 'খুলেছি, ডক্টর হেমিং।'

শিকগুলোর মাঝে লাগানো একটা দরজা ঠেলে খুললেন ডক্টর। বাচ্চাটাকে ওপাশে নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'যাও, খেলোগে।'

দুই লাফে গিয়ে কৃত্রিম গাছে উঠে পড়ল বাচ্চাটা। ডাল ধরে ঝুলে ঝুলে নানা কসরত জুড়ে দিল সার্কাসের দড়াবাজিকরের মত।

ভাল করে দেখার জন্যে শিকের কাছে এগিয়ে গেল কিশোর আর রবিন। খেলতে খেলতে ওদের দিকে কৌতূহল ভরা চোরা চাহনি হানল শিম্পাঞ্জিগুলো।

'ওরা আমার বন্ধু,' গর্বিত ভঙ্গিতে ডক্টর হেমিং বললেন। 'ববি, টপ আর বেবি জুপিটার। আফ্রিকায় জন্ম ওদের। তিন ভাই-বোন। বয়েস কম। মা মারা যাওয়ার পর অনেক কষ্টে নিয়ে আসা হয়েছে ওদেরকে। নামগুলো কেমন?'

'ভাল,' জবাব দিল কিশোর।

'আমি রেখেছি।'

'এখানে কিসের গবেষণা করছেন আপনারা?'

'বুদ্ধিমান প্রাণীদের মধ্যে মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি হলো শিম্পাঞ্জি। জিনেটিক গঠনের দিক দিয়ে আমাদের সঙ্গে নব্বই ভাগ মিল ওদের। আমি শিওর হতে চাচ্ছি, অন্য সব ব্যাপারে কতটা মিল।'

'দেখতে তো অনেকটাই মানুষের মত,' রবিন বলল। কালচে ধূসর রোমশ প্রাণীগুলো আকারে একটা পাঁচ বছরের মানুষের বাচ্চার সমান। ভাব প্রকাশের সময় মুখের ভঙ্গি সব মানুষের মত। এখন যে ভাবে কৌতূহলী চোখে কিশোর আর রবিনকে দেখছে, নতুন কাউকে দেখলে মানুষও এ ভাবেই তাকায়।

'মানুষের সঙ্গে আর কোন্‌দিক থেকে মিল ওদের?' জানতে চাইল কিশোর।

'আমরা দেখেছি, এমন কিছু ক্ষমতা আছে শিম্পাঞ্জিদের যা শুধু মানুষের মাঝেই দেখা যায়,' ডক্টর হেমিং জানালেন। 'যেমন শিম্পাঞ্জিদের আবেগ আছে, কল্পনাশক্তি আছে; ওরা টুলস ব্যবহার করতে পারে; এমনকি কথাও বলতে পারে।'

'কথা বলতে পারে?' রবিন অবাক।

মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর হেমিং, 'পারে। মানুষের মত কণ্ঠ ব্যবহার করে কথা বলতে পারে না, তবে সাইন ল্যাংগুয়েজ জানে। মানুষের মধ্যে যারা বোবা-কালা, কানে শোনে না, তারা যে ভাষায় কথা বলে, তাকে বলে সাইন ল্যাংগুয়েজ।' ডাক দিলেন তিনি, 'টপ!'

লাফ দিয়ে টায়ার থেকে নেমে চার হাত-পায়ে হেঁটে শিকের কাছে এসে দাঁড়াল একটা শিম্পাঞ্জি। দুই হাত আর দশ আঙুলের সাহায্যে দ্রুত কিছু সঙ্কেত দিলেন ডক্টর হেমিং। বড় বড় বাদামী চোখ মেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল শিম্পাঞ্জিটা।

'আমি ওকে তোমাদের কথা বললাম,' দুই গোয়েন্দাকে জানালেন ডক্টর হেমিং। 'ব ়াম, তোমরা চিড়িয়াখানার বন্ধু। ওরা বোঝে। চিড়িয়াখানার জন্যে যারা টাকা-পয়সা সাহায্য করে তাদেরকে বন্ধু জানে ওরা। টাকা-পয়সা জিনিসটা কি, ঠিক বোঝে না, তবে এটা বোঝে টাকা জিনিসটা চিড়িয়াখানার জন্যে জরুরী।'

ডক্টর হেমিঙের মত করে টপও হাতের সাহায্যে সঙ্কেত দিল। ওর কালো কালো আঙুলগুলোকে পুরোপুরি মানুষের মত করেই ব্যবহার করল।

'কি বলল?' জানতে চাইল কিশোর।

'ও বলল, চিড়িয়াখানার বন্ধুদের আমার পছন্দ হয়েছে,' দোভাষীর কাজ চালালেন ডক্টর হেমিং।

শিকের ভেতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল টপ। হাতের তালু চিত করা। কিছু চাইছে মনে হলো।

'টাকা চায় না তো?' হেসে উঠল রবিন।

এক পকেট উল্টে দেখাল, টাকা নেই। মানুষের মত কাঁধ ঝাঁকাল টপ। হাতটা সামান্য পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার বাড়িয়ে দিল, হাত মেলানোর ভঙ্গি। হাসিমুখে এগিয়ে গেল রবিন।

'ওর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে যেয়ো না,' সাবধান করে দিলেন ডক্টর হেমিং।

থমকে দাঁড়াল রবিন, 'কেন?'

'ইচ্ছে করলে ও তোমার হাত ভেঙে দিতে পারে। মানুষের চেয়ে অনেক বেশি শক্তি শিম্পাঞ্জির হাতে। ওদের সঙ্গে খেলাটাও মানুষের জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। দেখতে ছোট হলে কি হবে, মানুষকে জখম তো বটেই, মেরেও ফেলতে পারে অনায়াসে।'

আঙুল তুলে কি যেন সঙ্কেত দিল টপ।

'কি বলল?' জানতে চাইল রবিন।

'বলল, টপ মানুষকে জখম করে না,' অনুবাদ করে শোনালেন ডক্টর হেমিং। 'মানুষের ভাষাও বুঝতে শুরু করেছে ওরা। অসম্ভব বুদ্ধিমান। যে কোন জিনিস খুব দ্রুত ধরে ফেলে।...বিশ্বাস করতে পারছ না তো?'

হেলেদুলে আলমারিটার কাছে চলে গেল টপ। লম্বা এক টুকরো কাঠ বের করল। ববি গিয়ে একটা হাতুড়ি আর এক বাক্স পেরেক বের করল। টপ কাঠটা শক্ত করে ধরে রাখল, আর ববি তাতে পেরেক ঠুকতে লাগল। রবিন অবাক। গাছেই বসে রইল বেবি জুপিটার। আনন্দে হাততালি দিতে লাগল।

'শেখালে তো বাড়ি বানিয়ে ফেলবে,' রবিন বলল।

'হয়তো,' হাসলেন ডক্টর হেমিং।

এতই মজা পাচ্ছে কিশোর, সারাদিন এখানে থাকলেও বিন্দুমাত্র বিরক্ত হবে না। কিন্তু এত সময় নেই। যে কাজ করতে এসেছে, সেটা সারা দরকার। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার গবেষণার টাকা কোত্থেকে আসে?'

'চিড়িয়াখানাই দেয়,' হেমিং বললেন। এক টুকরো কালো মেঘ যেন ঢেকে দিল তাঁর মুখ। 'আমাকে তানজানিয়ায় পাঠানোর কথা ছিল, সরেজমিনে গবেষণা করার জন্যে। তানজানিয়া আফ্রিকার দেশ, জানো নিশ্চয়, সারা পৃথিবীতে শিম্পাঞ্জির সংখ্যা ওখানে সবচেয়ে বেশি। কিন্তু হঠাৎ করেই আমার যাওয়াটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

রবিন লক্ষ করল, কাজ থামিয়ে কথা শুনছে শিম্পাঞ্জিগুলো।

'কে বন্ধ করল?' নিরাসক্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল কিশোর, যেন কথার কথা, আগ্রহ নেই তার।

'চিড়িয়াখানার ট্রাস্টি বোর্ড,' তিক্তকণ্ঠে জবাব দিলেন ডক্টর হেমিং। 'আমার জন্যে বরাদ্দ করা টাকা নিয়ে ওরা চিড়িয়াখানার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকান জঙ্গল সৃষ্টির প্ল্যান করেছে।'

শিম্পাঞ্জিগুলোর দিকে তাকাল রবিন। যতই দেখছে, ততই অবাক হচ্ছে। ডক্টর হেমিঙের মেজাজের পরিবর্তনটাও যেন টের পেয়ে গেছে ওগুলো। তাঁর রাগত কণ্ঠ শুনে ঠোঁট টেনে দাঁত বের করে ওহ্-ওহ্-ওহ্ করছে।

'রেইনফরেস্ট বানানোয় আমার আপত্তি নেই,' হেমিং বললেন। 'কিন্তু আমার টাকা কেড়ে নিয়ে কেন? দুবছর ধরে অপেক্ষা করছি টাকা পাওয়ার জন্যে। যখন পেলাম, ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এখন আবার কতদিন অপেক্ষা করতে হবে কে জানে। শুধু কি তাই। আমার একজন সহকারীকেও বিদেয় করে দেয়া হচ্ছে, খরচ কমানোর জন্যে। আফ্রিকায় যাবার টাকা অন্য কোনখান থেকে জোগাড় করতে বলেছে আমাকে। কিন্তু টাকা কি গাছে ধরে, যে চাইলেই পাওয়া যাবে।'

হুড়মুড় করে গিয়ে গাছে উঠে পড়ল টপ আর ববি, বেবি জুপিটারের পাশে। ইহ্-ইহ্-ইহ্ করে তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ছে।

'আমার প্রতি ভীষণ অন্যায় করেছে ওরা,' শিম্পাঞ্জিগুলোর সঙ্গে গলা মিলিয়েই যেন চিৎকার করে উঠলেন ডক্টর হেমিং। 'অথচ রেইনফরেস্ট বানানোর চেয়ে গবেষণাটা অনেক বেশি জরুরী ছিল। মানুষের সঙ্গে শিম্পাঞ্জির সম্পর্ক!...মস্ত বোকামি করেছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ।'

গাছের ডালে দোল খেতে খেতে তীক্ষ্ণ চিৎকার শুরু করল শিম্পাঞ্জিগুলো। বিকট ভঙ্গিতে মুখব্যাদান করে করে দাঁত দেখাতে লাগল। রবিন বুঝতে পারল, এটা ওদের রাগের বহিঃপ্রকাশ।

'কি হলো?' শঙ্কিত দৃষ্টিতে শিম্পাঞ্জিগুলোর দিকে তাকাল কিশোর।

'আমাকে রেগে যেতে দেখলে ওরাও রেগে যায়,' ডক্টর হেমিং বললেন।

ঘরের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দ। কথা শুনতেই কষ্ট হচ্ছে। দুই হাতে কান চেপে বলে উঠল রবিন, 'উফ্, ভয়ানক শব্দ!'

'অ্যাই, চুপ!' শিম্পাঞ্জিগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন ডক্টর হেমিং।

মুহূর্তে নীরব হয়ে গেল ওগুলো। এক হাতে গাছের ডালে ঝুলে থেকে তাকিয়ে

রইল ডক্টরের দিকে।

'টিভি দেখলে কেমন হয়?' ওদের জিজ্ঞেস করলেন হেমিং। অনেকটা শান্ত। একটা রিমোট কন্ট্রোল তুলে নিয়ে টেলিভিশনের দিকে তাক করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ডাল ছেড়ে দিয়ে ঝুপঝুপ করে মাটিতে নেমে এল শিম্পাঞ্জিগুলো। টেলিভিশনের সামনে গিয়ে বসল। বাচ্চা ছেলের মত গালে হাত দিয়ে বসল বেবি জুপিটার। পর্দায় ছবি ফুটেছে। তিনটেই তাকিয়ে আছে সেদিকে।

'ওদের প্রিয় সিরিজ,' হেসে বললেন ডক্টর হেমিং, 'ডেজ অভ ডেসটিনি।'

'হাই, ডক্টর হেমিং,' ঘরে ঢুকল সিকিউরিটির ইউনিফর্ম পরা এক যুবক। বয়েস তেইশ-চব্বিশ। লাল চুল ওয়্যার-রিমড চশমা। 'বিকেলের শিফট শুরু হওয়ার আগেই আমার দোস্তদের সঙ্গে দেখা করতে এলাম। ও, ডেজ অভ ডেসটিনি শুরু হয়ে গেছে।'

'কেমন আছ, ড্যানি?' ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেলেন ডক্টর হেমিং।

শিম্পাঞ্জিগুলোকে দেখছে কিশোর আর রবিন। দিন-দুনিয়া ভুলে টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে আছে ওগুলো। পর্দার সঙ্গে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে যেন চোখ।

'মানুষের সঙ্গে তো এখানেই দেখছি সবচেয়ে বেশি মিল,' হাসতে হাসতে বলল রবিন। 'বেকার বসে টেলিভিশন দেখা, আর পটেটো চীপস খাওয়া।'

মিনিটখানেক পর হেমিংকে ধন্যবাদ জানিয়ে, টপ, ববি আর বেবি জুপিটারের বিচিত্র জগৎ ছেড়ে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।

'কি বুঝলে?' করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে রবিনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'এমনিতে তো খুবই নরম মনের মানুষ বলে মনে হলো,' রবিন বলল। 'তবে রাগও আছে। কর্তৃপক্ষের ওপর রাগ করে জন্তু-জানোয়ার ছেড়ে চিড়িয়াখানার বদনাম করে দিতে চাইলে অবাক হব না। সন্দেহের তালিকায় রাখা যেতে পারে।'

একমত হলো কিশোর। কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। পেছনে কারও উপস্থিতি টের পেয়েছে। কেউ যেন আড়িপেতে শুনছে। পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

বিশাল এক গরিলা খাঁচার শিকে কপাল ঠেকিয়ে ওদের দেখছে। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল কিশোর। শিম্পাঞ্জিগুলো মানুষের কথা বোঝে; গরিলাও বোঝে না তো? বুঝলে হয়তো সাইন ল্যাংগুয়েজে জানিয়ে দেবে ডক্টর হেমিংকে–দুটো ছেলে তাঁর সমালোচনা করছিল।

'এই বানরের রাজ্য থেকে বেরোনো দরকার,' সহসা অস্থির হয়ে উঠল রবিন।

'হ্যাঁ, চলো,' ঘড়ি দেখল কিশোর। 'চিড়িয়াখানা বন্ধের সময় হয়ে গেছে।'

পাঁচ

পরদিন সকাল দশটায় আবার চিড়িয়াখানায় এসে হাজির হলো রবিন ও কিশোর।

প্রথম থামল তুষার চিতার বাড়ির কাছে। প্রিন্সেস চন্দ্রাবতীর সঙ্গে বসে থাকতে

দেখল মুসাকে। রাজকুমারীর পরনে আজ শাড়ি নেই; নীল জিনস আর টি-শার্ট।

'হাই, মুসা,' ডাক দিল কিশোর। এগিয়ে গেল ওদের দিকে।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। 'ওই যে, এসে গেছে!'

মুখ তুলে তাকাল রাজকুমারী। কাঁদছে।

অবাক হলো রবিন আর কিশোর দুজনেই।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

মুসাকেও বিষণ্ন লাগছে। অস্থির। জানাল, 'সাংঘাতিক কাণ্ড। কান্তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

ভুরু কুঁচকাল রবিন। 'খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মানে? কোথায় গেল?'

'ওই যে পাথর দেখছ?' ঘেরের পেছনে গুনাইটের তৈরি কৃত্রিম পাথরগুলো দেখাল মুসা। 'ওখানে একটা দরজা দিয়ে অন্যপাশের খোঁয়াড়ে যাওয়া যায়। চিতাটা রাত কাটায় ওখানে। আজ সকালে কীপার খাবার দিতে গিয়ে দেখে খোঁয়াড় খালি। নিজে নিজে বেরোনো সম্ভব ছিল না চিতাটার পক্ষে। চিড়িয়াখানার কোনখানে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'তারমানে চুরিই হয়ে গেছে,' কিশোর বলল।

'খুঁজে বের করতে হবে ওকে,' চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল চন্দ্রাবতী। 'যে করেই হোক, করতেই হবে।'

'করব,' রাজকুমারীর কাঁধে আলতো চাপড় দিয়ে সান্ত্বনা দিল মুসা। কিশোর আর রবিনের দিকে ফিরে বলল, 'বোম্যানকে অফিসে পাওয়া যাবে। তিনি আরও বিস্তারিত বলতে পারবেন।'

'চলো,' হাঁটতে শুরু করল রবিন।

'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও,' কিশোর বলল। 'আমিও আসছি।'

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বিল্ডিঙের দিকে চলল দুজনে।

টেলিফোনে কথা বলছেন চিড়িয়াখানার পরিচালক। দুই গোয়েন্দাকে বসতে ইশারা করলেন।

বড় একটা সেগুন কাঠের টেবিলের অন্যপাশে বসে, দেয়ালে চোখ বোলাতে লাগল রবিন। দেয়াল জুড়ে টানানো রয়েছে নানা রকম জন্তু-জানোয়ারের ছবি। বোঝা যায় সত্যিকারের জন্তু প্রেমিক মিস্টার বোম্যান। ছবিগুলোর সঙ্গে কয়েকটা বিচিত্র জিনিস রয়েছে। আফ্রিকান উপজাতিদের বিভিন্ন ধরনের মুখোশ।

'দেখুন,' ফোনে বলছেন বোম্যান, 'আর কোন তথ্য আমি দিতে পারব না আপনাকে।...কেন পারব না, সেটা তো কোন কথা হলো না। আর কিছু জানা নেই আমার, সেজন্যে পারব না।' রিসিভারটা রেখে দিলেন তিনি। দুই গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পত্রিকা।' শব্দ করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

'কান্তার কথা শুনে এলাম,' কিশোর বলল। 'কি হয়েছে বলে মনে হয় আপনার?'

বোম্যান জবাব দেয়ার আগেই ঘরে ঢুকল সেই তরুণ সিকিউরিটি অফিসার, আগের দিন যাকে ডক্টর হেমিঙের অফিসে দেখেছিল কিশোর আর রবিন।

'এই যে, রিপোর্ট,' বোম্যানের টেবিলে কয়েক পাতা কাগজ রাখল সে।

'আমার যা যা মাথায় এসেছে, সব লিখে দিয়েছি।'

'কিশোর, রবিন,' পরিচয় করিয়ে দিলেন বোম্যান। 'ও ড্যানি হাওয়ার্ড। আমাদের নাইট সিকিউরিটিম্যান।'

হাত নাড়ল গার্ড। 'কাল তোমাদেরকে ডক্টর হেমিঙের অফিসে দেখেছি না?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'অঘটনগুলো কি করে ঘটল,' বোম্যান বললেন, 'জানতে আমাকে সাহায্য করছে ওরা।'

চট করে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। সে আশা করেছিল, ওদের পরিচয় সবার কাছ থেকে গোপন রাখবেন বোম্যান।

'শুনে খুশি হলাম,' হাই ঢাকার জন্যে মুখে হাত চাপা দিল ড্যানি। 'সরি। সতেরো ঘণ্টা ডিউটিতে আছি, শরীর আর চলছে না।'

'ড্যানি, কাল রাতে কি ঘটেছিল এদের বলবে, প্লীজ?' দুই গোয়েন্দাকে দেখালেন বোম্যান।

'নিশ্চয়,' চোখ থেকে চশমা খুলে নিল ড্যানি, কাঁচ পরিষ্কারের জন্যে। 'রাত, এই একটার দিকে, অ্যাভিয়ারির অ্যালার্ম বেজে উঠতে শুনল একজন গার্ড। দৌড়ে গেলাম আমরা কয়েকজন। দেখি, কাঁচের ছাতে কে যেন কতগুলো ফোকর করে রেখেছে। পালিয়ে যাচ্ছে পাখিরা। যত তাড়াতাড়ি পারলাম, বন্ধ করে দিলাম। গার্ড ছিলাম আমরা ছয়জন। সবাই মিলে বেরিয়ে যাওয়া পাখিগুলো ধরার চেষ্টা করতে লাগলাম। রাত দুটোয় আমাদের ডিউটি শেষ। তারপরেও রয়ে গেলাম। যাই হোক, ভাগ্য ভাল বেশির ভাগ পাখি আবার ধরে ফেলতে পেরেছি।'

'আর তুষার চিতার ব্যাপারটা কি?' জানতে চাইল রবিন।

'আজ সকালে একজন কীপার গিয়েছিল চিতাটাকে খাবার দিতে,' ড্যানি বলল। 'দেখে ওটা নেই। অথচ খোঁয়াড়ে তালা দেয়াই ছিল।'

'তারমানে খাঁচা ভেঙে পালাতে পারেনি,' কিশোর বলল।

'অ্যালার্ম বেজেছিল?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল ড্যানি, 'হয়তো বেজেছিল। কিন্তু পাখি ধরায় এত ব্যস্ত ছিলাম আমরা, শুনতে পাইনি। দশ মিনিট বেজে আপনাআপনি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অ্যালার্ম।'

'চিড়িয়াখানার বেড়া এক জায়গায় কাটা ছিল,' বোম্যান জানালেন। 'চোর সম্ভবত ওই পথেই ঢুকেছিল। বেরিয়েছেও ওদিক দিয়েই।'

'সত্যি খুব খারাপ লাগছে, বস্,' লজ্জিত কণ্ঠে ড্যানি বলল। 'আরও সাবধান থাকা উচিত ছিল আমাদের।'

শ্রাগ করলেন বোম্যান। 'চিড়িয়াখানার মস্ত ক্ষতি হয়ে গেল। বদনামের কথা তো বাদই দিলাম। তবে গার্ডদের দোষ দিতে পারছি না। ওরা পাখি ধরতে ব্যস্ত, এই সুযোগে চিতাটাকে বের করে নিয়ে গেছে। ওদের জানার কথা নয় যে এ রকম কিছু ঘটবে। কাজটা করা হয়েছে ভালমত প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর ড্যানি বলল, 'আমি এখন যাই। না শুয়ে আর পারব না।'

বেরিয়ে গেল সে।

বোম্যান বললেন, 'সারা সকাল চিড়িয়াখানায় সূত্র খুঁজে বেড়িয়েছে পুলিশ। কিন্তু কোনই হদিস করতে পারেনি। ভীষণ সতর্ক চোর।'

'কাল রাতের ঘটনাটা মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল, 'চিড়িয়াখানায় ঘটে যাওয়া অন্য ঘটনাগুলোর চেয়ে ভিন্ন। আগেরগুলো ছিল স্যাবটাজ, কাল রাতেরটা চুরি। একই লোকের কাজ হতে পারে সবগুলো। আবার আলাদা কারও হতে পারে।'

'হ্যাঁ, তা পারে,' রবিন বলল।

'রিচার্ড, মিনিটখানেক সময় হবে আপনার?' ডেকে জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠ।

ফিরে তাকাল রবিন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন ভাগ্যবান কোটিপতি উইলিয়াম এ· বেরিংটন। আজ পরেছেন অন্য একটা সাফারি শার্ট।

'আরে, উইলিয়াম।' হাত নেড়ে ডাকলেন বোম্যান, 'আসুন, আসুন।'

'কাল রাতে দ্বীপে যাইনি আমি, শহরেই থেকে গিয়েছিলাম,' বেরিংটন জানালেন। 'রেডিওতে শুনলাম খবরটা। শুনেই দৌড়ে এসেছি। ভাবলাম, একবার দেখা করেই যাই।'

'ভাল করেছেন।' গোয়েন্দাদের সঙ্গে বেরিংটনের পরিচয় করিয়ে দিলেন বোম্যান। চিড়িয়াখানার অঘটনগুলো নিয়ে তদন্ত করছে কিশোররা, এ কথা চেপে গেলেন। খুশি হলো কিশোর। যত কম লোকে জানবে, তত ভাল।

তুষার চিতার প্রসঙ্গ উঠল।

'বিপন্ন প্রজাতির মধ্যে পড়ে তুষার চিতা, তাই না?' জানতে চাইল রবিন।

'হ্যাঁ,' বোম্যান বললেন। 'জানামতে পৃথিবীতে এখন চার হাজার তুষার চিতা আছে।'

'আচ্ছা,' কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'বিপন্ন প্রজাতি বলতে আসলে কি বোঝায়?'

'বর্তমানে পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ প্রাণী বিলুপ্ত হতে চলেছে,' বেরিংটন বললেন। 'বাঘ, গণ্ডার, গরিলা বিপন্ন প্রজাতির মধ্যে পড়ে। কোন প্রজাতির সংখ্যা অতিরিক্ত কমে গেলে তাদেরকে বিপন্ন প্রাণী ঘোষণা করা হয়। তখন তাদের শিকার করা, তাদের মেরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে ব্যবসা করা বেআইনী। পৃথিবীর অনেক দেশ এক চুক্তিপত্রে সই করেছে, আইনের জোর বাড়ানোর জন্যে।'

'আধুনিক চিড়িয়াখানার মূল উদ্দেশ্য হলো,' বোম্যান জানালেন, 'বিপন্ন প্রাণীকুলকে তুলে এনে প্রজননের সুযোগ দিয়ে তাদের বংশ বৃদ্ধি করা, তাদের রক্ষা করা; সতর্ক দৃষ্টি রাখা, কোনমতেই যেন পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে না পারে। এ কারণেই উইলিয়ামের চিতাটাকে নিয়ে প্রজনন করানোর জন্যে এতটা উত্তেজিত হয়ে ছিলাম আমরা।'

'ব্যক্তিগতভাবে বিপন্ন প্রাণী পোষা কি বেআইনী?' বেরিংটনের কাছে জানতে চাইল কিশোর।

'স্পেশাল পারমিট থাকলে পোষা যায়,' বেরিংটন জবাব দিলেন। 'লাইসেন্সধারী একজন জানোয়ার বিক্রেতার কাছ থেকে আমার চিতাটা কিনেছি আমি। কাগজপত্র সব ঠিক আছে আমার। তবে আমি পেলেও খুব কম লোকই এই সুবিধা পেয়ে থাকে।'

'তারমানে, বোঝা যাচ্ছে, কারও পক্ষে একটা বিপন্ন প্রাণী কিনে রাখা খুব কঠিন কাজ,' কিশোর বলল।

'খুব কঠিন,' বোম্যান বললেন।

এ সব প্রশ্নের মাধ্যমে কোন দিকে এগিয়ে চলেছে কিশোর, বুঝতে পারল না রবিন। তবে পরের প্রশ্নটা শুনেই বুঝে ফেলল।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'বিপন্ন প্রাণীদের কি ব্ল্যাক মার্কেট আছে?'

'আছে,' মাথা ঝাঁকালেন বেরিংটন। 'অনেক ধরনের চোরাই বাজার আছে। কিছু প্রাণী বিক্রি হয় পোষা প্রাণী হিসেবে। কিছু প্রাণীকে মেরে ফেলা হয় চামড়ার জন্যে। কোট বানানো হয়। তুষার চিতার চামড়ায় তৈরি একটা কোটের দাম এখনকার বাজারে কম করে হলেও ষাট হাজার ডলার হবে। কিছু কিছু বিশেষ প্রাণীর জন্যে আলাদা মার্কেট আছে। যেমন অ্যালিগেটরের চামড়ার জন্যে আলাদা মার্কেট, গণ্ডারের শিঙের জন্যে আলাদা, হাতির দাঁতের জন্যে আলাদা। এক মার্কেটে সাধারণত অন্যটা পাওয়া যায় না। চোরা-ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত সতর্ক।'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বোম্যান বললেন, 'আরও নানা ভাবে প্রাণী নিয়ে ব্যবসা করে লোকে। টেক্সাসে বড় বড় র‍্যাঞ্চ আছে, শিকার করতে সাহায্য করে ওরা। কায়দা করে বিপন্ন প্রাণীকেও ঠেলে দেয় শিকারীর বন্দুকের সামনে। শিকারীকে শিকার করা প্রাণীর মাথাটা দিয়ে দেয়া হয় ট্রফি হিসেবে।'

'টাকা রোজগারের জন্যে কত ধান্দাই না করে লোকে!' বেরিংটন বললেন আক্ষেপ করে।

'তারমানে,' একবার বেরিংটনের দিকে, আবার বোম্যানের দিকে তাকাতে তাকাতে বলল কিশোর, 'অনেক কারণেই চুরি করা হতে পারে কান্তাকে। পোষার জন্যে, চামড়ার জন্যে, কিংবা শিকারীকে দুর্লভ প্রাণী শিকারের আনন্দ দেয়ার জন্যে।'

'পোষার জন্যে নিলেও মারা পড়বে চিতাটা,' বোম্যান বললেন। 'বাঁচাতে পারবে না।'

সতর্ক হয়ে উঠলেন বেরিংটন, 'কেন?'

'চিড়িয়াখানায় আনার পর শুরুতে কোনমতেই খাওয়ানো যায়নি ওকে। চন্দ্রাবতীর জন্যে কাতর হয়ে থাকত। তারপর বুদ্ধি করে রাজকুমারীর শাড়ির একটা টুকরো দেয়া হলো তাকে। পরিচিত গন্ধ পাওয়ার পর অস্থিরতা কিছুটা কমল ওর। ভাবল, কাছাকাছিই আছে চন্দ্রাবতী।...সেজন্যেই বলছি, পোষার জন্যে নিয়ে যাওয়া হলেও না খেয়েই মারা যাবে কান্তা।'

অস্বস্তি বোধ করতে লাগল রবিন। খিদেয় কাহিল হয়ে চিতাটা মরে যাওয়ার আগেই ওটাকে খুঁজে বের করার তাগিদ অনুভব করল।

'যাকগে,' নড়েচড়ে উঠলেন বোম্যান। 'পুলিশকে জানানো হয়েছে। যা করার ওরাই করবে।'

আলোচনা এখানেই শেষ, বুঝতে পেরে উঠে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা।

ছয়

বেরিংটন, কিশোর আর রবিন একসঙ্গে বেরোল বোম্যানের অফিস থেকে।

রবিনের মনে পড়ল, বেরিংটন বলেছিলেন, তিনি একটা দ্বীপের মালিক। সেখানে তাঁর একটা ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা আছে। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার চিড়িয়াখানায় কতগুলো জানোয়ার আছে?'

'তিরিশটার মত,' বেরিংটন জানালেন।

'দ্বীপের মালিক, ভাবতেই কেমন লাগে,' কিশোর বলল। 'দ্বীপটা নিশ্চয় খুব সুন্দর?'

'হ্যাঁ,' হাসলেন বেরিংটন। 'আমার দাদার বাবা কিনেছিলেন এটা। মস্ত ধনী ছিলেন। তখন ওটার নাম ছিল পারকার আইল্যান্ড, এখন জু আইল্যান্ড। সাগরের উপকূল থেকে উত্তরে চল্লিশ মাইল দূরে। ওখানে বেশ সুখেই থাকি আমি। নিজের ব্যক্তিগত রাজত্ব।'

কয়েক মিনিট ওদের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে এসে 'গুডবাই' জানিয়ে চলে গেলেন বেরিংটন।

'ভাবতে পারো,' রবিন বলল, 'ঘর থেকে বেরোলেই এতগুলো বুনো প্রাণীর সাক্ষাৎ! দ্বীপটা দেখার জন্যে পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি।'

'কিন্তু তোমাকে তো দাওয়াত দিল না,' কিশোর বলল।

মুসা আর চন্দ্রাবতীকে আসতে দেখা গেল। অনেকটা শান্ত এখন রাজকুমারী। বড় বড় কালো চোখে বিষণ্নতা।

'নতুন কিছু জানা গেল?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'নাহ্,' রবিন বলল।

আরও বিষণ্ন হয়ে গেল চন্দ্রাবতী। সে আশা করেছিল, কান্তার খবর পাবে। বলল, 'মুসা আমাকে বলেছে, কান্তাকে তোমরা খুঁজে বের করবেই।'

'আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা আমরা করব,' জবাব দিল কিশোর।

চোখ তুলে দূরের মনোরেলটার দিকে তাকাল সে। হঠাৎ চোখে পড়ল, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সেই রহস্যময় ছেলেটা। আজও মনে হলো চন্দ্রাবতীর দিকেই নজর।

'চন্দ্রাবতী,' নিচু স্বরে বলল কিশোর, 'তোমার পেছনে একটা ছেলে। দেখো তো, চেনো নাকি?'

বুদ্ধি আছে রাজকুমারীর। সরাসরি তাকাল না। নিচু হলো জুতোর ফিতে বাঁধার ছুতো করে। মুখ তোলার সময় দেখে নিল ছেলেটাকে। বিস্মিত শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

'কে ছেলেটা?' জানতে চাইল রবিন।

'চলো, এখান থেকে সরে যাই,' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল চন্দ্রাবতী। আর

দাঁড়াল না, হাঁটতে শুরু করল।
পিছু নিল অবাক তিন গোয়েন্দা।
'কি ব্যাপার?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল মুসা।
'এখনও শিওর না।'
ফিরে তাকাল কিশোর। দেখল, পেছন পেছন আসছে ছেলেটা।
ঘের দেয়া একটা তৃণভূমির পাশ দিয়ে হেঁটে চলল ওরা। ভেতরে আমেরিকার ওল্ড ওয়েস্টের দৃশ্য। বিরাট একটা বাইসন খেতে খেতে মুখ তুলে তাকাল ওদের দিকে।
ফিরে তাকিয়ে কিশোর দেখল, ছেলেটা এখনও আসছে ওদের পিছে পিছে। 'অনুসরণ করছে, কোন সন্দেহ নেই আর এখন।' এদিক ওদিক তাকাল। 'ওকে ফাঁকি দেয়ার ব্যবস্থা কি?'
'এসো আমার সঙ্গে,' বলে আগে আগে হাঁটতে লাগল মুসা।
কালো একটা বিল্ডিঙের সামনে চলে এল ওরা। বাড়িটার চূড়ায় একটা নকল চাঁদ বসানো। দরজার দিকে এগোল মুসা। 'এসো, ঢুকে পড়ি। ওকে লেজ থেকে খসাতে আর অসুবিধে হবে না।'
রাজকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে পড়ল তিনজনে। দিনের বেলাতেও এখানে ঘন অন্ধকার। রাতের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। পথ দেখানোর জন্যে রয়েছে খুদে খুদে কিছু লাল আলো।
'এটার নাম নাইট ওয়ার্ল্ড,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'নিশাচর প্রাণী রাখে এখানে। দিনের বেলা যারা ঘুমায়, রাতে জেগে ওঠে।'
'দারুণ বানিয়েছে যাই বলো,' প্রশংসা না করে পারল না রবিন। লাল আলোয় লেখা সাইনবোর্ড দেখা গেল। কোন্ জায়গায় কোন্ জানোয়ার আছে বোঝানোর জন্যে। 'দেখে আসি,' বলে পা বাড়াল সে।
'আউক!' করে উঠল কিশোর। 'দিলে তো আমার পা মাড়িয়ে!'
'সরি, দেখতে পাইনি! অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসেনি এখনও।'
কয়েক মিনিট পর আঁকাবাঁকা একটা করিডর ধরে এগোল দলটা। ওরা বাদে আরও দর্শক আছে। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফিসফিস করে কথা বলছে ওরা, যেন ঘুমন্ত জানোয়ারগুলোর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়ার ভয়ে।
একটু পর পরই পেছনে ফিরে তাকাচ্ছে কিশোর, ছেলেটা আসছে কিনা দেখার জন্যে। ও কে, জানা দরকার। চন্দ্রাবতী বলতে পারবে। কিন্তু তাকে প্রশ্ন করার সময় এখন নয়। জিজ্ঞেস করলে বলবে কিনা, সেটাও প্রশ্ন। বোঝা যাচ্ছে, ছেলেটার পরিচয় গোপন রাখতে চাইছে সে।
বড় একটা আয়তাকার কাঁচের ওপাশে, মৃদু ভুতুড়ে আলোয় তৈরি করা হয়েছে জঙ্গলের পরিবেশ। কৃত্রিম ডোবার পাড়ে ছোট একটা অ্যালিগেটরের মূর্তি ফেলে রাখা হয়েছে। ওপরে পাকানো দড়ির মত দেখতে গাছের ডাল থেকে মাথা নিচু করে নিথর ঝুলে আছে কয়েকটা রোমশ প্রাণী।
'কি ওগুলো?' জানতে চাইল চন্দ্রাবতী। 'ইঁদুর নাকি?'
'না, বাদুড়,' জবাব দিল মুসা।

যেন নিজেদের সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে বুঝতে পেরেই জ্যান্ত হয়ে উঠল একটা বাদুড়। ডাল আঁকড়ে ধরা নখগুলো খুলে নিয়ে ছেড়ে দিল নিজেকে। পতন শুরু হতেই নিখুঁত ভঙ্গিতে ছাতার কাপড়ের মত ডানা মেলে ভেসে পড়ল শূন্যে। দেখাদেখি বাকি বাদুড়গুলোও জেগে গেল। ডানা ঝাপটে, ডিগবাজি খেয়ে, খেপার মত উড়ে বেড়াতে লাগল কাঁচের দেয়াল ঘেরা বদ্ধ আকাশে।

'বাপরে! কি সাংঘাতিক!' কেঁপে উঠল চন্দ্রাবতী। দৃশ্যটা সহ্য করতে পারছে না।

'ফ্রুটব্যাট,' মুসা বলল। 'ফল খায়।'

'শুধু ফল না,' রবিন বলল, 'পোকামাকড়ও খায়। নামে ফ্রুটব্যাট।'

ফিরে তাকাল আবার কিশোর। রহস্যময় ছেলেটাকে দেখতে পেল না। খসানো গেছে মনে হচ্ছে।

বাদুড় দেখা শেষ হলে মুসা বলল, 'এসো, আরেকটা জিনিস দেখাই।'

দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে আগে আগে পথ দেখিয়ে আরেকটা জানালার কাছে নিয়ে এল মুসা। ওটার ভেতরেও বাদুড় উড়ছে। তবে আগেরগুলোর চেয়ে আলাদা।

'অ,' বলে উঠল রবিন, 'ভ্যাম্পায়ার ব্যাট!'

রক্তচোষা এই বাদুড়ের সঙ্গে ভালমত পরিচয় আছে ওদের। আমাজানের জঙ্গলে জন্তু-জানোয়ার ধরতে গিয়ে এই বাদুড়ও ধরে এনেছিল। যে কোন বাদুড়-বিশেষজ্ঞের চেয়ে এদের স্বভাব কম জানে না ওরা।

'ভয় লাগছে, রাজকুমারী?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

জবাব নেই।

'রাজকুমারী!' গলা চড়াল মুসা।

ফিরে তাকাল কিশোর। রাজকুমারী নেই। গেল কোথায়? এক মুহূর্ত আগেও তো ছিল।

রাজকুমারী কোথায় দেখার জন্যে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, কানে এল মহিলাকণ্ঠের চিৎকার।

একটা সেকেন্ডের জন্যে যেন পুরোপুরি নিথর হয়ে গেল নাইট ওয়ার্ল্ড।

পরক্ষণে শুরু হলো গুঞ্জন। দর্শকরা সব কৌতূহলী হয়ে দেখতে চাইছে কে চিৎকার করেছে।

কিশোর বোঝার চেষ্টা করছে, কোনদিক থেকে এল চিৎকারটা। রবিন তার হাত আঁকড়ে ধরল। 'রাজকুমারীর চিৎকার না? দেখা দরকার।'

'নিশ্চয় সেই রহস্যময় ছেলেটা,' কিশোর বলল।

মরিয়া হয়ে চারপাশে তাকিয়ে রাজকুমারীকে দেখার চেষ্টা করছে মুসা। নাম ধরে ডেকে উঠল, 'চন্দ্রাবতী! চন্দ্রাবতী!'

'বেশি দূরে যেতে পারেনি এখনও,' কিশোর বলল। 'ছড়িয়ে পড়ো। আমি এদিকে যাচ্ছি।'

তিনজন তিনদিকে ছড়িয়ে পড়ল ওরা। নাইট ওয়ার্ল্ডের অন্ধকার করিডর ধরে ছুটল আন্দাজে। মিনিটখানেক পর পরই রাজকুমারীর নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে

লাগল। জবাব পেল না।

কিশোরের মনে হলো, দূরের কোণে আবছামত দেখা যাচ্ছে কাকে।

'কে ওখানে!' বলেই ছুটল সেদিকে। 'চন্দ্রাবতী? তুমি?'

'না, আমি,' জবাব দিল একটা ভোঁতা, বয়স্ক কণ্ঠ। সেলুলার ফোনে কথা বলছে একজন বুড়ো ভদ্রলোক।

'সরি,' বলে করিডর ধরে এগিয়ে গেল কিশোর। কয়েকটা ডিসপ্লে কেস পার হয়ে এসে বাইরে বেরিয়ে এল। উজ্জ্বল আলোয় অন্ধ হয়ে গেল যেন। কয়েক সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে রেখে, বার কয়েক মিটমিট করে চোখে সইয়ে নিল দিনের আলো। সামনে তাকাতেই দেখতে পেল রাজকুমারীকে। একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কথা বলছে সেই রহস্যময় ছেলেটার সঙ্গে। বোঝা যাচ্ছে, তর্ক করছে।

দৌড় দিল কিশোর। ওকে দেখে কথা বন্ধ হয়ে গেল দুজনের। ঝটকা দিয়ে আরেক দিকে মুখ ঘোরাল ছেলেটা, যেন রাগ দমনের চেষ্টা করছে।

'ঠিক আছ তো তুমি?' রাজকুমারীকে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'চিৎকার শুনলাম...'

'আমি ভালই আছি,' অস্বস্তির ভঙ্গিতে চুলের মধ্যে তার আঙুল চালানো দেখেই বোঝা গেল, সত্যি বলছে না চন্দ্রাবতী।

রবিন আর মুসাও বেরিয়ে, দৌড়ে এল ওদের দিকে।

'কি ব্যাপার?' এসেই প্রশ্ন শুরু করল মুসা। 'এই লোকটা কে? কি হচ্ছে?'

গাঢ় বাদামী চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে মুসাকে দেখতে লাগল ছেলেটা। রাজকুমারীকে বলল, 'আপাতত তোমার নতুন বন্ধুদের কাছে ফেলে যাচ্ছি। কিন্তু, ইয়োর হাইনেস, আমি হাল ছাড়ব না, বলে রাখলাম।'

দৃঢ়কণ্ঠে কথাগুলো বলে, একবারও পেছনে না তাকিয়ে, গটমট করে হেঁটে চলে গেল রহস্যময় ছেলেটা।

'ও কে, চন্দ্রাবতী?' জানতে চাইল রবিন।

'আমার দেশের লোক,' কর্কশ কণ্ঠে বলল রাজকুমারী। 'আমার মতই আমেরিকায় পড়তে এসেছে।'

ভুরু কুঁচকে মুসা জিজ্ঞেস করল, 'কি চায় ও?'

'তেমন কিছু না,' দুই হাতে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে অন্যদিকে চোখ ফেরাল চন্দ্রাবতী। 'অন্ধকারে চুপি চুপি আমার পেছনে এসে চমকে দিয়েছিল, তাই চিৎকার করে উঠেছিলাম। হাত ধরে তখন টেনে আমাকে বাইরে নিয়ে এল ও। তোমাদের বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত।'

চোখে সন্দেহ নিয়ে রাজকুমারীর দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। 'যদি তেমন কিছু না-ই হয়, ওর কাছ থেকে সরে যাওয়ার জন্যে এত অস্থির হয়ে উঠেছিলে কেন?'

কিশোরের দিকে তাকিয়েই আবার চোখ সরিয়ে নিল চন্দ্রাবতী। 'আসলে...কি বলব...ছেলেমানুষিই করে ফেলেছি।... তেমন সাংঘাতিক কিছু না...'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রসঙ্গটা বাদ দিতে হলো কিশোরকে। বুঝতে পারছে, ভেতরে আরও ব্যাপার আছে। কিন্তু রাজকুমারী যদি মুখ না খোলে, কি আর করা।

'চলো, আমাদের কাজে আমরা যাই,' রবিনকে বলল কিশোর। 'প্রথমে ওই জন্তু-প্রেমিক ওয়ালথ্রপদের ওখানে যাব। গতকাল যে পুস্তিকা দিয়েছিল আমাদের, তার মধ্যেই আছে ঠিকানা।'

'ভাল বুদ্ধি,' একমত হলো রবিন।

মুসাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে কিশোর বলল, 'দেখো, ওর কাছ থেকে ছেলেটা সম্পর্কে কোন কথা আদায় করতে পারো কিনা। ছেলেটা কি চায়, জানতে হবে। এ কেসের জন্যে জানাটা জরুরী হতে পারে।'

'দেখি চেষ্টা করে,' মুসা বলল।

মাথার ওপর দিয়ে কয়েকটা পাখি উড়ে যেতে শুনে ওপরে তাকাল রবিন। আকাশের ইতিউতি ছড়িয়ে পড়েছে কয়েক টুকরো ধূসর রঙের মেঘ। 'বৃষ্টি আসবে।' মুখ নামিয়ে কিশোরের দিকে তাকাল, 'ভিজতে না চাইলে, জলদি চলো এখান থেকে পালাই।'

সাত

ঘণ্টাখানেক বাদে শহরতলির একটা গলির মধ্যে গাড়ি ঢোকাল রবিন।

'সস্তা এলাকা,' বলল সে।

জীর্ণ, বিবর্ণ বাড়িগুলোর দিকে তাকাল কিশোর। সরু রাস্তাটারও জায়গায় জায়গায় ছাল উঠে গেছে, ছোট ছোট গর্ত। 'হুঁ। ওয়ালথ্রপদের টাকা নেই।'

গাড়ি থেকে নেমে কোণের একটা মলিন চেহারার রঙচটা বাড়ির দিকে এগোল দুজনে। সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। খাড়া একটা সিঁড়ি বেয়ে চারতলায় উঠে একটা দরজার গায়ে ওয়ালথ্রপদের নম্বর দেখতে পেল। ভেতরে রেডিওতে জোরাল শব্দে বাজছে রক মিউজিক।

দরজায় টোকা দিল কিশোর।

খুলে দিল রায়না ওয়ালথ্রপ।

'তুমি!' বিস্মিত হয়েছে সে। কিশোরকে দেখে খুশি নয়, বোঝা গেল। 'কি চাও?'

'আপনাদের পুস্তিকাটা পড়লাম,' চিৎকার করে বলতে হলো কিশোরকে, বাজনার প্রচণ্ড শব্দ কান ঝালাপালা করছে। 'আমরাও ইনটারেস্টেড...আপনাদের প্রতিষ্ঠানের যদি ভলান্টিয়ার হতে চাই, আপত্তি আছে?'

দ্বিধা করল রায়না। দরজা থেকে সরে গিয়ে বলল, 'এসো।'

এ.আর.এফ. হেডকোয়ার্টারে ঢুকল দুই গোয়েন্দা। একটা মাত্র ঘর। দুটো ডেস্ক, একটা ফাইলিং কেবিনেট আছে। সারা ঘরে ছড়িয়ে আছে কাগজ।

একটা ডেস্কের ওপাশে বসে আছে নিক। হাত নাড়ল ওদের দিকে।

'আমরা কাজে নামার আগে,' চিৎকার করে বলল কিশোর, 'অ্যানিমেল রাইটস ফোর্সের ব্যাপারে আরও কিছু তথ্য জানতে পারলে ভাল হত।'

রেডিও বন্ধ করে দিল রায়না।

'বসো,' দুটো ধাতব চেয়ার দেখাল নিক।

বসল কিশোর আর রবিন।

জ্বলন্ত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে নিক। রায়না দাঁড়িয়ে আছে ঘাড়ের ওপর। অস্বস্তি কাটাতে পারছে না। আদালতের কাঠগড়ায় জেরার মুখোমুখি হয়েছে মনে হলো রবিনের।

'পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণী কি জানো?' আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল নিক।

'সিংহ,' জবাব দিল রবিন।

মাথা নেড়ে কিশোর বলল, 'সিংহ না। আমাদের কথা বলছে।'

'ঠিক বলেছ,' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগল নিক। 'আমরা। মানুষ। হোমো স্যাপিয়েন্স। মানুষ হলো সবচেয়ে বিপজ্জনক জীব।'

'পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে,' নিকের সঙ্গে সুর মেলাল রায়না। 'কেন জানো? পৃথিবী জুড়ে গাছপালা, বন-বাদাড় সব নষ্ট করে দিয়েছে মানুষ; অসহায় এ সব প্রাণীদের থাকার জায়গা শেষ করে দিয়েছে। সমস্ত প্রাকৃতিক জিনিসপত্র সাফ করে ফেলছে, জোর করে বেশি বেশি শস্য ফলাতে বাধ্য করছে মাটিকে। যে সব প্রাণী এখনও টিকে আছে, ওগুলোকে মেরে শেষ করছে ওদের চামড়ার জন্যে; হাড়, শিং, দাঁতের জন্যে।'

'শুধু তাই নয়,' রায়নার কথা লুফে নিল নিক। 'ওদের মহা যন্ত্রণার কারণ হয়েছি আমরা। কাউকে ধরে খাচ্ছি, কাউকে জোর করে ল্যাবরেটরিতে গবেষণার কাজে লাগাচ্ছি; নিজেদের বিনোদনের জন্যে ধরে এনে সার্কাসের খেলা দেখাচ্ছি।'

'আর চিড়িয়াখানার কথা ভুললেও চলবে না,' রায়না বলল।

'কিন্তু,' প্রতিবাদ করল কিশোর, 'অন্য সব কিছুর সঙ্গে চিড়িয়াখানার তুলনা করাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। এখানে জন্তু-জানোয়ারের যত্ন করা হয়, খাবার দেয়া হয়, চিকিৎসা করা হয়—বনে যে সব ব্যবস্থা নেই। রকি বীচ চিড়িয়াখানার সমস্ত জানোয়ারকে আমার তো বেশ স্বাস্থ্যবানই মনে হয়েছে।'

'তা ছাড়া বিলুপ্ত হয়ে আসা প্রাণীদের শেষ আশ্রয় হলো চিড়িয়াখানা,' রবিন বলল। 'ওদের প্রজনন করিয়ে, বিলীন হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে চিড়িয়াখানাগুলো।'

'প্রকৃতি কোন প্রাণীকেই খাঁচায় আটকে ফেলে চিকিৎসা করতে বলেনি,' ঝাঁজাল কণ্ঠে বলল রায়না। হাতের কাছে টেবিলটাতে চাপড় মারল। 'ওদেরকে ওদের প্রাকৃতিক পরিবেশে ছেড়ে দিয়ে আসা উচিত। নিজেদের খাবার ব্যবস্থা, নিজেদের চিকিৎসা ওরা নিজেরাই করে নিতে পারবে। এটা ওদের যুগ-যুগান্তরের প্র্যাকটিস, জন্মগত অধিকার।'

'কৃত্রিম আইন তৈরি করে বাহবা নিচ্ছে মানুষ,' নিক বলল। 'একটিবারও ভাবে না, তার চেয়ে অনেক বড় আইন আছে স্রষ্টার, প্রকৃতির আইন।'

ভেবেচিন্তে পরের কথাটা বলল কিশোর, 'প্রকৃতির আইনকে প্রাধান্য দেবার জন্যে মানুষের আইন ভাঙছেন নাকি আপনারা?'

পরস্পরের দিকে তাকাল স্বামী-স্ত্রী।

'না,' জবাব দিল রায়না, 'ভাঙিনি। তবে ওই আইনের প্রতি কোন আস্থা নেই আমাদের।'

'আইন ভাঙা শুরু করলে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে ভরে দেবে,' একটা খাম তুলে নিল নিক। 'ওদের সঙ্গে পারব না। জেলে আটকে থাকলে জন্তু-জানোয়ারের পক্ষ নিয়েও কথা বলা আর হবে না। তার চেয়ে সব কিছু সহ্য করেও মুক্ত থাকাই ভাল।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওয়ালথ্রপ দম্পতির দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'আসলে আপনাদের উদ্দেশ্যটা কি, কি করতে চাইছেন?'

'যতটা সম্ভব, প্রতিবাদ চালিয়ে যাব,' রায়না বলল। দুই হাত আড়াআড়ি রাখল বুকের ওপর। 'প্রচুর চিঠিপত্র লেখালেখি করছি আমরা, টেলিফোন করছি, সচেতন করার চেষ্টা করছি মানুষকে।'

'ও,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'আমাদেরকে ভলান্টিয়ার বানালে আপনাদের কি কোন সুবিধে হবে?'

'এখনও বলতে পারছি না।' কিশোরকে দুটো বই দিল নিক। 'এগুলো ধার দিলাম, পড়ে দেখো। জন্তু-জানোয়ারের ওপর কি পরিমাণ অত্যাচার করে মানুষ, লেখা আছে। পড়ার পরও যদি আগ্রহ থাকে, ফোন কোরো আমাদের।'

রবিন কিছু বলতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে রায়না বলল, 'আমাদের যাওয়া দরকার, নিক।' ফাইলিং কেবিনেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একটা ড্রয়ার খুলে হাত ঢোকাল ভেতরে।

কিছু বলার জন্যে নিকের দিকে ফিরল রবিন।

ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল নিক। 'আমাদের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। চলো, তোমাদের এগিয়ে দিয়ে আসি।'

অফিসে তালা লাগাল নিক। রাস্তা পর্যন্ত দুই গোয়েন্দাকে এগিয়ে দিল সে আর তার স্ত্রী। গুড-বাই জানাল। তারপর দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল ব্লকের শেষ মাথায় পার্ক করা জরাজীর্ণ একটা সবুজ রঙের শেভ্রলে গাড়ির দিকে।

'পিছু নেব নাকি?' গাড়িতে উঠে রবিন বলল।

'নাহ্, এখন দরকার নেই,' কিশোর বলল। 'গাড়িটা তো চিনেই রাখলাম। পরে দেখা যাবে।'

'ওদের আইন অমান্য না করার কথাটা বিশ্বাস করতে পারলাম না। আরেকবার গিয়ে ঢুঁ মেরে এলে কেমন হয়? ওদের অবর্তমানে?'

'ঠিক এই কথাটাই ভাবছি আমি,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল কিশোর। তাকিয়ে রইল শেভ্রলেটার দিকে।

গাড়িটা না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ওরা। তারপর নেমে গিয়ে পেছনের বুট খুলে কয়েকটা যন্ত্রপাতি বের করল রবিন। রওনা হলো দুজনে। আবার উঠে এল চারতলায়, ওয়ালথ্রপদের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তালা খুলে ঢুকে পড়ল অফিসে।

ফাইলিং কেবিনেটে খুঁজতে আরম্ভ করল রবিন। ফোনটা পরীক্ষা করতে লাগল কিশোর। দ্রুত বের করে ফেলল ফোনের এনট্রি কোড। প্রয়োজনে ট্যাপ করে

ফেলে গোপনে কথাবার্তা শুনতে পারবে। তারপর ডেস্কে রাখা কাগজপত্র ঘাঁটা শুরু করল। কৌতূহল জাগানোর মত একটা জিনিসই পেল, একটা মেমো। লেখা রয়েছে: প্যাসিফিক এক্সপ্রেস্পোর্টার, সকাল সাড়ে দশটা, আগস্ট ৭। একটা কাগজে লিখে নিল কথাগুলো।

খবরের কাগজ থেকে কেটে রাখা সংবাদের একটা ফাইল বের করল রবিন। প্রতিটি খবরই জন্তু-জানোয়ারের ওপর লেখা: ল্যাবরেটরিতে গবেষণা, চিড়িয়াখানা, শিকার, চোরাশিকার এ সবের ওপর। দেখতে দেখতে অবশেষে একটা খবরের ওপর এসে চোখ আটকে গেল রবিনের। হেডলাইন করা হয়েছে: গবেষণাগারের জানোয়ার ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে দম্পতিকে সন্দেহ। দ্রুত লেখাটা পড়ে ফেলল সে। শিস দিয়ে উ ল। 'কিশোর, শোনো। বছরখানেক আগে মিসৌরির সেইন্ট লুইয়ের এক গবেষণাগার থেকে মেডিক্যাল রিসার্চের জন্যে এনে রাখা কিছু শিম্পাঞ্জি, ইঁদুর আর সাপ চুরি হয়ে যায়। কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। তবে ওয়ালথ্রপ দম্পতিকে সন্দেহ করে। কর্তৃপক্ষও কোন কারণে–তাদের গবেষণাগারের বদনাম হওয়ার ভয়েই হয়তো, চেপে যায়, গ্রেপ্তার করানোর জন্যে চাপাচাপি করেনি।'

'দেখি তো,' লেখাটা পড়ার জন্যে এগিয়ে এল কিশোর। পড়ার পর বলল, 'ওয়ালথ্রপদের তো অপরাধী প্রমাণ করতে পারেনি।'

'তবুও...'

'রবিন, নোড়ো না!' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

'কেন?' অবাক হয়ে ফাইল থেকে মুখ তুলল রবিন।

পেয়ে গেল জবাবটা। ফাইলিং কেবিনেটের ওপরে তার কব্জির কাছ থেকে কয়েক ইঞ্চি ওপরে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে একটা তিন ফুট লম্বা সাপ। সাপটার চামড়া নীল আর সবুজ রঙের, কালো কালো ডোরা।

ঢোক গিলল রবিন। 'ওয়ালথ্রপদের প্রহরী নাকি?'

'মনে হয়,' এক দৃষ্টিতে সাপটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'বিষাক্ত প্রহরী।'

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে আরম্ভ করেছে রবিনের। কত দ্রুত ছোবল মারতে পারে সাপ, জানা আছে ওর। পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে থেকে নিচু স্বরে বলল, 'সেজন্যেই বোধহয় বেরোনোর আগে কেবিনেট খুলেছিল রায়না। ড্রয়ার ফাঁক করে রেখেছিল, যাতে সময়মত বেরিয়ে আসতে পারে প্রহরীটা।'

'হ্যাঁ।...নোড়ো না।'

পাগলের মত দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে করছে রবিনের। জোর করে দমন করল ইচ্ছেটা। দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

ঘরের মধ্যে খুঁজে বেড়াতে লাগল কিশোরের চোখ।

রবিনের চোখ সাপটার ওপর স্থির।

হঠাৎ, তীব্র গতিতে রবিনের হাত লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল সাপটা।

দাঁত ফোটার তীক্ষ্ণ ব্যথার জন্যে অপেক্ষা করছিল রবিন। কিন্তু ফুটল না। খসখসে আঁশওয়ালা শীতল একটা শরীর পেঁচিয়ে যেতে শুরু করল তার হাতে।

আট

তাকিয়ে আছে কিশোর। দুচোখে আতঙ্ক।

'একদম চুপ!' রবিনকে সাবধান করল সে। 'যা করার আমি করছি!'

রবিনের হাত বেয়ে উঠতে শুরু করল সাপটা।

শান্ত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে রবিন। তাকিয়ে আছে সাপটার দিকে। লম্বা জিভটা বাতাসে কিলবিল করে নেচে উঠে আবার ভেতরে চলে গেল। কেঁপে উঠল রবিন।

'জলদি, কিশোর!' ভয়ে কথা বেরোতে চাইছে না মুখ দিয়ে।

'আসছি। তুমি নড়াচড়া কোরো না,' একটা তারের হ্যাঙ্গারকে টেনে সোজা করে সেটা নিয়ে ফিরে এল কিশোর। সাবধানে, খুব ধীরে ধীরে আঁকশির মত বাঁকা করে রাখা তারের মাথাটা সাপটার দিকে বাড়িয়ে দিল। থেমে গেল সাপটা। কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল।

'কি করছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'চুপ করে থাকো।'

আবার হাত বেয়ে উঠতে শুরু করল সাপটা। দম আটকে রাখল রবিন। সাপটার ফাঁক করে রাখা মুখটা দেখতে পাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে ভেতরের বিষদাঁত দুটো।

আচমকা বিদ্যুৎ খেলে যেন কিশোরের হাতে। আঁকশিটা ধেয়ে এল রবিনের বাহু লক্ষ্য করে। সাপের পেট ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনল রবিনের হাত থেকে। ছুঁড়ে দিল শূন্যে।

'সরো! ভাগো!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

দ্বিতীয়বার আর বলতে হলো না রবিনকে। হুড়মুড় করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। পেছনে দড়াম করে দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রবিনের মুখ। ওয়ালগ্রূপদের দরজার বাইরে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল কাঁপুনি থামানোর জন্যে।

'আমি তো ভেবেছিলাম, ওয়ালগ্রূপরা বনের জানোয়ার কখনও ঘরে ঢোকাবে না,' দুর্বল কণ্ঠে বলল সে।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'আমার তো এখন মনে হচ্ছে, সব আইন ভাঙার ব্যাপারে ওস্তাদ ওরা–মানুষেরই হোক, আর খোদারই হোক।'

'চলো, সময় থাকতে কেটে পড়ি এখান থেকে,' ভয়ে ভয়ে দরজার নিচের ফাঁকটার দিকে তাকাল সে। সাপটা বেরোনোর জন্যে যথেষ্ট ফাঁক।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল দুজনে।

কয়েক মিনিট পর গাড়ি চালাতে চালাতে একটা ফাস্ট-ফুডের দোকান দেখে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রবিন। সেলুলার ফোনে কথা বলছে কিশোর। নিকের

টেবিলে যে মেমোটা দেখেছে, সেটার ব্যাপারে।

কথা শেষ করে সুইচ অফ করে দিয়ে রবিনের দিকে তাকাল, 'প্যাসিফিক এক্সপোর্ট একটা খুদে কার্গো এয়ারলাইন, রকি বীচ এয়ারপোর্টে নতুন অফিস খুলেছে ওরা। বিচিত্র মাল বহন করে। হিমায়িত জিনিস থেকে জীবন্ত প্রাণী, সব।'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'ভেরি ইনটারেস্টিং।'

গাড়ি থেকে নেমে গেল সে। কয়েকটা বার্গার আর কিছু ফিঙ্গার চিপস কিনে নিয়ে ফিরে এল।

'ওয়ালথ্রপদের বক্তব্য,' একটা বার্গারে কামড় বসাল কিশোর, 'তারা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। ভাল কথা। অন্য কার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে, জানি না, তবে আমাদের যে পেরেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আইন অমান্য করে না, এ কথা আর বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'তারমানে চিড়িয়াখানা থেকে জন্তু-জানোয়ার পালাতে সাহায্য করেছে ওরাই,' একটা কোকের ক্যান কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিল রবিন। 'কিন্তু তুষার চিতাটাকে গায়েব করে দিল কেন ওরা?'

'খবরের কাগজের নজর কাড়ার জন্যে, হয়তো। যতটা আশা করেছিল, তারচেয়ে বেশি সাড়া পড়ে যাবে ভেবেছে। ভেবে থাকলে, ভুল করেনি। মিস্টার বেরিংটন বললেন না, রেডিওতে খবর পেয়ে তিনি এসেছেন। তারমানে অতদূর চলে গেছে খবর। টিভিওলারাও বলতে থাকবে। পত্রিকাগুলো তো বলবেই। বিপন্ন প্রজাতির একটা প্রাণীকে রক্ষা করতে পারেনি রটে গেলে চিড়িয়াখানাটার অতিরিক্ত বদনাম হবে। ওয়ালথ্রপদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার।'

'তারমানে, ধরে নেয়া যায়,' বার্গারের মোড়ক খুলতে খুলতে রবিন বলল, 'তুষার চিতাটাকে ওরাই কিডন্যাপ করেছে। প্যাসিফিক এক্সপোর্টারের মাধ্যমে সেটাকে পাচারের ব্যবস্থা করেছে।'

'কাল সকাল দশটায় প্যাসিফিকের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে ওরা। ওই সময়ের মধ্যে কান্তাকে পাওয়া না গেলে অবশ্যই ঢুঁ মারব কাল ওখানে। আর, আজ রাতে পাহারা দিতে যাব চিড়িয়াখানায়।'

'আমার তাতে কোনই আপত্তি নেই।'

বার্গারে কামড় বসাল রবিন।

চিড়িয়াখানায় যখন পৌঁছল ওরা, সেদিনকার মত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে চিড়িয়াখানা। বৃষ্টি হয়নি যদিও, ধূসর মেঘগুলো যেন আকাশ ছেড়ে যেতে নারাজ। সোজা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের দিকে হাঁটা দিল দুজনে।

অফিসেই পাওয়া গেল বোম্যানকে। ফাইল দেখছেন। 'পুলিশ কোন সন্ধানই করতে পারেনি এখনও,' জানালেন তিনি। 'আর তোমার বন্ধু মুসা জানিয়ে গেছে, তোমাদের বলার জন্যে, রাজকুমারীর পিছু নেয়া রহস্যময় ছেলেটার ব্যাপারে কিছু জানতে পারেনি সে।...তোমরা কিছু করতে পারলে?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'তেমন কিছু না। তবে স্যাবটাজের ঘটনাগুলো যেহেতু রাতে ঘটে, আজ রাতে চিড়িয়াখানায় পাহারা দিতে চাই। হয়তো কিছু বের করে

ফেলতে পারব।'

'এতে,' রবিন বলল, 'নাইট গার্ড যারা পাহারায় থাকে, তাদের সঙ্গেও পরিচিত হওয়া যাবে। ওদের ব্যাপারে খোঁজ-খবরও নেয়া দরকার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানিয়ে ওয়াকি-টকি তুলে নিলেন পরিচালক। 'ড্যানি, বোম্যান বলছি। আমার অফিসে একটু আসবে, প্লীজ?'

পাঁচ মিনিট পর অফিসে ঢুকল ড্যানি হাওয়ার্ড। পরনে সিকিউরিটির ইউনিফর্ম। সকালের চেয়ে তাজা লাগছে।

'ড্যানি,' বোম্যান বললেন, 'কিশোর আর রবিন আজকের রাতটা সিকিউরিটিদের সঙ্গে কাটাতে চায়। তুমি ওদের সাহায্য করবে?'

'নিশ্চয় করব,' আন্তরিক উজ্জ্বল হাসি গোয়েন্দাদের উপহার দিল ড্যানি। 'এসো।'

বাইরে দাঁড় করানো একটা গাড়িতে এনে তুলল ওদের।

'রাতের বেলা দুই শিফটে কাজ করে সিকিউরিটিরা,' গিয়ার দিতে দিতে জানাল ড্যানি। 'প্রথমটা চলে ছ'টা থেকে দুটো পর্যন্ত; দ্বিতীয়টা দুটো থেকে সকাল দশটা। প্রতি শিফটে ছয়জন করে গার্ড থাকে।'

'বাপরে,' মাথা নাড়তে নাড়তে রবিন বলল, 'সারারাত ধরে রোজ রোজ ওরকম ডিউটি দেয়ার কথা ভাবতেই পারি না আমি।'

'মাঝে মাঝে অবশ্য খারাপ লাগে,' স্বীকার করল ড্যানি।

ক্যাট কম্পাউন্ডে ঢুকে একটা বেড়া দেয়া জায়গার পাশে জীপ রাখল সে। কোমরে ঝোলানো বড় চাবির রিঙ থেকে চাবি খুলে নিয়ে গেটের তালা খুলল। দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে এল একটা ছোট্ট ঘরের কাছে।

'এই এলাকায় শুধু স্টাফরা ঢোকে,' সাবধান করে দিল ড্যানি। 'এখানে ঘোরাফেরা করা বিপজ্জনক...'

তার কথা শেষ হলো না, ভয়ঙ্কর এক গর্জন প্রতিধ্বনি তুলল বাড়ির দেয়ালে। এত ভীষণ ভাবে চমকে উঠল রবিন, দেখে হাসতে শুরু করল ড্যানি।

'বাঘ,' একটা ঘরের শিক লাগানো দরজা দেখাল সে। 'ডিনারের জন্যে মাংস দেয়া হয়েছে। তোমাদের দেখে হয়তো ভাবছে, ভিন্ন মাংসে রুচি বদল করতে পারলে মন্দ হয় না।'

'আমার চেয়ে ওকেই বেশি পছন্দ করবে,' বুড়ো আঙুল কাত করে কিশোরকে দেখাল রবিন। 'ওর দেশোয়ালি ভাই তো। বাংলাদেশী।'

শিকের ফাঁক দিয়ে বাঘটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। আগের রাতে এটাই বেরিয়ে গিয়েছিল। বাঘটাকে বলল, 'মনে আছে তো মিয়া, তুমি মানুষের মাংস পছন্দ করো না।'

লম্বা লাল জিভ বের করে থাবা চাটছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

ড্যানির পেছন পেছন আরেকটা ছোট ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। শিক লাগানো দরজার তালা খুলে একটা ছোট ঘরে ঢুকল। কংক্রীটের দেয়াল, মোজাইক করা মেঝে।

'এটাই ছিল তুষার চিতার রাতের বাসা,' ড্যানি বলল।

'রাতে আলাদা জায়গায় রাখা হয় কেন জানোয়ারগুলোকে?' শূন্য ঘরটায় চোখ বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'দিনের বেলা যেখানে রাখা হয়, সেখানে ঘুমালে অসুবিধে কি?'

'এটা হলো সাবধানতা। রাতের বেলা কোন মাথা খারাপ লোক চিড়িয়াখানায় ঢুকে জানোয়ারগুলোর ক্ষতি করতে পারে, চুরি করতে পারে। বলা তো যায় না। কিন্তু এখান থেকেও যে চিতাটাকে চুরি করে নিয়ে যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল।'

দরজা দিয়ে একটা সরু কুঠুরিতে গোয়েন্দাদের নিয়ে এল ড্যানি। হোসপাইপ, বেলচা আর কিছু টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিস আছে এখানে।

একটা হাতলে চাপ দিল ড্যানি। খুলে গেল একটা ইস্পাতের দরজা। 'এসো।'

মাথা নুইয়ে দরজা পার হয়ে অন্যপাশে চলে এল ওরা। সোজা হয়ে দেখল কিশোর, কান্তার হিমালয় পর্বতের পরিবেশে এসে ঢুকেছে।

'সকাল বেলা এই দরজা দিয়ে এখানে বেরিয়ে আসত চিতাটা,' ড্যানি জানাল। 'রাতে আবার ফিরে যেত। দুবার খাবার দেয়া হয় ওদের। একবার সকালে, একবার সন্ধ্যায়।'

'তারমানে কান্তাকে পাওয়ার জন্যে বেশ কয়েকটা তালা খুলতে হয় চোরকে,' রবিন বলল। 'কি করে খুলল?'

'চাবি ছাড়াও তালা খুলতে পারে ওস্তাদ চোরেরা,' ড্যানি বলল। 'কিংবা এমন কেউ কাজটা করেছে, যার কাছে চাবি থাকে।'

তারমানে চিড়িয়াখানার কেউ। চট করে ড্যানির কোমরে ঝোলানো চাবির দিকে নজর চলে গেল রবিনের।

পরের একটা ঘণ্টা ড্যানির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াল দুজনে। কখনও হেঁটে, কখনও জীপে করে; তীক্ষ্ণ নজর রাখল যাতে কোন কিছু চোখ না এড়ায়। প্রথম শিফটের অন্য প্রহরীদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিতে অনুরোধ করল। বাকি পাঁচজনের বয়েস পঁচিশ থেকে সত্তরের মধ্যে। আপাতত পরিচয় করে নিল, পরে ভালমত কথা বলবে।

সাড়ে আটটা নাগাদ অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। জু প্লাজায় ফিরে এল ড্যানি।

'আমার কিছু কাগজপত্রের কাজ আছে,' বলল সে। 'আর কিছু দেখানো লাগবে তোমাদের?'

'আমরা বাইরে ঘুরে বেড়ালে কোন অসুবিধে হবে না তো?' জানতে চাইল রবিন।

'তা ঘুরতে পারো,' নাকের ওপর চশমাটা ঠিক করে বসাতে বসাতে বলল ড্যানি। 'জন্তু-জানোয়ারগুলোকে সব নিরাপদ জায়গায় আটকে ফেলা হয়েছে। আমি রাত দুটো পর্যন্ত আছি। দরকার হলে ডেকো।'

'থ্যাংকস,' বলে লাফ দিয়ে জীপ থেকে নেমে পড়ল রবিন। কিশোরও নামল। অন্ধকারে হাঁটতে শুরু করল। ঝিঁঝি ডাকছে ক্রমাগত। এ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। কি খুঁজতে এসেছে জানে না। তবে সন্দেহ জাগায় এমন কিছু।

'রাতের বেলা জায়গাটা কেমন গা ছমছমে, ভুতুড়ে বললেও ভুল হবে না,' জলহস্তীর শূন্য জলার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন। 'কিছুই দেখা যাচ্ছে

না। অথচ মনে হচ্ছে হাজারটা চোখ গোপনে তোমাকে লক্ষ করছে।'

হঠাৎ অন্ধকারকে চিরে দিল যেন অদ্ভুত একটা কু-কু শব্দ।

ঝট করে মাথা ঘোরাল কিশোর, 'কিসের ডাক?'

'কি করে বলব? হবে কোন জানোয়ার···পাখিও হতে পারে।'

'সাপের বাড়ির দিকটায় ঘুরে আসি, চলো,' কিশোর বলল। 'অজগরটা যেখান দিয়ে বেরিয়েছে, সেটা আরেকবার ভাল করে দেখতে চাই।'

সাপের বাড়ির কাছে এসে ভেন্টের মুখটার দিকে তাকাল কিশোর।

'একটা জিনিস খেয়াল করেছ?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'প্রতিটি স্যাবটাজ করা হয়েছে উঁচু জায়গা থেকে। এই ভেন্ট, বানরের খাঁচার হট ওয়্যার, বাঘের পরিখার ওপর গাছের ডাল।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'বানরের খাঁচার হট ওয়্যারটা তো একটা কঠিন ব্যাপার। নাগাল পেতে নিশ্চয় রীতিমত কসরত করতে হয়েছে।'

'সাধারণ মইয়ের সঙ্গে বাড়তি ধাপ জুড়ে ওঠা সম্ভব। সিকিউরিটি গার্ডের জন্যে সুবিধা। ওয়ালথ্রপরাও এ কাজের জন্যে ফিট, হালকা-পাতলা আছে, মই বেয়ে উঠতে পারবে।' এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। 'কিন্তু যদি ডক্টর হেমিং হয়ে থাকেন? তাঁর বয়েস অত কম নয়। এত উঁচুতে কি উঠতে পারবেন?'

'সাহায্য করার জন্যে কাউকে নিলে পারেন। সহকারী।'

ভেন্টের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল কিশোর। কয়েকজন সহকারী নিলেই বা আপত্তি কিসের? তাঁর ফান্ডের টাকা কেড়ে নেয়া হয়েছে···কথাটা মনে পড়তেই উত্তেজিত হয়ে উঠল। রবিনের দিকে তাকাল, 'ডক্টর হেমিঙের তিনজন সহকারীর নাম বলতে পারো?'

একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল রবিন। তারপর সে-ও উত্তেজিত হয়ে উঠল। প্রায় চিৎকার করে বলল, 'ববি, টপ, আর বেবি জুপিটার!'

'কারেক্ট!' চরকির মত পাক খেয়ে রবিনের দিকে ঘুরে গেল কিশোর। 'ডক্টর হেমিং বলেছেন, ওদের দিয়ে যে কোন কাজ করানো সম্ভব। নানান ধরনের টুলসও আছে ওদের খাঁচার মধ্যে। ওগুলো ব্যবহার করতে শিখিয়েছেন হয়তো। রাতের বেলা জায়গামত নিয়ে গিয়ে, প্রহরীদের অলক্ষে স্যাবটাজগুলো করিয়েছেন। উঁচু জায়গায় চড়া কিছুই না শিম্পাঞ্জির জন্যে।'

'বিশ্বাস হচ্ছে না আমার,' বিল্ডিঙের পাশের ড্রেনপাইপটার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। 'কিন্তু উড়িয়েও দিতে পারছি না। থিয়োরিটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।'

শিম্পাঞ্জির বিল্ডিঙের কাছে চলে এল ওরা। পরীক্ষা করে দেখল, বাইরের দিকের একটা দরজার তালা খোলা।

'গার্ড থাকতে পারে,' চারপাশে তাকাতে লাগল রবিন।

কাউকে চোখে পড়ল না। ঢুকে পড়ল দুজনে। পা টিপে টিপে ঘুমন্ত গরিলাগুলোর পাশ কাটাল। চলে এল ল্যাবরেটরি-কাম-শিম্পাঞ্জির ঘরের কাছে। কিশোরের পকেটে মাস্টার কী আছে। তালা খোলার জন্যে সেটা বের করতে যাবে, রবিন দেখল তালাটা খোলা।

'অবাক কাণ্ড! খোলা কেন?'

'কাছাকাছি গার্ড আছে বোধহয়,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

ল্যাবরেটরিতে ঢুকল ওরা। টেবিলে রাখা একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। মৃদু আলো। কোন মানুষ চোখে পড়ল না। শিকের ফাঁকে নাক ঠেকিয়ে ওপাশে শিম্পাঞ্জিগুলোকেও দেখতে পেল না রবিন।

'কোথায় ওগুলো?' আস্তে কথা বলার কথা ভুলে গেল সে।

'গাছে,' কিশোর বলল।

গাছের ডালে ওগুলোকে ছড়িয়ে শুয়ে থাকতে দেখল এতক্ষণে রবিন। গভীর ঘুমে অচেতন। হঠাৎ চোখ খুলে গেল ববির। চোখের পলকে উঠে বসে জাগিয়ে দিল তার দুই ভাইকে। নিঃশব্দে টপাটপ মেঝেতে নেমে পড়ল তিন শিম্পাঞ্জি।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল কিশোর।

শিম্পাঞ্জিগুলোও অবিকল অনুকরণ করল। যেন কথা বুঝতে পেরেছে।

একটা বুদ্ধি খেলে গেল কিশোরের মাথায়। আলমারিটা দেখিয়ে বলল, 'টুলস! আনতে পারবে ওগুলো?'

চার হাতপায়ে ভর দিয়ে হেঁটে গিয়ে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নামাতে শুরু করল ববি। কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে টপ আর জুপিটার। বোঝা গেল, দলের নেত্রী ববি। হাতুড়ি, করাত, রেঞ্চ, প্লায়ার্স, কাঁচি, রুলার, আর কয়েকটা স্ক্রু-ড্রাইভার মেঝেতে নামিয়ে রাখল সে।

'হট ওয়্যার কাটার জন্যে কাঁচি,' রবিন বলল। 'ভেন্টের স্ক্রু খোলা যাবে স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে। আর গাছের ডাল কাটার জন্যে করাত। এখন দেখা যাক, টুলসগুলো ঠিকমত চিনতে পারে কিনা ওরা।'

'করাত,' ফিসফিস করে ববিকে বলল কিশোর। হাত সামনে-পেছনে করে করাত দিয়ে কাটার ভঙ্গি করল। 'কাঠ কাটতে পারবে?'

মাথা ঝাঁকাল ববি। এক টুকরো কাঠ খুঁজে এনে বাড়িয়ে দিল দুই ভাইয়ের দিকে। তুলে নিল একটা ছোট করাত। দুই ভাই দুদিক থেকে কাঠটা ধরে রাখল, ববি মাঝখানে করাত চালাল। দক্ষ ছুতারের মত কাঠটা কেটে দুই টুকরো করে ফেলল।

'কাণ্ডটা কি করল!' বিশ্বাস করতে পারছে না রবিন। 'সম্ভব! ওদের পক্ষে স্যাবটাজ করা সম্ভব!'

কটকট করে শব্দ হলো। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর, পাশের অফিসটার ইলেকট্রনিক লক কেউ খুলে ফেলল ভেবে।

আসলে খুলেছে শিম্পাঞ্জির ঘরের দরজা। রবিন বা কিশোর কিছু করার আগেই লাফ দিয়ে বেরিয়ে চলে এল ববি; পেছনে তার দুই ভাই। তীক্ষ্ণ চিৎকার করতে করতে আনন্দে লাফানো শুরু করল। ওরা এখন মুক্ত!

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন, 'নিশ্চয় কেউ ঢুকতে দেখেছে আমাদের। শিম্পাঞ্জিগুলোকে নিয়ে আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধ করতে চেয়েছে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল।

সারা ঘরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে শিম্পাঞ্জিগুলো। রবিন বলল, 'খাঁচায় ফেরানো দরকার।'

অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে রবিনের কাছে এসে দাঁড়াল টপ। ওর ডান হাত ধরে ভয়ানক ভাবে ঝাঁকাতে শুরু করল।

'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, টপ,' রবিন বলল। বুঝতে পারছে না, শিম্পাঞ্জিটা আসলে খাতির করতে চাইছে, না কুমতলব আছে ওর।

লাফ দিয়ে গিয়ে কিশোরের পিঠে চড়ল ববি।

'আরে, নাম, নাম!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

নামল না ববি। বরং মাথার চুলে হাত বুলাতে শুরু করল। কখন হ্যাঁচকা টান মেরে ছিঁড়ে দেয় এই ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল কিশোর।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বদলে গেল শিম্পাঞ্জিগুলোর আচরণ। ডেস্কের ওপরে উঠে লাফাতে শুরু করেছে বেবি জুপিটার। সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ চিৎকার।

রবিনের হাতটা মুচড়ে ধরে ওপরে ঠেলতে শুরু করল টপ।

'আরে, করছিস কি!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'ভেঙে ফেলবি তো!'

চিৎকার-চেঁচামেচি আরও বেড়ে গেল শিম্পাঞ্জিগুলোর। বুনো হয়ে উঠছে ক্রমশ।

কিশোরের ঘাড়টা এক হাতে পেঁচিয়ে ধরে চাপ দিতে আরম্ভ করল ববি।

'না!' হাতটা সরানোর জন্যে টান দিল কিশোর। ভয়ানক শক্তি শিম্পাঞ্জিটার রোমশ বাহুতে। 'থামা এ সব!' দম আটকে আসছে। 'বন্ধ কর!'

কিন্তু আরও শক্ত হলো ববির হাতের বাঁধন। চাপ বাড়ছে, আরও চাপ, দম আটকে দেবে।

নয়

দম নেয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করছে কিশোর। গলা থেকে ঘড়ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে।

জোরে ককিয়ে উঠল রবিন। চিৎকার করে বলল, 'উফ্, হাতটা ভেঙে দিল আমার।'

কল্পনাই করতে পারেনি, জানোয়ারটার শরীরে এই পরিমাণ শক্তি, যদিও ডক্টর হেমিং আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন।

বেবি জুপিটারও শয়তানিতে কম যায় না। টেবিল থেকে কাগজপত্র তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে বাতাসে। মজা পেয়ে বুনো চিৎকার করছে তিনটে শিম্পাঞ্জিই, বানর প্রজাতির আদিম আনন্দ।

'রবিন...চিড়িয়াখানার বন্ধু...বার বার বলতে থাকো,' গলায় চাপ নিয়ে কোনমতে বলল কিশোর।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেল রবিন। শিম্পাঞ্জিগুলোকে বোঝাতে হবে, চিড়িয়াখানার জন্যে সে আর কিশোর খুব মূল্যবান প্রাণী, ওদের ক্ষতি করা চলবে না।

'চিড়িয়াখানার বন্ধু!' চিৎকার করে উঠল রবিন। 'মনে আছে, আমরা চিড়িয়াখানার বন্ধু! আমরা টাকা দিই!'

কেয়ারই করল না শিম্পাঞ্জিগুলো। অসহায় হয়ে তাকিয়ে দেখল রবিন, কিশোরের গলায় ববির হাতের চাপ শক্ত হলো আরও। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে।

'ইশারায় বোঝাও...' ঘড়ঘড় করে কোলাব্যাঙের স্বর বেরোল কিশোরের গলা থেকে, চাপ বাড়িয়ে সেটাও আটকে দিল ববি।

'বোঝাচ্ছি!' হাতটা বাঁকা হয়ে আরেকটু ওপরে উঠে যেতে ব্যথায় কাতরে উঠল রবিন। এর মাঝেও মুক্ত হাতটা তুলে ববির দিকে নাড়তে লাগল, যতক্ষণ না তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল। ডক্টর হেমিঙের অনুকরণে ইশারা করে বোঝানোর চেষ্টা করল, ওরা চিড়িয়াখানার বন্ধু। ভাগ্যিস, আগের দিন ভালমত দেখেছিল কি করে ইশারা করেন ডক্টর হেমিং।

ববির চোখ রবিনের ওপর স্থির। মরিয়া হয়ে ইশারা চালিয়ে যেতে লাগল রবিন, সেই সাথে চিৎকার করে বার বার বলতে লাগল, 'চিড়িয়াখানার বন্ধু! চিড়িয়াখানার বন্ধু! চিড়িয়াখানার বন্ধু!'

অবশেষে কমে এল ববির তীক্ষ্ণ কিচকিচ শব্দ। গলায় চাপ কমে এল কিশোরের। হাঁ করে বাতাস যেন গিলতে শুরু করল সে। পিঠ থেকে নেমে টপের কাছে এগিয়ে এল ববি। হাতের আঙুলের সাহায্যে 'চিড়িয়াখানার বন্ধু' সঙ্কেত দিয়ে ভাইকে টেনে সরাল রবিনের কাছ থেকে।

ব্যথা করছে ডান হাতটা। ডলতে ডলতে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'গেছিলাম আরেকটু হলেই।'

'হ্যাঁ,' অফিসের দিকে তাকাল কিশোর। 'আর কেউ আছে নাকি দেখা দরকার। তুমি উঁকি দিয়ে এসো, আমি শিম্পাঞ্জিগুলোকে সামলাচ্ছি।'

টেবিলের ওপর এখনও নাচানাচি করছে বেবি জুপিটার। তীক্ষ্ণ হাঁক ছাড়ছে: ইহ্! ইহ্! ইহ্! কাগজ ছুঁড়ে দিচ্ছে বাতাসে। ভাই-বোনকে চুপ হয়ে যেতে দেখে হতাশ হয়েছে। দ্বিধায় পড়ে গিয়ে থুঁতনি চুলকাতে লাগল।

অফিসের দিকে রওনা হলো রবিন। শিম্পাঞ্জিগুলোকে আবার খাঁচায় ফেরত পাঠানোর উপায় ভাবছে কিশোর।

'টাকা!' মানিব্যাগ থেকে ডলারের নোট বের করে দেখাল কিশোর। চিড়িয়াখানার বন্ধুরা যে টাকা দেয়, নোট দেখিয়ে সেটা বোঝাতে চাইল। শিম্পাঞ্জিগুলো টাকা চিনলে হয় এখন।

তিনটে এক ডলারের নোট শিকের ওপাশে রাখল সে।

চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটল শিম্পাঞ্জি তিনটে। সোজা গিয়ে ঢুকল খাঁচার মধ্যে। একেকজন একটা করে নোট তুলে নিয়ে দেখতে লাগল। এক মুহূর্ত দেরি না করে শিক লাগানো দরজাটা টেনে দিল কিশোর। কট করে লেগে গেল স্বয়ংক্রিয় তালা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে।

'নাহ্, কেউ নেই এখানে,' বলল অফিসের দরজায় দাঁড়ানো রবিন। 'অফিস থেকে হলওয়েতে বেরোনোর আরেকটা দরজা আছে। আমাদের অলক্ষে সেটা দিয়ে ঢোকা আর বেরোনো সম্ভব ছিল।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। নিচু হয়ে মেঝে থেকে কুড়াতে শুরু করল বেবি জুপিটারের ছড়িয়ে ফেলা কাগজগুলো। 'আমরা যখন ঢুকলাম, হয়তো ডক্টর হেমিং

তখন অফিসেই ছিলেন। মনে আছে, ল্যাবের দরজা খোলা পেয়েছি আমরা। হয়তো তিনি আমাদের জানতে দিতে চাননি টুলসগুলো কি নিখুঁত ভাবে ব্যবহার করতে পারে শিম্পাঞ্জি।'

'স্যাবটাজে খুব চমৎকার ভাবে সহায়তা করতে পারবে এই শিম্পাঞ্জিগুলো,' হ্যাতটা এখনও ডলছে রবিন। 'যা বুঝলাম, তাতে মনে হলো এ কাজ করার জন্যে স্পেশাল ট্রেনিং দেয়া হয়েছে এদের।'

'ডক্টর হেমিঙের রয়েছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের ওপর তীব্র আক্রোশ।' কাগজগুলো টেবিলে রাখল কিশোর। 'তারমানে মোটিভ আছে।'

শিম্পাঞ্জিগুলোর দিকে ফিরে দেখল কিশোর, নোটগুলোকে চিবাচ্ছে এখন ওরা।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে রবিনও তাকাল। 'গেল তোমার তিনটে ডলার।'

'প্রাণের বিনিময়ে তিনটে ডলার বড়ই কম!' অন্যমনস্ক হয়ে গেছে হঠাৎ কিশোর।

আরও মিনিট কয়েক পর এপ বিল্ডিং থেকে বাইরে চিড়িয়াখানার নির্জন চত্বরে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। মৃদু বাতাস সরসর করে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল গাছের পাতা। আকাশে মেঘ ডাকল গুড়ুগুড়ু শব্দে।

'চলো, কিছু খেয়ে নেয়া যাক,' রবিন বলল। 'শিম্পাঞ্জিগুলো খিদে বাড়িয়ে দিয়েছে আমার।'

'চলো। আজ রাতের জন্যে চিড়িয়াখানা দেখা যথেষ্ট হয়েছে। কাল সকালে উঠে এয়ারপোর্টে যাব ওয়ালথ্রপরা কি নিয়ে মেতেছে দেখার জন্যে।'

পার্কিং লটের দিকে এগোচ্ছে দুজনে, একটা ভুতুড়ে চিৎকার চিরে দিল রাতের নিস্তব্ধতা।

'কিসের ডাক?' অন্ধকারে চারপাশে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল রবিন। আনমনে বিড়বিড় করল, 'নাহ্, জঙ্গলের চেয়ে কোন অংশে কম নয় চিড়িয়াখানা।'

ন'টা বাজার সামান্য আগে রকি বীচ এয়ারপোর্ট টার্মিনাল বিল্ডিঙে ওয়ালথ্রপদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল দুই গোয়েন্দা। দুই হাতে পত্রিকার পাতা ছড়িয়ে ধরে তার আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। বড় করে হেডলাইন দিয়েছে: রকি বীচ চিড়িয়াখানা থেকে তুষার চিতা উধাও।

কিশোর বলল, 'সিকিউরিটি গার্ডদের সঙ্গে তো তেমন আলাপ হলো না, ড্যানি বাদে। ওকে বেশ আন্তরিকই মনে হয়েছে, তবে...'

'তবে কি?' দরজার দিক থেকে চোখ সরাল না রবিন।

'শিম্পাঞ্জির ব্যাপারে অনেক কিছু জানে সে, এটা তোমার খটকা লাগেনি? কি করে সেদিন ডক্টর হেমিঙের অফিসে ঢুকে পড়েছিল, মনে করে দেখো। শিম্পাঞ্জির প্রিয় টিভি শো কোনটা, তাও জানে। স্যাবটাজ করতে ডক্টর হেমিঙকে সাহায্য করেনি সে, এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। ওর দিকে নজর দেয়া দরকার...'

'এসে গেছে আমাদের রায়না আর নিক!' ফিসফিস করে বলল রবিন।

পত্রিকার পাতাটা ইঞ্চি দুয়েক নামিয়ে সাবধানে চোখ দুটো বের করল কিশোর। টার্মিনাল বিল্ডিঙে ঢুকল ওয়ালথ্রপরা। প্যাসিফিক এক্সপোর্টার লেখা কাউন্টারের

স... গিয়ে দাঁড়াল। কাউন্টারে বসা এক যুবকের সঙ্গে কথা বলতে লাগল রায়না। কয়েকটা কাগজ বের করে দিল যুবক। কি যেন লিখতে শুরু করল নিক।

'কি লিখছে?' রবিনের প্রশ্ন।

'বুঝতে পারছি না।'

কথা বলতে বলতে দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিল যুবক।

'বাক্সটা কতবড় বোধহয় বোঝাচ্ছে লোকটা,' দেখতে দেখতে বলল কিশোর। 'কান্তার বাক্স।'

'মনে হয়

মিনিটখানেক পর কাউন্টারের কাছ থেকে সরে গেল ওয়ালথ্রপরা। দরজার দিকে এগোল।

'চলো, পিছু নিই,' কিশোর বলল।

কিশোর বলার আগেই উঠে দাঁড়িয়েছে রবিন।

বাইরে পার্কিং লটে দেখা গেল ওয়ালথ্রপদে... মলিন সবুজ গাড়িটা।

আচমকা বজ্রের বিকট শব্দ হলো মাথার ওপর।

'মনে হয়,' রবিন বলল, 'ঝড়টা আসার সময় হয়ে গেছে।' আকাশের দিকে চোখ তুলল। কালো মেঘের টুকরোগুলো দ্রুত একজোট হচ্ছে; যেন সেনাবাহিনীর একটা দল যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

পার্কিং লট থেকে ওয়ালথ্রপদের গাড়িটা বেরিয়ে যেতে, কিশোররাও এসে ওদের গাড়িতে উঠল।

'পিছু নেব নাকি?' স্টার্ট দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'তা তো নেবেই।'

'মনে হচ্ছে ওয়ালথ্রপরাই চিতাটাকে চুরি করেছে। এখন পাচার করার ব্যবস্থা করেছে কোনখানে। নিশ্চয় হিমালয়ে ফেরত পাঠাচ্ছে।' গিয়ার দিয়ে শেভ্রলেটার পিছু নিল রবিন। 'কিন্তু চিতা চুরির সঙ্গে চিড়িয়াখানায় স্যাবটাজের সম্পর্ক কি?'

'আমার ধারণা,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর, 'দুটো সম্পূর্ণ আলাদা দুটো অপরাধের ঘটনা। একটার সঙ্গে আরেকটার কোন সম্পর্ক নেই।'

আর কিছু না বলে নীরবে গাড়ি চালাল রবিন। আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে এগিয়ে নির্জন একটা গলিতে ঢুকল শেভ্রলে। পথের ধারে জানালাশূন্য সারি দেয়া বড় বড় বিল্ডিং। একজন মানুষকেও চোখে পড়ল না।

'গুদাম,' রবিন বলল।

রাস্তার শেষ মাথায় গিয়ে থামল সবুজ শেভ্রলে। কোণের কাছে একটা বাড়ির আড়ালে গাড়ি সরিয়ে নিল রবিন। নজর রাখল ওয়ালথ্রপদের ওপর। গাড়ি থেকে নেমে একটা গুদামের দিকে এগিয়ে গেল নিক আর রায়না। দুজনের হাতেই একটা করে প্লাস্টিকের ব্যাগ।

'কি করছে?' বিড়বিড় করল কিশোর।

গুদামের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল নিক। দেখে নিল কেউ আছে কিনা। ছোট একটা বাক্সের মত জিনিস বের করে দরজায় আটকে দিয়ে সরে এল।

'কি ওটা?'

রবিনের কথা শেষ হতে না হতেই বুম করে শব্দ হলো।

'বোমা!' উত্তেজনায় গলা কাঁপছে কিশোরের। 'সন্ত্রাসী নাকি এরা!'

কোথায় যেন একটা অ্যালার্ম বেজে উঠল। গুদামের মধ্যে ঢুকে পড়ল ওয়ালথ্রপরা।

'রবিন, তুমি বসো। কি করে ওরা, দেখে আসি।'

রবিন কিছু বলার আগেই ঠেলা মেরে দরজা খুলে নেমে গেল কিশোর। দৌড় দিল গুদামের দরজার দিকে।

ঠিক এই সময় ঝুপঝুপ করে নামল বৃষ্টি। অকস্মাৎ। মুষলধারে। উইন্ডশীল্ড বেয়ে গড়াতে লাগল পানির ধারা। মুহূর্তে বৃষ্টির চাদরে ঢেকে দিল এমন ভাবে, সে-চাদর ভেদ করে সামনের কিছুই দেখা সম্ভব হলো না। ওয়াইপার চালু করে দিল রবিন।

অপেক্ষা করতে লাগল সে। অপেক্ষা। অপেক্ষা। বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসও রয়েছে। ঝরাৎ ঝরাৎ করে এসে বাড়ি মারছে গাড়ির গায়ে, বিল্ডিঙের দেয়ালে।

বসে থাকতে থাকতে রবিনের মনে হলো, অনন্তকাল ধরে চলছে ওয়াইপার দুটো। কিছুই ঘটছে না। কিশোরও আসছে না, ওয়ালথ্রপরাও বেরোচ্ছে না। স্টিয়ারিঙে টোকা দিতে লাগল তার অস্থির আঙুলগুলো।

ঘড়ি দেখল। মাত্র দশ মিনিট পেরিয়েছে। অথচ রবিনের মনে হচ্ছে দশ যুগ। গুদামের মধ্যে কি করছে ওয়ালথ্রপরা? ব্যাগে করে কি নিয়ে গেছে?

আকাশ চিরে দিল বিদ্যুতের একটা সর্পিল শিখা। অবশেষে গুদাম থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল দুই ওয়ালথ্রপকে। দরজার কাছে দাঁড়াল একটা মুহূর্ত। শেডের নিচে দাঁড়িয়েছে। বৃষ্টি পড়ছে না গায়ে। ব্যাগ দুটো এখন রায়নার হাতে। রুমাল দিয়ে হাত মুছছে নিক।

চোখ কুঁচকে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে তুলে বোঝার চেষ্টা করছে রবিন, কি মুছছে নিক। লাল রঙ মনে হলো। রক্ত না তো! ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। কিশোরের কিছু হলো!

বাজ পড়ল আবার। গাড়ির দিকে দৌড় দিল ওয়ালথ্রপরা। মাথা নিচু করে এক দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়ল গাড়িতে। ছেড়ে দিল গাড়ি।

একটা মুহূর্তও আর দেরি করল না রবিন। প্রবল ঝড়ের মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে দৌড় দিল গুদামের দরজার দিকে। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা এসে ঢুকল ভেতরে।

বিরাট একটা অন্ধকার জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। 'কিশোর!' গলা চড়িয়ে ডাকল, 'কোথায় তুমি?'

জবাব নেই।

দুরুদুরু করছে বুকের মধ্যে। দেয়াল হাতড়ে সুইচ বোর্ডটা বের করল সে। আলো জ্বেলে দিল। মাথার ওপর জ্বলে উঠল উজ্জ্বল ফ্লোরেসেন্ট লাইট।

গুদামের জিনিসপত্র দেখে, দম আটকে আসতে চাইল রবিনের। র‍্যাকে বোঝাই নানা রকম ফারের কোট–মিঙ্ক, শেয়াল, স্যাবল আর চিনচিলার রোমশ

চামড়ায় তৈরি। কয়েকটা কোটের গায়ে রক্তের ফোঁটা দেখতে পেল।

'কিশোর!' আবার চিৎকার করে ডাকল সে।

এবারেও সাড়া মিলল না। মনে হলো হৃৎপিণ্ডটা বুঝি থেমে যাবে, যখন দেখল মেঝেতে পড়ে থাকা ছোপ ছোপ রক্ত।

রক্তের দাগ ধরে ধরে, কোটের র‍্যাকের মাঝখানের গলিপথ ধরে গুদামের পেছন দিকে চলে এল রবিন। একটা র‍্যাক কাত হয়ে পড়ে থাকতে দেখল এখানে। সমস্ত কোট ছড়িয়ে আছে মেঝেতে।

তাকে চমকে দিয়ে নড়ে উঠল একটা কোট। ভুল দেখছে নাকি! ভূত!

'কিশোর?' সাবধানে ডাকল রবিন।

চাপা একটা শব্দ শুনে উবু হয়ে বসল। কোট সরাতে শুরু করল। নিচে চাপা পড়ে আছে কিশোর। মেঝেতে পড়ে আছে।

'সর্বনাশ!' কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল রবিন। সারা মুখ, মাথা রক্তে মাখামাখি।

'আমার কিছু হয়নি,' মাথা তুলল কিশোর। গুঙিয়ে উঠল। 'সত্যি বলছি।'

'তোমার মুখে রক্ত কেন? গোঙাচ্ছ কেন?'

'মাথার চামড়া কেটে গেছে,' উঠে বসল কিশোর। 'রক্ত না। রঙ।'

'র-র-র...'

'হ্যাঁ, রঙ,' কিশোর বলল। 'ওয়ালথ্রপদের সৌজন্যে। চামড়ার জন্যে জানোয়ার মারা চলবে না–প্রতিবাদ জানাতে এসেছিল ওরা।' দেয়ালের দিকে হাত তুলল সে। 'দেখো, ওদের প্রতিবাদের নমুনা। কি লিখে রেখে গেছে দেখো।'

বড় বড় অক্ষরে লিখে রেখেছে: এই জানোয়ারগুলোকে খুন করা হয়েছে! লেখাগুলো থেকে দেয়াল বেয়ে রক্তের মত কাঁচা রঙ নামছে এখনও। বড় বড় লোম আর শাখাপ্রশাখা তৈরি করেছে যেন অক্ষরগুলোর। ভীতিকর দৃশ্য।

'সঙ্গে করে রঙের টিন নিয়ে এসেছিল ওরা,' কিশোর বলল। 'রায়না লিখছিল, নিক রঙ ছড়িয়ে দিচ্ছিল কোটের ওপর। র‍্যাকের আড়ালে লুকিয়ে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম। পেছনে সরতে গিয়ে কিসে যেন পা দিয়ে বসলাম, শব্দ হয়ে গেল, তেড়ে এল ওরা। দেখে ফেলল। মাথা ঘুরিয়ে রেখেছিলাম, যাতে মুখ না দেখে। আমার মাথায় রঙের টিন ছুঁড়ে মারল নিক। ঠেলা মেরে গায়ের ওপর ফেলে দিল র‍্যাকটা। চাপা পড়লাম তার নিচে। কপাল ঠুকে গিয়েছিল সম্ভবত। বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম।'

ব্যথা লাগা জায়গাগুলোতে আঙুল বোলাল সে। 'এখন আমরা জানি, জানোয়ারের আইন রক্ষার জন্যে নির্দ্বিধায় মানুষের আইন ভাঙছে ওয়ালথ্রপরা।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। বিচিত্র চেহারার লেখাগুলোর দিকে তাকাল আবার। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'চলো, বাড়ি যাই।'

দশ

পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকল গাড়ি। বাড়ির সামনে না গিয়ে তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওঅর্কশপের পাশে গাড়ি রাখল রবিন। রঙটঙগুলো এখান থেকেই ধুয়ে না গেলে, মেরিচাচী দেখলে শুরু করবেন চেঁচামেচি। হয়তো রক্ত ভেবে বসবেন। কৈফিয়ত দিতে দিতে জান যাবে। কে যায় অত ঝামেলা করতে।

ওঅর্কশপের একপ্রান্তের টিনের বেড়ায় একটা ধাতব বেসিন লাগানো আছে। পেট্রলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে রঙগুলো প্রথমে ডলে তুলতে শুরু করল দুজনে। তারপর সাবান দিয়ে ধোবে।

মিনিট পাঁচেক পর হন্তদন্ত হয়ে ওঅর্কশপে ঢুকল মুসা। বৃষ্টিতে ইঁদুর ভেজা হয়ে এসেছে। কাপড় থেকে টপটপ করে পানি ঝরছে।

'কি ব্যাপার?' একই সঙ্গে প্রশ্ন করল কিশোর আর রবিন।

হাঁপাচ্ছে মুসা।

'দৌড়ে এলে নাকি?' আবার জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না, সাইকেল!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা। 'রাজকুমারী!'

'কি হয়েছে রাজকুমারীর?...আচ্ছা, বসো, শান্ত হও। তারপর বলো।'

একটা টুলে বসে পড়ল মুসা। শান্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না। 'আজ সকালে ডরমিটরি থেকে চন্দ্রাবতীকে তুলে নেয়ার কথা ছিল আমার। তাকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় যেতাম। কিন্তু গিয়ে দেখি, চন্দ্রাবতী নেই।'

'তোমাকে ছাড়াই হয়তো চিড়িয়াখানায় চলে গেছে,' কিশোর বলল।

'না,' জোরে জোরে মাথা নাড়ল মুসা। 'চিড়িয়াখানায়ও গিয়েছি। ওখানে যায়নি সে।'

'কোন কারণে অন্য কোথাও গিয়েছে হয়তো।'

'আমার মনে হয় না। ডরমিটরিতে আমার পরিচিত একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। আজকে দুজনের বাজারে যাওয়ার কথা ছিল, জরুরী কিছু জিনিসপত্র কিনতে। চন্দ্রাবতীই বলে রেখেছিল। সে-ব্যাপারেই কথা বলতে তার ঘরে গিয়েছিল মেয়েটা। চন্দ্রাবতীকে ঘরে পায়নি। কাল বিকেলের পর থেকে কেউ আর দেখেওনি ওকে।'

'হুম!' ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'মোটেও ভাল মনে হচ্ছে না আমার কাছে!'

'গাড়িটা স্টার্ট নিতে চাইল না,' মুসা বলল। 'সারানোর সময় ছিল না। একজন গার্ডের সাইকেলটা ধার নিয়ে ছুটলাম থানায়। পুলিশকে জানিয়েছি। ইয়ান ফ্লেচার অফিসে নেই। ডিউটি অফিসার প্রশ্ন করে করে প্রচুর সময় নষ্ট করেছে আমার।...কিশোর, কিছু একটা করা উচিত আমাদের। জলদি জলদি!'

'এক মিনিট, কাপড়টা বদলে নিই।' রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, তোমারগুলোও বদলে আমার একটা শার্ট আর প্যান্ট পরে নিতে পারো।'

মুসা বলল, 'আমার বদলানো লাগবে না। গাড়িতে যেতে যেতে শুকোবে। জলদি করো।'

দশ মিনিট পর আবার রাস্তায় নামল রবিনের গাড়ি। সে চালাচ্ছে। পেছনের সীটে বসেছে মুসা আর কিশোর।

মুসা বলছে, 'কে রাজকুমারীকে চুরি করেছে, আমি জানি। ওই শয়তান ছেলেটা, যে তার ওপর নজর রেখেছিল, কাল পিছু নিয়েছিল।'

'আমি ভাবছি,' কিশোর বলল, 'ছেলেটার ব্যাপারে কি লুকাচ্ছিল চন্দ্রাবতী?'

'বলতে হয়তো ভয় পাচ্ছিল, যদি ছেলেটা কিছু করে বসে। হয়তো কোন কারণে তাকে হুমকি দিয়ে রেখেছে ছেলেটা।'

'কিন্তু কেন করবে কিডন্যাপ?'

'আমি কি করে জানব?' হাত ওল্টাল মুসা। 'হয়তো রাজনৈতিক কোন ব্যাপার। চন্দ্রাবতী রাজার মেয়ে, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ঘটতেই পারে।'

'তা পারে,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'অ, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি তোমাকে; চিড়িয়াখানার সিকিউরিটি গার্ড ড্যানি হাওয়ার্ডের ব্যাপারে কতটা জানো?'

'একবার মাত্র কথা হয়েছে আমার সঙ্গে,' মুসা বলল। 'ভাল লোক বলেই তো মনে হয়েছে। দেয় চিড়িয়াখানা পাহারা, কিন্তু নেশা অন্য কিছুতে–ও একজন শখের জীববিজ্ঞানী। ডক্টর হেমিঙের সহকারী। কিন্তু তাকে রাখতে পারছেন না আর ডক্টর হেমিং, ফান্ডের অভাবে ছেড়ে দিতে হচ্ছে।'

'তাই নাকি?' অন্যমনস্ক ভঙ্গিটা চলে গেল কিশোরের। 'টাকার অভাবে একজন সহকারীকে বিদেয় করে দিতে হচ্ছে, বলেছেন। তারমানে ড্যানিকেই।' চট করে দ্রুত আরেকবার চিমটি কাটল নিচের ঠোঁটে। 'এবং তারমানে চিড়িয়াখানায় স্যাবটাজ করার পেছনে তারও যথেষ্ট মোটিভ আছে।'

'কিন্তু রাজকুমারী আসছে কি করে এর মধ্যে?' আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসতে চাইল মুসা।

'জানি না,' আনমনে মাথা নাড়ল কিশোর, 'এখনও বলা যাচ্ছে না কিছু।'

একটা হাই-রাইজ ডরমিটরি বিল্ডিঙের পার্কিং লটে গাড়ি ঢোকাল রবিন।

নেমে পড়ল তিনজনে।

ডরমিটরির লবিতে সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হলো ওদের, যে মুসার পরিচিত। ওদেরকে ওপরতলায় নিয়ে গেল সে। চন্দ্রাবতীর ঘরের একটা বাড়তি চাবি জোগাড় করে দিল অফিস থেকে।

মেয়েটাকে ধন্যবাদ আর কাজ শেষ হলে চাবিটা ফেরত দেয়ার কথা বলে চাবি হাতে চন্দ্রাবতীর ঘরের দিকে এগোল মুসা। সঙ্গে কিশোর আর রবিন।

তালা খুলল মুসা। ছোট, চমৎকার আসবাবপত্রে সাজানো, গোছানো একটা ঘরে ঢুকল ওরা। বিছানা, ড্রেসার, ডেস্ক, চেয়ার–সব জিনিসই খুব দামী। তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সস্তা জায়গায় একজন রাজকুমারী থাকবে না। দেয়ালে ঝোলানো একটা বিখ্যাত রক গ্রুপের ছবি। বিছানাটা পাতা। জিনিসপত্র সব যেটা যেখানে থাকার কথা, রয়েছে; গোছগাছ করা।

'ধস্তাধস্তির তো কোন চিহ্ন দেখছি না,' চারপাশে তাকাতে তাকাতে বলল কিশোর। 'তাকে যদি এখান থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকে, খুব চতুরতার সাথে কাজটা করেছে।'

'হুঁ।' ডেস্কের ওপর একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি চোখে পড়ল রবিনের। 'ওর চিতাটাকে যে ভাবে সরিয়েছে।'

প্রথমে ঘরটায় ভালমত চোখ বোলাল কিশোর। তারপর যাতে আঙুলের ছাপ না পড়ে কোথাও সেজন্যে হাতে একটা রুমাল জড়িয়ে গিয়ে ডেস্কের ড্রয়ার ধরে টান দিল, 'আশা করি, এ ভাবে জিনিসপত্র ঘাঁটছি, তাতে রাজকুমারী কিছু মনে করবে না।'

'কি খুঁজছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'জানতে চাই, ছেলেটার সঙ্গে কি সম্পর্ক রাজকুমারীর।'

'আমার কথা বলছ নাকি?' দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠ; ইংরেজিতেই বলেছে, কিন্তু কথায় ভারী স্বদেশী টান।

ঝটকা দিয়ে হাতলের কাছ থেকে হাতটা সরিয়ে আনল কিশোর। ঝুঁকে থাকা ভঙ্গিতেই মাথা ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকাল। সেই রহস্যময় ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে। জ্বলন্ত কয়লার মত জ্বলছে তার চোখের তারা। আস্তে একটা পা রাখল ভেতরে। ডান হাতটা পেছনে। হাতে কিছু আছে।

'এখানে কি তোমার?' কড়া গলায় প্রশ্ন করল মুসা।

'আমি কথা বলছি,' হাত তুলে মুসাকে থামাল কিশোর, যদি কোন অঘটন ঘটিয়ে বসে এই ভয়ে। ছেলেটা কতখানি বিপজ্জনক, হাতে পিস্তল-টিস্তল আছে কিনা আগে জানা দরকার।

'এখানে আমার আসার অধিকার আছে,' চোখের তারার মতই আগুন লেগেছে যেন ছেলেটার গলার স্বরেও। 'প্রশ্নটা বরং আমি করতে পারি—তোমরা এখানে কি করছ?'

রেগে উঠল মুসা, 'তুমি জিজ্ঞেস করার কে? তুমি তো কিডন্যাপ করেছ চন্দ্রাবতীকে! করোনি?'

'খবরদার! বাজে কথা বলবে না!' এগিয়ে এল ছেলেটা। ডান হাতটা সামনে আনল। হাতে ধরা ভোজালীর মত এক ছুরি। হাতলটা হাতির দাঁতে তৈরি। বাতাসে কোপ মারল সে।

ঝিক করে উঠল ঝকঝকে বাঁকানো ফলাটা।

এগারো

'এ সব করে ভয় দেখাতে পারবে না আমাদের,' সামনে ছুটে গেল মুসা।

'খবরদার!' চিৎকার করে উঠল ছেলেটা। 'আগে বাড়বে না বলে দিলাম!' আবার বাতাসে কোপ মারল সে।

হম্বিতম্বিতে আরও রেগে গেল মুসা। 'নিকুচি করি তোর ভোজালীর!' বলে লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল সামনে। ছেলেটা ছুরি চালানোর আগেই তার কব্জি চেপে ধরে মারল প্রচণ্ড এক মোচড়। ব্যথায় ককিয়ে উঠল ছেলেটা। হাত থেকে খসে পড়ে গেল ছুরি।

বাধা দেয়ার কোন সুযোগই ওকে দিল না মুসা। হাত ধরে ঠেলে নিয়ে গেল দেয়ালের কাছে। চেপে ধরল দেয়ালের সঙ্গে। 'জলদি বলো, কেন এসেছ?'

কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। মুসার মত রাগেনি সে। শান্তকণ্ঠে মুসার কথার প্রতিধ্বনি করল, 'হ্যাঁ, বলো, কেন এসেছ?'

ছাড়া পাওয়ার জন্যে জোরাজুরি শুরু করল ছেলেটা। এগিয়ে এসে তার অন্য হাতটা চেপে ধরল রবিন।

'ছাড়ো আমাকে, ছেড়ে দাও!' চিৎকার করে বলল ছেলেটা। 'তোমরা কেন এসেছ, আগে সেকথা বলো!'

'আমাদের সন্দেহ, রাজকুমারীকে কিডন্যাপ করা হয়েছে,' জবাব দিল কিশোর। 'আমরা গোয়েন্দা। সত্র খুঁজতে এসেছি। সে কোথায় আছে, তুমি কি কিছু বলতে পারো?'

'কিডন্যাপ!' জোরাজুরি থামিয়ে দিল ছেলেটা। 'চন্দ্রাবতীকে কিডন্যাপ!' তার চোখে শঙ্কার ছায়াটা আসল বলেই মনে হলো কিশোরের। 'সত্যি বলছি, আমি কিচ্ছু জানি না!'

'আমরা কে সেটা তো শুনলে। এখন বলো তো, তুমি কে?'

'আমার নাম রত্নসূর্য ভানুস্বামী,' গর্বিত ভঙ্গিতে বলল ছেলেটা।

'মাশআল্লাহ্!' বাঁকা হাসি হাসল মুসা, 'নাম তো বাগিয়েছ একখান ভালই। একনাগাড়ে দশ বার বললে এক জগ পানি খাওয়া লাগবে।'

হাত নেড়ে মুসাকে চুপ করতে ইশারা করল কিশোর। ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল, 'চন্দ্রাবতীর পেছনে লেগেছ কেন?'

'চন্দ্রাবতী আমার বাগদত্তা। আমেরিকায় পড়ার জন্যে জেদ ধরল সে। বাধ্য হয়ে ওর বাবা এখানে পাঠিয়েছেন। আমার বাবাও এখানে পাঠিয়ে দিলেন আমাকে, লেখাপড়াও করব, সেই সঙ্গে চন্দ্রাবতীকেও পাহারা দিতে পারব। ঠিক হয়েছে, লেখাপড়া শেষ হলে দেশে ফিরে গিয়ে আমাদের বিয়ে হবে। সব ভালই চলছিল, কিন্তু মাসখানেক আগে থেকে কেমন নীরস আচরণ শুরু করল চন্দ্রাবতী। আমার সঙ্গে আর হেসে কথা বলে না, এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। এ নিয়ে আলোচনা করতে চাইলাম ওর সঙ্গে, সেজন্যেই সেদিন পেছন পেছন গিয়েছিলাম। কিন্তু কোনমতেই সে কথা বলতে চাইল না আমার সঙ্গে।'

'আমাদের এ কথা বলল না কেন সে?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'হয়তো সঙ্কোচ। ব্যক্তিগত কথা বলতে বাধছিল তার,' জবাব দিল ভানুস্বামী। 'তোমরা ওর নতুন বন্ধু। কিছুদিন গেলে হয়তো বলত।'

'ওর যদি বন্ধুই হই আমরা, যদি বোঝো,' মেঝেতে পড়ে থাকা ছুরিটা দেখাল কিশোর চোখের ইঙ্গিতে, 'আমাদের মারতে এলে কেন?'

দ্বিধা করল ভানুস্বামী। 'দেশে আমাকে ভানু বলে ডাকে সবাই। ইচ্ছে করলে

তোমরাও শর্ট করে ডাকতে পারো।' মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল। 'ছেড়ে দিলে শান্তিতে বলতে পারতাম।'

কিশোরের দিকে তাকাল দুজনে। মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ছেড়ে দিয়ে সরে এল মুসা আর রবিন।

মুসার দিকে তাকাল ভানু। কব্জি ডলতে ডলতে বলল, 'উফ্, ভেঙেই দিয়েছিলে! এত জোরে কেউ মোচড় দেয়।'

মুচকি হাসল রবিন। ভয় দেখাল, 'কাজেই বোঝো। কোন রকম চালাকি করতে যেয়ো না আর। ভয়ানক বদমেজাজী ও। বেশি খেপে গেলে আমি আর কিশোর মিলেও ঠেকাতে পারব না। কত মানুষের ঘাড় মটকেছে ও।'

চোখ বড় বড় করে মুসার দিকে তাকিয়ে রইল ভানু। মাথা নাড়ল, 'না, আর ওকে ছুরির ভয় দেখাব না। বিশ্বাস করো।'

কিশোরও হেসে ফেলল। রত্নখচিত, হাতির দাঁতে তৈরি ছুরির ফলাটার ওপর দৃষ্টি আটকে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। ভানুর দিকে তাকাল, 'ছুরিটা কিন্তু সুন্দর।'

'ওটা আমার দাদার জিনিস,' ভানু বলল। 'ছোটবেলা থেকেই আমার খুব প্রিয়। আসার সময় দাদা তাই আমাকে উপহার দিয়েছে। আমি আজকে নিয়ে এসেছিলাম চন্দ্রাবতীকে উপহার দেয়ার জন্যে। আর তোমাদের মারা তো দূরের কথা, ভয় দেখানোরও কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। তাই তো লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু এমন সব কথা বলা শুরু করলে...' দ্বিধা করল সে। 'তা ছাড়া তোমাদের ওপর জেলাসও হয়ে গিয়েছিলাম আমি। আমার চেয়ে চন্দ্রাবতী তোমাদের বেশি পছন্দ করছে দেখে...'

'তোমার সঙ্গে যে ওর বাগদান হয়েছে, তার প্রমাণ কি?' ভুরু নাচাল রবিন।

'ডেস্কের ওপরের ড্রয়ারে একটা ফটোবুক পাবে। ইচ্ছে করলে দেখতে পারো ওটা।'

হাতে রুমাল জড়িয়ে রেখেই ড্রয়ারটা টেনে খুলল কিশোর। অ্যালবামটা নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করল। পরিবারের সঙ্গে, বন্ধুদের সঙ্গে আর তুষার চিতাটার সঙ্গে তোলা প্রচুর ছবি রয়েছে চন্দ্রাবতীর। পর পর কয়েকটা পাতায় পাওয়া গেল ভানুর সঙ্গে তোলা বেশ কয়েকটা ছবি। কোনটাতে পরিবারের লোক রয়েছে, কোনটাতে দুজনে একা।

মুখ তুলল কিশোর, 'ও সত্যি কথাই বলছে। অন্তত ছবি দেখে সে-রকমই মনে হচ্ছে। এখন চন্দ্রাবতী যদি ওকে পছন্দ না করে, আমাদের কিছু করার নেই।'

ছুরিটা তুলে নিল ভানু। 'যাই। চন্দ্রাবতীকে যে পাওয়া যাচ্ছে না, পুলিশকে জানানো দরকার। এ দেশে আসাই উচিত হয়নি আমাদের। তাহলে আর এই অঘটন ঘটত না।'

বেরিয়ে গেল ভানু।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'ওর কথা বিশ্বাস করেছ?'

'বাগদত্তা হলেও,' রবিন বলল, 'ইদানীং যেহেতু চন্দ্রাবতী আর ওকে পছন্দ করতে পারছে না, রাগের মাথায় সে-কারণেও তাকে কিডন্যাপ করে বসতে পারে ভানু; কি বলো, কিশোর?'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'আমার মনে হয় সত্যি কথাই বলেছে সে। মুসা, তুমি ডরমিটরিতেই থাকো। খোঁজ-খবর করে দেখো নতুন কোন তথ্য বের করতে পারো কিনা। আমি আর রবিন চিড়িয়াখানায় যাচ্ছি। ডক্টর হেমিঙের সঙ্গে আরেকবার কথা বলতে হবে। তাঁর সহকারী ড্যানি সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আছে।'

গাড়িতে ফিরে ড্রাইভিং সীটে বসল রবিন। এখন তার পাশে বসল কিশোর। সেলুলার ফোনে কথা শুনতে লাগল। ওয়ালগ্রপদের ফোন মেশিন ট্যাপ করে এসেছিল। কয়েক মিনিট পর রবিনকে জানাল, 'নিকের জন্যে একটা মেসেজ রেখে গেছে রায়না। আজ বিকেল ছয়টায় হ্যাংম্যান নামে একটা জায়গায় দেখা করতে বলেছে।' এক মুহূর্ত থামল সে। 'ওই সময়ের মধ্যে যদি কেসটার সমাধান করতে না পারি, ওয়ালগ্রপদের পিছু নেব আবার। এখন আরেকটু জোরে চালানোর চেষ্টা করো। হাতে সময় বড় কম।'

বারো

তিরিশ মিনিট পর। চিড়িয়াখানার ভেতরে দ্রুতপায়ে হেঁটে চলেছে দুই গোয়েন্দা। কালো মেঘগুলো এখন শহরের আকাশ থেকে বেরিয়ে গেছে, রেখে গেছে বাতাসে প্রচুর আর্দ্রতা আর আগস্টের অসহ্য আঠা আঠা গরম। যাঁকে খুঁজছিল, কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখা পাওয়া গেল তাঁর।

আগে দেখতে পেল রবিন। হাত তুলে বলল, 'দেখো।'

ক্যাঙারুর ঘেরের কাছাকাছি ড্যানির সঙ্গে তপ্ত স্বরে কথা বলছেন ডক্টর হেমিং।

'আড়ি পাতা যাক,' বলে হালকা ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল কিশোর।

সঙ্গে চলল রবিন।

জায়গাটা সমতল। ঘাসে ঢাকা। অস্ট্রেলিয়ার তৃণভূমির অনুকরণে সাজানো। ক্যাঙারু দেখার ভান করতে লাগল দুজনে। কান খাড়া রেখেছে কথা শোনার জন্যে।

'ভিডিও টেপটা আমার করা,' ড্যানি বলছে। 'আপনার রাখার কোন অধিকার নেই।'

'কিন্তু ভিডিও করার সময় আমার আন্ডারে ছিলে তুমি,' ডক্টর হেমিং বললেন। 'তোমাকে তো বললামই একটা কপি করে তোমাকে দেব।'

'আমি কপি চাই না! আমার আসলটাই দরকার। দেখুন, ডক্টর, গবেষণাটা আমি করেছি, জিনিসটা আমার কাছেই থাকা উচিত। আমি বরং আপনাকে একটা কপি দিতে পারি। আসলটা থাকলে বিজ্ঞানী হিসেবে ভবিষ্যতে আমার কাজে লাগবে, আমার ক্যারিয়ারের জন্যে জরুরী।'

'নাহ্, তোমাকে বোঝানোর সাধ্য আমার নেই!' হাল ছেড়ে দিলেন ডক্টর হেমিং। 'থাকগে, তোমার জিনিস তুমি নিয়ে যাও। রিসার্চ রুমে ফাইলিং কেবিনেটের পেছনে রেখেছি। নিয়ে নাওগে।'

দুই পায়ে ভর করে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসতে লাগল একটা ক্যাঙারু।

ক্যাঙারুটাকে অনুসরণ করে নজর ঘুরতেই দুই গোয়েন্দার ওপর চোখ পড়ল ড্যানির।

'হাই, ড্যানি,' কিশোরের ভঙ্গি দেখে মনে হলো এইমাত্র দেখল ড্যানিকে। 'কি একেকখান লাফ দেয় ক্যাঙারুরা, দেখেছেন! ওরিব্বাপরে!'

'হ্যাঁ,' নীরস কণ্ঠে জবাব দিল ড্যানি। 'মারসুপিয়ালদের নিয়ে আলোচনার সময় নেই আমার এখন। চলি। জরুরী কাজ আছে।' লম্বা লম্বা পা ফেলে সরে যেতে লাগল ঘেরের কাছ থেকে।

'ড্যানি, শুনুন,' ডাক দিল কিশোর।

'এই, শোনো, দাঁড়াও,' জ্বলন্ত চোখে দুই গোয়েন্দার দিকে তাকালেন ডক্টর হেমিং। 'আমি সব শুনেছি। চিড়িয়াখানার বন্ধু নও তোমরা, গোয়েন্দা, ড্যানি বলেছে আমাকে। কাল রাতে নাকি সারা চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেড়িয়েছ। ওর সন্দেহ, আমার ল্যাবরেটরিতে চুরি করে তোমরাই ঢুকেছিলে। ঢুকেছ যে কি করে বুঝলাম? কাগজপত্র সব অগোছাল। বোম্যানকে বলব, ঘাড় ধরে যেন বের করে দেয় তোমাদের। কোনমতেই আর ঢুকতে না পারো।'

'গেল!' বিড়বিড় করল রবিন।

পরিচয় যখন ফাঁসই হয়ে গেছে ডক্টর হেমিঙের কাছে, ঢাখঢাকের মধ্যে আর গেল না কিশোর, জিজ্ঞেস করল, 'কি আছে ভিডিও টেপটার মধ্যে, যেটা নিয়ে তর্কাতর্কি করছিলেন এতক্ষণ?'

'সেটা তোমার ব্যাপার নয়!' ধমকে উঠলেন ডক্টর হেমিং। 'ভালয় ভালয় চলে যাও, নইলে দেব শিম্পাঞ্জিগুলোকে লেলিয়ে।'

'কাল রাতে যা করেছিলেন,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রবিন।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল ডক্টর হেমিঙের। 'কি বলছ? কাল রাতে চিড়িয়াখানায় ছিলামই না আমি। বাড়িতে ছিলাম।'

স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। সত্যি বলছেন কিনা বুঝতে চাইছে। মনে হলো, সত্যিই বলছেন। তার সন্দেহটা যাচাই করে নেয়ার জন্যে বলল, 'ডক্টর হেমিং, আমাদের বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, ববি, টপ আর বেবি জুপিটারকে ব্যবহার করছে ড্যানি, চিড়িয়াখানায় স্যাবটাজ করানোর কাজে। দয়া করে যদি বলেন, যে ভিডিও টেপটা পাওয়ার জন্যে সে মরিয়া হয়ে উঠেছে, ওটাতে কি আছে, অনেক উপকার হবে।'

দ্বিধা করতে লাগলেন ডক্টর হেমিং। বলবেন কিনা সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না যেন। 'আমার শিম্পাঞ্জি দিয়ে স্যাবটাজ করিয়েছে?' ভুরু কুঁচকালেন তিনি। 'ড্যানি আমার সহকারী হিসেবে কাজ করেছে। সে দেখতে চেয়েছিল মানুষের মত টুলস ব্যবহার করতে পারে নাকি শিম্পাঞ্জিরা। অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য ফলাফল। ভিডিও টেপে রেকর্ড করে রেখেছে দৃশ্যগুলো।'

চট করে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন ডক্টর হেমিং। 'কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ওকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। টেপটা রেখে দিয়েছিলাম। কাল এসে আমার কাছে ওটা চাইল সে। দেব না, মানা করে দিয়ে লুকিয়ে ফেললাম। কিন্তু ওর চাপাচাপিতে

বিরক্ত হয়ে একটু আগে বলে দিয়েছি কোথায় আছে।'

'টেপটা পাওয়ার জন্যে কেন অস্থির হয়ে উঠেছে, বোধহয় বুঝতে পারছি,' রবিন বলল। 'স্যাবটাজগুলো কিভাবে করা হয়েছে, ভিডিও টেপের ছবি সেটা প্রমাণ করতে সাহায্য করবে। শিম্পাঞ্জিগুলোকে সে কি শিখিয়েছে, সেটা দেখলে পুলিশের কোন সন্দেহ থাকবে না আর।'

'ঠিক,' বলে উঠল কিশোর, 'আর সেজন্যেই আসল ক্যাসেটটা হাতে পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে সে, যাতে ধ্বংস করে ফেলে সব প্রমাণ নষ্ট করে দিতে পারে। জলদি এসো!'

ল্যাবরেটরির দিকে দৌড় দিল সে। দরজা খোলা। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। হলঘরটা খালি। নিজেদের খোঁয়াড়ে বসে গভীর মনোযোগে কাঠের একটা খেলনা ঘর বানাচ্ছে শিম্পাঞ্জিগুলো।

'গেল কোথায়?' এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে অফিসের দিকে এগিয়ে গেল রবিন। উঁকি দিল ভেতরে।

কিশোরও এসে দাঁড়াল তার পাশে। ফাইলিং কেবিনেটটা দেয়ালের কাছ থেকে সরানো। একটা পাশ অনেক বেশি ফাঁক হয়ে আছে। 'নিয়ে গেছে টেপটা!'

'নষ্ট করে ফেলার আগেই ওকে খুঁজে বের করতে হবে,' জরুরী কণ্ঠে বলল রবিন। 'প্রমাণ না থাকলে আর ওকে আটকানো যাবে না।'

ওদের নজর আকর্ষণের জন্যে 'উফ্-উফ্' শুরু করল ববি। ফিরে তাকিয়ে কিশোর দেখল উৎসুক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে শিম্পাঞ্জিটা।

'ড্যানি হাওয়ার্ড কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। আশা করল, বুঝতে পারবে ববি।

শিকের ফাঁক দিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল ববি, একেবারে মানুষের মত করে। দেখাদেখি তার পাশে ছুটে এসে একই কাণ্ড করল টপ আর বেবি জুপিটার।

'টাকা চাইছে ওরা!' চিৎকার করে উঠল রবিন। বিশ্বাস করতে পারছে না। 'ঘুষ না দিলে বলবে না!'

নষ্ট করার সময় নেই। ওয়ালেট খুলে তিনটা এক ডলারের নোট বের করে শিম্পাঞ্জিগুলোর বাড়ানো হাতের তালুতে ফেলে দিল কিশোর। টাকা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে ঘরের অন্য প্রান্তের একটা খোলা জানালা দেখাতে লাগল ওগুলো।

জানালার কাছে ছুটে গেল রবিন। ড্যানিকে দৌড়ে যেতে দেখল। অনেক দূরে চলে গেছে।

'ওই যে! পালাচ্ছে!' এক মুহূর্ত দেরি না করে জানালার চৌকাঠে উঠে বসল রবিন। লাফ দিয়ে নেমে গেল বাইরে।

স্প্রিঙের পুতুলের মত লাফাতে শুরু করল শিম্পাঞ্জিগুলো। চিৎকার করছে। জোরে জোরে হাততালি দিচ্ছে। যেন উত্তেজনায় ভরা কোন টিভি শো দেখছে।

'তোমাদের তুলনী হয় না,' শিম্প্যাঞ্জিগুলোর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল কিশোর। 'থ্যাংক ইউ।'

রবিনের মত করেই জানালা টপকাল। ড্যানিকে ধরার জন্যে পিছু নিল রবিনের। প্রাণপণে ছুটছে দুজনে। দূরত্ব কমিয়ে ফেলছে দ্রুত। ড্যানির হাতের ক্যাসেটটা

এখন দেখতে পাচ্ছে। কি ভেবে ফিরে তাকাল ড্যানি। দুই গোয়েন্দাকে দেখে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে আরেক দিকে ঘুরে গেল সে। যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে না গিয়ে এক ছুটে ঢুকে পড়ল 'বারাম্বি'তে। বারাম্বি হলো আফ্রিকার অনুকরণে তৈরি ওখানকার এক ধরনের গ্রাম। দুই গোয়েন্দাও এসে ঢুকল ওই নকল গ্রামে। মাটির দেয়ালওয়ালা এক গুচ্ছ কুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে, শনের চালা। ঢাক বাজছে গোপন স্পীকারে। একটা কুঁড়ের সামনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে কিছু দর্শক। ফাস্ট-ফুড বিক্রি হচ্ছে ওখানে।

দৌড়ে গিয়ে গিয়ে প্রতিটি ঘরে ঢুকে দেখে এল রবিন আর কিশোর। ড্যানিকে দেখল না।

'গেল কোথায়?' কান ঝালাপালা করা ঢাকের শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল রবিন।

'ওই তো!' কিশোরও চিৎকার করে উঠল।

ওর নির্দেশিত দিকে তাকিয়ে রবিনও দেখল, মনোরেলে চড়ার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো এক সারি দর্শককে ঠেলে-ধাক্কিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ড্যানি।

দুই গোয়েন্দা যখন প্ল্যাটফর্মে পৌঁছল, ড্যানি তখন মনোরেল ট্রেনের একটা অ্যাকোয়া কার থেকে টেনে-হিঁচড়ে নামাচ্ছে কয়েকটা ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে।

'সাফারিতে যাওয়ার যাত্রীরা গাড়িতে উঠুন,' লাউডস্পীকার মুখে ঠেকিয়ে ঘোষণা করল ট্রেনের ড্রাইভার।

লাফিয়ে কারে উঠে পড়ল ড্যানি। ক্যাসেটটা এখনও ওর হাতে রয়েছে, নজর এড়াল না রবিনের।

চলতে শুরু করল মনোরেল।

ড্যানি যেটাতে উঠেছে তাতে উঠতে দেবে না, বুঝতে পারছে রবিন। তার পেছনের কারে দেখল শুধু দুজন বুড়ো-বুড়ি বসে আছে। একলাফে উঠে পড়ল ওটার পা-দানিতে। ভেতরে ঢুকে বসল। অবাক চোখে ওকে দেখতে লাগল বৃদ্ধ যাত্রীরা।

'এই সাফারি আমাদের সাভানার ওপর দিয়ে নিয়ে যাবে,' বলে চলেছে ড্রাইভার। 'আফ্রিকার সীমাহীন তৃণপ্রান্তরকে বলে সাভানা। আফ্রিকায় বুনো জানোয়ার দেখার জন্যে সাভানার চেয়ে ভাল জায়গা আর হয় না।'

লাইন বেয়ে ছুটে চলেছে মনোরেল। কারের কিনার দিয়ে ঝুঁকে তাকাল রবিন। পরের কারে দেখতে পেল ড্যানিকে। একলা বসে আছে। ক্যাসেট থেকে ফিতেটা টেনে বের করার চেষ্টা করছে।

'ড্যানি, প্লীজ, নষ্ট করবেন না ওটা!' চিৎকার করে বলল সে।

'এটা আমার জিনিস,' চিৎকার করেই জবাব দিল ড্যানি। 'আমার জিনিস আমি কি করব না করব, সেটা আমার ব্যাপার।'

'নিচের দিকে তাকিয়ে দেখুন,' ড্রাইভার বলছে, 'জেব্রার পাল চরতে দেখবেন।'

নিচে তাকাল রবিন। ঘাসে ঢাকা প্রান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কয়েকটা ছাতার মত গাছ। ছুটে চলেছে একপাল জেব্রা। সাদা-কালো ডোরা কাটা শরীরগুলো রোদে

চমকাচ্ছে।

'অসম্ভব দ্রুত ছুটতে পারে জেব্রারা,' ড্রাইভার বলল। 'শিকারী প্রাণী তাড়া করলে দৌড়ে পালাতে সুবিধে হয় ওদের।'

পরের কারের দিকে তাকাল আবার রবিন। ক্যাসেটের ফিতে বের করার চেষ্টা করছে ড্যানি। সবটা বের করে ফেলার আগেই কেড়ে নিতে হবে।

'আই, বসে পড়ো,' রুক্ষ কণ্ঠে বলল বৃদ্ধা।

'আমি চলে যাচ্ছি ওই কারে,' নরম স্বরে জবাব দিল রবিন।

আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে দেখল বৃদ্ধা, ফাইবার গ্লাসে তৈরি স্ট্রিপ–যেটা দুটো কারকে যুক্ত করে রেখেছে, অবলীলায় তাতে নেমে গেল ছেলেটা। দুটো কারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এখন সে।

'পাগল নাকি!' চিৎকার করে উঠল ড্যানি।

'প্লীজ, নষ্ট করবেন না ক্যাসেটটা!' অনুরোধ জানাল রবিন।

'নষ্ট আমি করবই।'

'জেব্রার সবচেয়ে ভয়াবহ শত্রুর এলাকা দিয়ে চলেছি আমরা এখন,' ড্রাইভার বলল। 'নিচে তাকালেই দেখতে পাবেন সিংহের পরিবার।'

হাত বাড়িয়ে ড্যানির কারের ছাতের কিনারটা ধরে ফেলল রবিন। এক দোলা দিয়ে শরীরটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল কারের দিকে।

'ভাগো এখান থেকে!' উঠে দাঁড়িয়েছে ড্যানি।

জবাবে কারের মধ্যে একটা পা ঢুকিয়ে দিল রবিন।

'ভাগো, ভাল হবে না বলছি!' আবার চিৎকার করে উঠল ড্যানি। রবিনের পেটে ঠেলা মারল। একটা হাত ফসকে গেল রবিনের। পড়ে যাচ্ছে।

মরিয়া হয়ে বাতাসে থাবা মারল রবিন। আঙুল ঠেকল কিসের কিনারে, ঠিক বুঝতে পারল না। ঝুলে রয়েছে। তার মনে হচ্ছে, ট্রেনটা থেমে রয়েছে, নিচে দিয়ে চলে যাচ্ছে আফ্রিকার তৃণভূমি।

'পড়ে যাচ্ছে! পড়ে যাচ্ছে!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল একজন যাত্রী।

'গাড়ি থামান! জলদি!' চেঁচিয়ে উঠল আরেকজন।

নিচে তাকাল রবিন। দোতলা-সমান উঁচুতে রয়েছে। পড়লে হাত-পা ভাঙার সম্ভাবনা প্রচুর। কিন্তু যা করার করে ফেলেছে। এখন বাঁচতে হলে আঁকড়ে ধরে রাখা ছাড়া উপায় নেই।

নিচে পড়ার আরও বিপদ আছে। সিংহগুলো তাকিয়ে রয়েছে ঠিক ওর দিকে। কয়েকটা চকচকে সিংহী, আর বিশালদেহী কেশরওয়ালা এক সিংহ। ওর চওড়া নাক, স্থির হলুদ দৃষ্টি, রাজকীয় কেশর থেকে আভিজাত্য যেন ফুটে বেরোচ্ছে। নিচের ওই প্রান্তরের কর্তৃত্ব ওর; কোন সন্দেহ নেই। ওর মুখের কাছে পড়লে, কি ঘটবে ভাবতে চাইল না রবিন।

চাকা ঘষার শব্দ হলো। ব্রেক চেপেছে ড্রাইভার। ঝাঁকি লেগে আঙুলগুলো ছুটে যাচ্ছে রবিনের। হাতের তালু ঘামে ভেজা, পিচ্ছিল। ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল।

ধমক দিয়ে তাকে ফেলে দেয়ার জন্যেই যেন এই সময় বিকট গর্জন করে

উঠল সিংহটা। মুখ হাঁ করে দেখিয়ে দিল ভয়ঙ্কর দাঁতগুলো। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে রবিনের দিকে।

তেরো

মুখ তুলে ড্যানিকে কার থেকে মাথা বের করে রাখতে দেখল রবিন। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল, 'আমাকে ধরুন, ড্যানি! আঙুল পিছলে যাচ্ছে!'

নীরবে ওর দিকে তাকিয়ে রইল ড্যানি।

বললেই বা কেন আমাকে সাহায্য করবে সে—ভাবছে রবিন। আমি ওকে জেলে ঢোকানোর ব্যবস্থা করতে চাইছি। কারের বাইরে মাথা বের করে অনেকেই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কিন্তু সাহায্য করা সম্ভব নয় ওদের পক্ষে, অনেক দূরে রয়েছে।

নিচে তাকিয়ে দেখল ধৈর্য ধরে তার অপেক্ষা করছে সিংহটা। যেন ভাবছে, পড়বেই তো, অস্থির হওয়ার কোন কারণ নেই। ধারাল দাঁত নিজের মাংসে বসে যাওয়ার ব্যথাটাও যেন অনুভব করতে পারল রবিন।

আরেকটু পিছলে গেল তার ঘামে ভেজা পিচ্ছিল আঙুল।

'আর কিছু না হোক,' ড্যানির দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল রবিন, 'আর কিছু না হোক, এটা অন্তত প্রমাণ করুন যে আপনি খুনী নন।'

'ধরছেন না কেন ছেলেটাকে?' চিৎকার করে বলল একজন লোক। 'পড়ে যাচ্ছে তো! জলদি ধরুন!'

কয়েকটা দীর্ঘ সেকেন্ড পার হয়ে গেল।

অবশেষে ঝুঁকে এসে হাত বাড়িয়ে দিল ড্যানি। রবিনের কব্জি চেপে ধরল। টেনে তুলল ওকে।

কারের মধ্যে পা রাখল রবিন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ধপ করে বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

'যাক, বাঁচল!' বলল অন্য কারের একটা লোক। আনন্দে হুল্লোড় করে উঠল যারা তাকিয়ে দেখছিল এতক্ষণ। হাততালি শোনা গেল। আবার চলতে শুরু করল মনোরেল।

ড্যানির দিকে তাকাল রবিন। হাতের কাছে ফেলে রেখেছে ক্যাসেটটা।

'প্রথমেই আমার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ধন্যবাদ জানাই আপনাকে,' রবিন বলল।

অন্য দিকে চোখ ফেরাল ড্যানি।

'ওই জানোয়ারগুলোকে ছেড়ে দেয়ার জন্যে আপনিই দায়ী, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

নার্ভাস ভঙ্গিতে ক্যাসেটটার গায়ে টোকা দিতে লাগল ড্যানি। মাত্র কয়েক ইঞ্চি ফিতা বেরিয়ে আছে। তাতে নষ্ট হয়নি ক্যাসেট।

'আমরা এখন একপাল অরিক্সের ওপর দিয়ে পেরোচ্ছি,' ঘোষণা করল ড্রাইভারের যান্ত্রিক কণ্ঠ। 'অ্যান্টিলোপ পরিবারের সদস্য এরা। এরাও সিংহের

খাবার।'

'চমৎকার ভাবে ঘটিয়েছেন স্যাবটাজের ঘটনাগুলো,' রবিন বলল আবার। 'ভিডিও টেপটা ছাড়া কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারবে না। তবে লোকে যখন ভাবতে আরম্ভ করবে চিড়িয়াখানায় আসা বিপজ্জনক, আসা কমিয়ে দেবে ওরা। টাকা আসা বন্ধ হয়ে যাবে চিড়িয়াখানার। উপার্জন কমে যাবে।'

মুখ ফেরাল ড্যানি। চোখে চোখে তাকানোর সুযোগ পেল রবিন। 'কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটা মনোমালিন্য হয়েছে আপনার, জানি; কিন্তু এটাও জানি জন্তু-জানোয়ারগুলোর জন্যে অপরিসীম ভালবাসা আপনার। ওদের স্বার্থে অন্তত মুখ খুলুন।'

ড্যানির নিচের ঠোঁট কেঁপে উঠল।

'শুনুন,' রবিন বলল, 'কয়েক মিনিট আগেই আমাকে তুলে এনে আপনি প্রমাণ করে দিয়েছেন অতটা খারাপ লোক নন আপনি। প্লীজ, বলুন, স্যাবটাজগুলো কি আপনিই করেছিলেন?'

'হ্যাঁ,' বলার সময় চোখ বুজে ফেলল ড্যানি।

'রাজকুমারী আর চিতাটাকে কি আপনিই কিডন্যাপ করেছেন?'

'রাজকুমারী?' চন্দ্রাবতীর নিরুদ্দেশের কথা শুনে চমকে গেল ড্যানি। 'কিডন্যাপড হয়েছে নাকি? কই, জানি না তো!'

'বেশ, স্যাবটাজগুলো কেন করলেন, সেটাই বলুন।'

সামান্য দ্বিধা করে বলতে শুরু করল ড্যানি, 'জুলুজিতে ডিগ্রি নেয়ার পর শিম্পাঞ্জির ওপর গবেষণা করে ক্যারিয়ার শুরু করব ঠিক করলাম। ডক্টর হেমিঙের সহকারী হিসেবে কাজ করার সুযোগটা যখন পেলাম, রীতিমত পুলকিত হয়েছিলাম। এ সব কাজ সচরাচর পাওয়া যায় না। আনন্দে আরও ভরে গেল মন যখন জানলাম, তানজানিয়ায় শিম্পাঞ্জির ওপর ফীল্ড রিসার্চ করতে যাচ্ছেন তিনি। আমার কাছে স্বপ্নের মত মনে হয়েছিল।'

'তারপর কর্তৃপক্ষ দিল আপনাদের ফান্ডটা মেরে,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ,' চশমাটা খুলে নিল ড্যানি। 'হঠাৎ করেই ডক্টর হেমিঙের যাওয়া বাতিল। তার ওপর বিদেয় করতে হলো আমাকে। আফ্রিকায় যাওয়া তো হলোই না আমার, চাকরিও খতম। দয়া করে চিড়িয়াখানায় থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিলেন বোম্যান, নাইট গার্ডের চাকরি দিয়ে। কিন্তু ও কি আমার পোষায়। মগজে আগুন জ্বলতে লাগল।'

'প্রতিশোধ নিতে চাইলেন আপনি,' কথা জুগিয়ে দিল রবিন।

'হ্যাঁ,' স্বীকার করতে আর দ্বিধা করল না ড্যানি। 'ভেবেচিন্তে একটা প্ল্যান করলাম; এক ঢিলে দুই পাখি মারার চিন্তা। প্রতিশোধও নেয়া হবে, শিম্পাঞ্জিগুলোর ওপর একটা মূল্যবান গবেষণাও চালানো যাবে।'

'টুলস ব্যবহার শেখালেন আপনি শিম্পাঞ্জিগুলোকে,' রবিন বলল। 'রাতের বেলা বের করে নিয়ে গেলেন। ওদের দিয়ে হট-ওয়্যার কাটালেন, ভেন্টের স্ক্রু খোলালেন, গাছের ডাল কাটালেন।'

'আমার গবেষণারই অঙ্গ ছিল এ সব। তবে চিড়িয়াখানার জন্যে ক্ষতির কারণ

হয়েছে বলে সেটা অপরাধের আওতায় পড়ে। শিম্পাঞ্জিরা ওসব করার সময় ছবি তুলে রেখেছিলাম। ভিডিও টেপটা নষ্ট করে ফেললে সব প্রমাণ শেষ হয়ে যেত, কিন্তু তাতে মূল্যবান দলিল নষ্ট হত, চেষ্টা করেও পারলাম না তাই,' শুকনো হাসি হাসল ড্যানি।

দুই হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি চেপে ধরল রবিন। মনে মনে স্বীকার না করে পারল না, ড্যানির গবেষণার বিষয়বস্তু সত্যি অসাধারণ; কিন্তু চিড়িয়াখানাকে এ ভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়াটা ছিল একটা বিপজ্জনক বোকামি।

'আমি শুধু চিড়িয়াখানাটার বদনাম করে দিতে চেয়েছিলাম,' কথা শুরু করার পর যেন কথার নেশায় পেয়েছে ড্যানিকে। 'কিন্তু বিশ্বাস করো, কারও কোন ক্ষতি হয়ে যাক, কেউ আহত হোক, এটা চাইনি। আমি জানতাম, চিড়িয়াখানার স্টাফরা খুব দক্ষ, বেরিয়ে যাওয়া প্রাণীগুলোকে খুব দ্রুত ধরে ফেলবে। বানর আর পাইথন মোটেও বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর নয়, আর বাঘকে না খোঁচালে মানুষের কোন ক্ষতি করে না।'

'এইবার আসছে জিরাফ,' লাউডস্পীকারে ঘোষণা করল ড্রাইভার। 'ডাঙার সবচেয়ে লম্বা জানোয়ার।'

নিচের তৃণভূমিতে দুটো জিরাফকে হেঁটে যেতে দেখল রবিন। ড্যানির দিকে তাকাল আবার, 'আপনিই রাতের বেলা শিম্পাঞ্জিগুলোকে আমাদের ওপর লেলিয়ে দিয়েছিলেন।'

'আমি বুঝতে পেরেছিলাম, চিড়িয়াখানায় সূত্র খুঁজে বেড়াচ্ছ তোমরা,' ড্যানি বলল। 'তারপর মনে পড়ল, ডক্টর হেমিঙের অফিসে ভিডিও টেপটা আছে। ওটা তোমাদের হাতে পড়লে বিপদে পড়ে যাব আমি। তাই গতরাতে তোমাদের চিড়িয়াখানায় ঘোরানো শেষ করে চলে গিয়েছিলাম ওটা আনতে।'

'কিন্তু আপনি ওটা বের করার আগেই ল্যাবরেটরিতে ঢুকে পড়লাম আমরা,' ড্যানির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল রবিন। 'শিম্পাঞ্জিগুলোকে কাঠ কাটাতে দেখে ঘাবড়ে গেলেন; বুঝলেন, আপনাকে সন্দেহ করে বসব আমরা। আমাদের ঠেকানোর জন্যে দিলেন খোঁয়াড়ের তালা খুলে। ওরা আমাদের মারাত্মক জখম করতে পারত, মেরেও ফেলতে পারত...'

'তোমাদের আসলে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চেয়েছিলাম আমি,' কৈফিয়তের সুরে বলল ড্যানি। 'অফিসেই দাঁড়িয়ে ছিলাম, বাই চান্স যদি খারাপ কিছু ঘটে যায়, তোমাদের সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু তোমরা অনেক চালাক...'

বাধা দিল রবিন, 'রাতেই ক্যাসেটটা বের করে নিলেন না কেন?'

'খুঁজে পাইনি। লুকিয়ে রেখেছিলেন ডক্টর হেমিং। আজকে তিনি বলার পর গিয়ে বের করেছি। যাই হোক...রবিন, সত্যি কথাটা বলি, আমাকে যে ধরে ফেলেছ তোমরা তাতে আমি অখুশি নই। এখন যা হয় হোক। অপরাধী মন নিয়ে চিড়িয়াখানায় কাজ চালিয়ে যেতে পারতাম না এমনিতেও।' ভিডিও ক্যাসেটটা রবিনকে দিয়ে দিল সে। 'নাও, তোমার কাছে গচ্ছিত রাখলাম। নষ্ট যেন না হয়।'

'এখন ঢুকছি আমরা হায়েনার রাজত্বে,' লাউডস্পীকারে ঘোষিত হলো। 'এরপর আর কিছু নেই। ঘাঁটিতে ফিরব আমরা। আশা করি এই সাফারি খুব উপভোগ

করেছেন আপনারা। ধন্যবাদ।'

কয়েক মিনিট পর প্ল্যাটফর্মে ফিরে এল মনোরেল। খুলে গেল স্বয়ংক্রিয় দরজাগুলো। সারি দিয়ে দাঁড়ানো কয়েকজন পুলিশের পেছনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে কৌতূহলী দর্শকেরা। দরজা খুলতেই রবিনদের কারের দিকে এগিয়ে এল চারজন পুলিশ।

ড্যানির হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল একজন অফিসার, 'অ্যারেস্ট করা হলো আপনাকে।'

রবিন নামতেই দৌড়ে এল কিশোর আর বোম্যান।

জিজ্ঞেস করল উদ্বিগ্ন কিশোর, 'তুমি ভাল আছ?'

হাসল রবিন, 'আছি। ড্যানি না বাঁচালে এতক্ষণে সিংহের পেটে চলে যেতাম।'

ড্যানির মুখে যা যা শুনেছে, খুলে বলল রবিন। শুনল কিশোর, বোম্যান আর একজন পুলিশ অফিসার। ক্যাসেটটা অফিসারকে দিয়ে বলল, দেখার পর যে অবস্থায় আছে সে-অবস্থায়ই আবার ফিরিয়ে দিতে, কোন ক্ষতি যেন না হয়। জোরের সঙ্গে জানিয়ে রাখল, ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে ড্যানি। কাজেই বিচারের সময় সেটা বিশেষ বিবেচনায় আনতে হবে।

দর্শকদের মাঝখান দিয়ে পথ করে ড্যানিকে নিয়ে চলে গেল পুলিশ। গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন বোম্যান, 'আজকে তোমাদের একটা কাজ দেখেই বোঝা গেল, সুখ্যাতিটা অর্জন করতে তিন গোয়েন্দাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে।'

'কিন্তু কেসটা এখনও শেষ হয়নি, মিস্টার বোম্যান,' কিশোর বলল। 'কান্তা আর রাজকুমারীকে এখনও উদ্ধার করতে পারিনি আমরা।'

'ড্যানি কিছু জানে না, আমি শিওর,' রবিন বলল। 'ও শুধু চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। কিডন্যাপিংটা ভিন্ন কেস, অন্য কারও কাজ।'

'চলো, হ্যাংম্যানে গিয়ে ওয়ালথ্রপদের ওপর নজর রাখি।' ঘড়ি দেখল কিশোর। 'ছয়টা বাজতে এখনও দেরি আছে। তবে আগেভাগে গিয়ে বসে থাকাই ভাল।'

'তোমাদের সাহায্য দরকার হবে?' জিজ্ঞেস করলেন বোম্যান।

'এখনও মনে হচ্ছে না। চলো, রবিন।'

বোম্যানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রওনা হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা।

'তোমার কি মনে হচ্ছে,' হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন, 'চন্দ্রাবতীর সঙ্গে কান্তার কিডন্যাপিঙের কোন সম্পর্ক আছে?'

'থাকাটাই স্বাভাবিক,' জবাব দিল কিশোর। 'তবে সেটা কি এখনও বুঝতে পারছি না।'

হাতির ঘেরের কাছে চলে এল দুজনে। গিনিকে দেখল শুঁড় দিয়ে তুলে তুলে ঘাস খাচ্ছে। একটা বাচ্চা হাতি খেলতে খেলতে ছুটে গিয়ে মাথা দিয়ে ওটার পেটে গুঁতো মারতে শুরু করল।

শুঁড় দিয়ে এক মুঠো ঘাস তুলে বাচ্চাটার দিকে বাড়িয়ে দিল গিনি। বাচ্চাটা ঘাস

মুখে নিয়ে চিবানো শুরু করতেই বিদ্যুৎ ঝলকের মত বুদ্ধিটা মাথায় এসে গেল কিশোরের।

রবিনের পাঁজরে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল সে, 'রবিন, দেখো, কি করে হাতিটা বাচ্চাটাকে খাওয়াচ্ছে।'

'হ্যাঁ, দেখছি। মায়েরা এ ভাবেই খাওয়ায়।'

'চন্দ্রাবতীও কান্তার কাছে মায়ের মত। চিতাটার পর পরই রাজকুমারীকে কিডন্যাপিঙের কারণটা বুঝে ফেলেছি। কান্তাকে নেয়ার পর কিডন্যাপার যখন দেখল ওকে খাওয়াতে পারছে না, চন্দ্রাবতীকে তুলে নিয়ে গেছে তখন।'

'ঠিক!' উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। 'চন্দ্রাবতীর কাপড়ের টুকরো ফেলে গন্ধ না শোঁকানো পর্যন্ত চিড়িয়াখানার লোকেরাই খাওয়াতে পারেনি চিতাটাকে, চোরে আর কি করে খাওয়াবে। ঠিক বলেছ। কান্তাকে নেয়ার পর রাজকুমারীকে কিডন্যাপ করেছে এ জন্যেই।'

'তাতে কোন সন্দেহ নেই,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

মুসাকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল। কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কোন্ একটা পাগল নাকি মনোরেল থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল?...তোমাদের মধ্যে কোনজন?'

'রবিন,' হেসে বলল কিশোর। 'তোমার কি খবর? তুমি আবার কোন পাগলামি করে এলে?'

'শুধু শুধু বসে থাকতে তো ভাল্লাগল না,' মুসা বলল। 'সারা ক্যাম্পাসে প্রশ্ন করে বেড়াতে লাগলাম। ভানুস্বামী খুব ভাল স্বামী হওয়ার উপযুক্ত। কোন বদনেশা নেই, দোষের কাজ করে না, ক্লাসে ফাঁকি দেয় না। আমেরিকানদের দুচোখে দেখতে পারে না। সারাক্ষণ মন খারাপ করে থাকে।'

'ভাবীবধূ কথা না শুনলে মন তো খারাপ হবেই,' হাসল রবিন। 'ও-ই চুরি করে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখেনি তো?'

'মনে হয় না,' আবার ঘড়ি দেখল কিশোর। 'রবিন, একদিনে অনেক পরিশ্রম করেছ তুমি, আর অ্যাকশনে গিয়ে কাজ নেই। আমি মুসাকে নিয়ে ওয়ালগ্রপদের দেখতে যাচ্ছি। তুমি বাড়ি চলে যাও। কান্‌ঝায় চন্দ্রাবতীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করোগে ফোনে। পুলিশের কাছে শুনলাম, কিডন্যাপিঙের খবরটা চন্দ্রাবতীর পরিবারকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। ভানুর ব্যাপারে কোন নতুন তথ্য পাওয়া যায় কিনা দেখো।'

'ঠিক আছে দেখব,' রবিন বলল। 'ভাল কথা, ডক্টর হেমিংকে তো এখন আর কোন অপরাধের সঙ্গে জড়ানো যাচ্ছে না। ড্যানি তো স্বীকারই করেছে, স্যাবটাজগুলোর জন্যে দায়ী সে একা। তাহলে ডক্টর হেমিং?'

'তিনি আপাতত সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ,' মুসা বলল। 'প্রধান সন্দেহ এখন দুই ওয়ালগ্রপকে।'

'কিন্তু মনটা খুঁতখুঁত করছে আমার,' নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'কোথায় যেন কি একটা মিস হয়ে গেছে। আমরা জানি, অথচ জানি না।'

'ব্যস, শুরু হলো গ্রীক ভাষা!' আঁতকে ওঠার ভান করল মুসা। 'চলো চলো, যে

কাজে যেতে চাইছিলে, সেটাই করিগে।'

হাঁটতে হাঁটতে ভালুকের ঘেরের কাছে চলে এল ওরা। চোখ ঝলসানো সাদা কৃত্রিম তুষার তৈরি করা হয়েছে। সাদার পটভূমিতে দুটো সাদা মেরুভালুককে খুঁজে বের করতে চোখ দুটোকে বহু কসরত করাতে হলো রবিনের। ভালুক দুটোর কালো নাক বেইমানী করল ওদের সঙ্গে, অস্তিত্ব ফাঁস করে দিল।

হেলেদুলে গিয়ে একটা প্লাস্টিকের বালতির কাছে দাঁড়াল একটা ভালুক। থাবা দিয়ে ঠেলা মারতে লাগল খেলার ছলে।

'মোটেও ভয়ঙ্কর লাগছে না ওকে,' রবিন মন্তব্য করল।

'ভুলেও কাছে যেয়ো না ওর,' সাবধান করে দিল মুসা। 'সারা চিড়িয়াখানায় সবচেয়ে হিংস্র ওই মেরুভালুক। খেলতে খেলতে তোমাকে মেরে ফেলবে ও। এক থাবা খেলেই তোমার মুখ আর মুখ থাকবে না, চিরে ফালা ফালা।'

'কিন্তু খুব সুন্দর।'

'চেহারা দেখে সব সময় আসল চরিত্র বোঝা যায় না। অনেক মানুষের মত।'

তার কথা প্রমাণ করে দেয়ার জন্যেই বালতিটাকে ভয়ানক এক থাপ্পড় মারল ভালুকটা।

ওই থাবা নিজের মুখে পড়লে কি ঘটত, কল্পনা করে আর ভালুকের খাঁচার কাছে দাঁড়াতে চাইল না মুসা। তাগাদা দিল কিশোরকে, 'চলো, এখানে সময় নষ্ট না করে আসল কাজে যাই।'

চোদ্দ

সাড়ে পাঁচটায় মুসার গাড়িতে করে হ্যাংওয়ের কাছাকাছি এসে পৌঁছল মুসা আর কিশোর। শহরের বাইরে এই এলাকাটাতে মাংস টিনজাত করার কারখানা। বাতাসে এক ধরনের বোটকা গন্ধ। এলাকাটা মোটামুটি নির্জন। প্রচুর ট্রাক দেখা যাচ্ছে বড় বড় বাড়িগুলোর সামনে। ওই বাড়িগুলো মাংস টিনজাত করার কারখানা।

'ওই যে ওটা!' একটা বাড়ির দিকে হাত তুলল কিশোর। দরজায় নাম লেখা বোর্ড লাগানো রয়েছে : হ্যাংওয়ে। কিছুদূরে গাড়ি রেখে বাড়ির দিকে তাকিয়ে বসে রইল ওরা।

বেরিংটনকে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে অবাক হয়ে গেল। দুই হাতে কার্ডবোর্ডের দুটো বড় বড় বাক্স। যথেষ্ট ভারী, পেটের সঙ্গে চেপে ধরার ভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে। হাঁটার তালে তালে সিংহের কেশরের মত নাচছে তাঁর ঘাড়ের লম্বা সাদা চুলের বোঝা।

'শিকারী কোটিপতি এখানে কি করছেন?' মুসার প্রশ্ন।

'মাংস কিনতে এসেছেন হয়তো,' জবাব দিল কিশোর।

'ডাক দেব নাকি?'

'কি জন্যে?'

'কার জন্যে এত মাংস কিনছেন জিজ্ঞেস করতাম।'

'জন্তু-জানোয়ারের অভাব আছে নাকি তাঁর চিড়িয়াখানায়। ঠিক আছে, করতে চাইলে করো।'

বেরিংটন পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জানালা দিয়ে মুখ বের করে ডাক দিল মুসা, 'কেমন আছেন, মিস্টার বেরিংটন!'

ফিরে তাকালেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলেন। 'আরে, তোমরা!' মাংস কেন কিনেছেন, জিজ্ঞেস করতে হলো না। নিজে থেকেই বললেন, 'আমার একটা বাঘিনীর জন্মদিন আজ। ভাবলাম, রাতে একটা পার্টি দিলে মন্দ হয় না। গরুর গোশত কিনলাম। এখন বাকি মোমবাতি আর পার্টি হ্যাট কেনা।' হাহ্ হাহ্ করে প্রাণখোলা হাসি হাসলেন তিনি। 'পরে দেখা হবে,' বলে কাছেই পার্ক করে রাখা গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

'কিছু কিছু মানুষের জন্যে দুনিয়ার তাবৎ খুশি ঢেলে দিয়েছে যেন আল্লাহ্,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুসা বলল। 'বনের বাঘ, তারও আবার জন্মদিনের উৎসব। লোকটা পাগল!'

'হুঁ।'

'আমাদের দাওয়াত করলেও কিন্তু পারতেন।'

হাসল কিশোর, 'কেন, বাঘের সঙ্গে বসে গরুর মাংস খাওয়ার সখ হয়েছে নাকি?'

'না, দ্বীপটা দেখতাম। শোনার পর থেকেই দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'রবিনেরও একই ইচ্ছে। কিন্তু যাঁর জায়গা তিনি না বললে যাই কি করে!'

গাড়ির ট্রাংকে বাক্স দুটো তুললেন বেরিংটন। তিন গোয়েন্দার দিকে হাত নাড়লেন। তারপর গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

বসে রইল দুই গোয়েন্দা, ওয়ালথ্রপদের অপেক্ষায়।

ছয়টা বাজার কয়েক মিনিট আগে রক মিউজিক কানে এল কিশোরের। গাড়িতে বাজছে। ফিরে তাকাতে দেখল খানিক দূরে থেমেছে জরাজীর্ণ সবুজ শেভ্রলেটা। ভলিয়ুম বাড়িয়ে দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে ওয়ালথ্রপরা। ও দুটোও আরেক ধরনের পাগল, মনে হলো কিশোরের।

ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল নিক। গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে হ্যাংওয়েতে ঢুকল। নেমে তার পিছু নেবে কিনা ভাবছে কিশোর, এই সময় রায়নাও নামল। ধীরে সুস্থে হেঁটে চলে গেল বাড়িটার পাশ দিয়ে পেছন দিকে।

'কোথায় গেল?' রায়না অদৃশ্য হয়ে যেতেই বলে উঠল মুসা। 'শিওর, কোন মতলব আছে ওদের।'

'আমারও তাই ধারণা,' কিশোর বলল। 'এক কাজ করো, আমি গাড়িতে বসে সদর দরজার দিকে চোখ রাখছি, নিক বেরোয় কিনা দেখব। তুমি গিয়ে দেখো রায়না কি করে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নেমে গেল মুসা। দ্রুত এগোল বাড়িটার দিকে।

কয়েক মিনিট কেটে গেল। অস্বস্তি বোধ করছে কিশোর। মুসা ফিরছে না শেষ পর্যন্ত আর বসে থাকতে পারল না। সে-ও নেমে এগিয়ে চলল বাড়ির পাশ

দিয়ে। বাতাসে মাংস আর রক্তের তীব্র গন্ধ। আবর্জনা ফেলার বড় বড় কয়েকটা ট্র্যাশ বিন দেখতে পেল। মুসা বা আর কাউকে চোখে পড়ল না।

সাবধানে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল সে। প্রায় পৌঁছে গেছে বাড়িটার পেছন দিকে। এখনও কারও দেখা নেই। কি হলো মুসার? থামল না সে। এগিয়েই চলল। অন্য পাশে গিয়ে দেখার ইচ্ছে।

'কিশোর!' আচমকা বাতাস চিরে দিল যেন মুসার কণ্ঠ। 'কোথায় তুমি?'

চমকে গেল কিশোর। ডাকটা এসেছে বাড়ির সামনের দিক থেকে। ঘুরে দৌড় দিল। দেখল, রায়না ওদের গাড়ির দিকে দৌড়াচ্ছে, মুসা ছুটছে তার পিছু পিছু।

দরজা খুলে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে ড্রাইভিং সীটে পড়ল রায়না। ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। তীব্র গতিতে গাড়ি ঘোরানোর সময় আর্তনাদ করে উঠল টায়ার।

'জলদি এসো!' প্রবল বেগে হাত নেড়ে কিশোরকে ডাকতে লাগল মুসা। 'আমাকে দেখেই দৌড় মারল। নিশ্চয় কোন অঘটন ঘটানোর তালে আছে। ধরতে হবে ওকে।'

কিশোর তার পাশে উঠে দরজা লাগানোর আগেই স্টার্ট দিয়ে ফেলল মুসা।

দ্রুত ছুটছে রায়না। দুই গোয়েন্দাকে খসানোর চেষ্টা করছে। পথের শেষ মাথায় আরেকটা বাঁক। তীব্র গতিতে সেটা ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড পর একই গতিতে মুসাও বেরিয়ে এল। কয়েক ব্লক দূরে আবার বাঁক নিতে দেখা গেল শেভ্রলেটাকে। ঢুকল গিয়ে একটা গলিতে।

কোন দিকে না তাকিয়ে মুসাও গাড়ি ঢুকিয়ে দিল গলির মধ্যে। সরু রাস্তা। দুই ধারে ইঁটের বাড়ি। সবগুলো বাড়িরই পেছন দিক এটা।

'ওই যে, থেমে গেছে!'

কয়েক গজ দূরে থেমে গেল সবুজ গাড়িটা।

'থেমেছে কি আর সাধে,' কিশোর বলল, 'বেরোনোর পথ নেই। দেখছ না ডেড এনড–গলির মুখ বন্ধ। দিলাম ফাঁদে ফেলে।'

'তাই মনে হচ্ছে, না?' চাবুকের মত শপাং করে উঠল তীক্ষ্ণ কণ্ঠ।

ঝটকা দিয়ে ফিরে তাকাল দুই গোয়েন্দা। পেছনের সীটে উঠে বসেছে নিক ওয়ালথ্রপ। মেঝেতে পড়ে ছিল এতক্ষণ। সামনের দিকে ঝুঁকে এল সে। ঝাঁকি লেগে নেচে উঠল তার ঘোড়ার-লেজ চুল।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটা ছুরির ফলা চেপে বসল কিশোরের গলায়।

পনেরো

ইস্পাতের শীতল স্পর্শ। না দেখেও বুঝতে পারছে কিশোর, হান্টিং নাইফ। অসম্ভব ধারাল।

'নড়বে না!' ছুরির ফলাটার মতই শীতল নিকের কণ্ঠ। 'জবাই হয়ে যাবে তাহলে।'

ফিরে তাকাল মুসা। চিন্তা করল, ছুরিটা কেড়ে নেয়া যায় কিনা। ইঞ্চি ইঞ্চি করে হাতটা এগিয়ে নিয়ে চলল সেদিকে।

আচমকা একটা দড়ির ফাঁস নেমে এল তার গলায়। হ্যাঁচকা টানে পেছনে চলে গেল মাথাটা।

'কাজেই বুঝতেই পারছ,' দড়িটা টানটান করে ধরে রেখে, মুসার দিকের জানালার কাছে ঝুঁকে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল রায়না, 'উল্টোপাল্টা কিছু করতে যাওয়ার ফলাফল সুখের হবে না।'

'আমি আবার কি করতে গেলাম?' না বোঝার ভান করল মুসা, দুর্বল কণ্ঠস্বর।

ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে কিশোরের মগজে। বুঝে গেছে, ওয়ালগ্রপরা ফাঁদ পেতেছিল ওদের জন্যে। আর তাতে বোকার মত ধরা দিয়েছে ওরা। শহরের নির্জনতম এলাকায় তারচেয়েও নির্জন একটা গলিতে এনে ঢোকানো হয়েছে ওদের। কেউ দেখতে পাবে না। কেউ সাহায্যের হাত বাড়াতে আসবে না।

'কি চান আপনারা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'তথ্য,' জবাব দিল নিক। 'তোমাদের এই অপারেশনের নেতা কে?'

'কিসের অপারেশন?' অবাক হলো কিশোর।

'অপারেশন অ্যালিগেটর–নামটা অবশ্য আমরা দিয়েছি, আমি আর রায়না। অনেক কিছু জেনে গেছি আমরা। জেনেছি, ফ্লোরিডা থেকে অ্যালিগেটরের চামড়া জাহাজে করে এখানে ডিলারের কাছে আসে। সেই ডিলার সেগুলো ফ্রান্সে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। তৈরি করা হয় দামী দামী বেল্ট, ওয়ালেট, পার্স।'

নিক থামতেই রায়না বলে উঠল, 'ফ্রান্সের একজন সোর্স আমাদের জানিয়েছে, ওখানে চামড়া যায় রকি বীচ এলাকা থেকে। জাহাজে করে কবে কবে পাঠানো হয়েছে, তার কিছু তারিখও আমাদের জানিয়েছে সেই সোর্স। তদন্ত করে আমরা বের করেছি, চামড়াগুলো পাঠানো হয়েছিল প্যাসিফিক এক্সপোর্টারের মাধ্যমে।'

রায়না থামতে আবার নিক শুরু করল, 'হ্যাংওয়েয়ের গরুর মাংস ভরা বাক্সে করে সেগুলো পাঠানো হয়। ওদের কাছ থেকে গরুর মাংস কেনো তোমরা, মাংসটা বের করে ফেলে দিয়ে সেই এয়ারটাইট বাক্সে ভরো অ্যালিগেটরের চামড়া। প্যাসিফিক এক্সপোর্টার মনে করে গরুর মাংস পাঠাচ্ছ তোমরা, আসলে যে কি পাঠানো হচ্ছে সেটা তো কল্পনাও করতে পারে না।'

রায়না বলল, 'প্যাসিফিক এক্সপোর্টারে খোঁজ নিয়েছি আমরা। ওরা জানিয়েছে কাল তোমরা আরও বাক্স পাঠানোর ব্যবস্থা করেছ। তখন খোঁজ নিলাম হ্যাংওয়েতে। কিছু তারিখ দেখতে পেলাম, যে তারিখগুলোতে একটা বিশেষ কোম্পানি প্রতিবারে প্রচুর মাংস কিনেছে ওদের কাছ থেকে। আজ বিকেল ছয়টায় এক পার্টিকে মাংসের বড় একটা অর্ডার সাপ্লাই দেয়ার কথা হ্যাংওয়েয়ের। এখন বুঝতে পারছি, তোমরাই সেই পার্টি।'

'তোমাদের পেছনে লেগেছি আমরা, এটা তোমরা আঁচ করে ফেলেছিলে,' কিশোরের গলায় ছুরির চাপ বাড়াল নিক। 'সেজন্যেই আমাদের অফিসে গিয়েছিলে খোঁজ নেয়ার জন্যে। তাই না?'

'না, পুরোপুরি ভুল করছেন আপনারা,' ঢোক গিলতে গিয়ে থেমে গেল

কিশোর। নাড়াচাড়ায় গলার চামড়া কেটে যাওয়ার ভয়ে।

'দেখো, তোমরা ছেলেমানুষ,' কণ্ঠস্বর নরম করল নিক। 'আমরা জানি, দলের বড় ধরনের কিছু নও তোমরা, বস্ তো নওই। হয়তো হেরোইনের টাকা জোগাড়ের জন্যে, কিংবা শয়তান আঙ্কেলের খপ্পরে পড়ে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছ। বসের নামটা বলে দাও, তোমাদের ছেড়ে দেব।'

'বড়ই দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে,' জবাবটা দিল মুসা, 'অ্যালিগেটরের চামড়া সাপ্লাই দেয়, এমন কাউকে চিনি না আমরা। কখনও দেখা হয়নি। হলে আপনাদের আগে আমরাই ওর ঘাড়টা মটকাতাম।'

'হাসি-মস্করার সময় নেই!' আহত চিতার মত ফুঁসে উঠল রায়না। 'জলদি বলো!' মুসার গলার দাঁড়তে টান পড়ল।

কিশোর বলল, 'আপনারা তো আপনাদের কথা বললেন, এবার আমাদের কথা শুনুন। বলার তো অন্তত সুযোগ দেবেন...'

'বলো,' নিক বলল।

গত কয়েক দিনের কথা খুলে বলল কিশোর। মাঝে মাঝে তাকে কথা ধরিয়ে দিল মুসা। ওরা জানাল, কিভাবে এ.আর.এফদের অফিসে গোপনে ঢুকেছে, ওয়ালথ্রপদের অনুসরণ করে ফারের কোট রাখার গুদামে গিয়েছে, ফোন ট্যাপ করেছে। ওরা যে সখের গোয়েন্দা, সে-কথাও জানাল। বলল, বিশ্বাস না করলে থানায় খোঁজ নিতে।

'কি সর্বনাশ!' স্বামীর দিকে তাকাল রায়না। 'এ কাদের পেছনে লাগলাম আমরা? ভুল টার্গেট!'

'সাড়ে ছ'টা!' ঘড়ি দেখে বলল নিক। 'হ্যাংওয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। আসল লোকগুলোকে আর ধরা হলো না আজ!'

ফোঁস ফোঁস করে হতাশার নিঃশ্বাস ফেলল স্বামী-স্ত্রী দুজনেই।

'আমার কিছু কথা আছে,' কিশোর বলল।

'কি কথা?' জানতে চাইল নিক।

'আগে ছুরি আর দড়ি সরান।'

সরিয়ে নেয়া হলো।

'গাড়িতে দম আটকে আসছে,' কিশোর বলল। 'বাইরে নামা যাক। খোলা বাতাসে মগজ কাজ করবে ভাল।'

বদ্ধ গলিতে, গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল কিশোর ও মুসা। ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে দুই ওয়ালথ্রপ। বিকেল বেলা আবহাওয়া দিনের চেয়ে ঠাণ্ডা এখন, তাও ভীষণ গরম।

'মনে হচ্ছে,' হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে বলল কিশোর, 'একই ব্যক্তিকে খুঁজছি আমরা সবাই।'

'মানে?' ভুরু নাচাল রায়না।

'এ অঞ্চলে যদি কোন চামড়া চোরাচালানি থেকে থাকে,' কিশোর বলল, 'শুধু কুমির নয়, তুষার চিতার চামড়ার ব্যাপারেও আগ্রহী হবে সে। ঠিক? কারণ তুষার চিতার চামড়ার অস্বাভাবিক দাম।'

'হওয়াটাই স্বাভাবিক,' চোয়াল ডলল নিক। 'তাতে কি?'

গাড়িতে রাখা সেলুলার ফোন বেজে উঠল। তুলে নিল মুসা।

'রবিন করেছে,' কানে লাগিয়ে বলল সে। মন দিয়ে শুনল ওপাশের কথা। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চন্দ্রাবতীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। ওরা জানিয়েছে, ভানুস্বামী কিছুটা অস্থির প্রকৃতির; তবে ছেলে খারাপ নয়। ওরা কোনমতেই বিশ্বাস করতে চাইছে না সে রাজকুমারীকে কিডন্যাপ করেছে। থানায় অফিসার মরিস ডুবয়ের সঙ্গেও কথা বলেছে রবিন। পুলিশ এখনও কোন হদিস করতে পারেনি রাজকুমারীর। আমাদের মতই বোকা বনে রয়েছে।'

'হুঁ!' ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে লাগল কিশোর।

'কি হলো, কি ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'এইমাত্র মনে পড়ল, আরও একজনকে দেখেছি আমরা।'

'আশ্চর্য! কাকে আবার দেখে ফেললে? শোনালাম তো রবিনের ফোনের কথা...'

'হ্যাঁ, রবিন কোন নতুন তথ্য জানাতে পারেনি।...শোনো, হ্যাংওয়েতে আজ ছ'টার সময় আরও একজনকে দেখেছি আমরা।'

'সন্দেহজনক কেউ?' জিজ্ঞেস করল রায়না।

'ছ'টা বাজার সামান্য আগে।' তার দিকে তাকাল কিশোর, 'ওই লোকই আপনাদের চামড়া ব্যবসায়ী কিনা কে জানে।'

মাংসের বাক্স হাতে বেরিংটনকে হ্যাংওয়ে থেকে বেরোতে দেখেছে, জানাল কিশোর।

'কি বলছ তুমি!' চমকে গেল মুসা। 'মাথাটাথা ঠিক আছে তো? তিনি একজন কোটিপতি। চামড়ার অবৈধ ব্যবসা করার কোন কারণ নেই। নিজের পোষা বাঘের জন্যে মাংস কিনে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে আমি তো সন্দেহের কিছু দেখি না।'

'আমিও না,' রায়না বলল। 'তাঁর মত একজন মানুষ এ রকম কাজ করতেই পারেন না। জন্তু-জানোয়ারকে ভালবাসেন তিনি...'

'ওটা লোক দেখানো,' কিশোর বলল। 'নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখার জন্যে চালাকি।'

'দেখো, বেরিংটনের বিরুদ্ধে খারাপ কিছু বলার আগে দশবার চিন্তা করা উচিত আমাদের,' সাবধান করল মুসা।

'করেছি,' মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'জু আইল্যান্ডে গিয়ে দেখলেই আমার কথার সত্য-মিথ্যা যাচাই হয়ে যাবে। আজ রাতেই যেতে পারি আমরা। দেখে ফেললে, কেন গিয়েছি, একটা গল্প বানিয়ে বলে দেব। সন্দেহজনক কিছু দেখলে, পুলিশকে জানাব। কিছু না দেখলে, বেরিংটনকে যে সন্দেহ করেছি, এ কথাটাও বুঝতে দেব না। অনুমতি না নিয়ে গিয়েছি বলে মাপটাপ চেয়ে নেব। ঝামেলা হবে না আর।' ভুরু নাচাল মুসার দিকে তাকিয়ে, 'কি বলো?'

'ঠিক আছে,' ঠিক মেনে নিতে পারছে না মুসা, 'তুমি যা ভাল বোঝো।'

ওয়ালগ্রপদের দিকে তাকাল কিশোর, 'দেখুন, যদি কিছু মনে না করেন, আপনাদের কয়েকটা পরামর্শ দিতে চাই।'

চোখ সরু করে কিশোরের দিকে তাকাল নিক, 'কি পরামর্শ?'

'জন্তু-জানোয়ারের নাগরিক অধিকার নিয়ে আন্দোলন করছেন, ভাল কথা। চাইলে আমাদেরও দলে টেনে নিতে পারেন। কিন্তু বোমাবাজি, বিষাক্ত সাপ আর ছুরি দিয়ে ভয় দেখানো, এগুলো সন্ত্রাসীদের কাজ। পুলিশ জানতে পারলে সোজা ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরে দেবে। ল্যাবরেটরি থেকে জানোয়ার চুরি করাও কোন ভাল কথা নয়, সেটা যে কোন উদ্দেশ্যেই হোক না কেন,' বলে আড়চোখে স্বামী-স্ত্রীর দিকে তাকাল কিশোর। ওদের চেহারার পরিবর্তন দেখেই বুঝে ফেলল ঠিক জায়গাতেই ঢিল ছুঁড়েছে। 'আর, আরেকটা কথা, গোয়েন্দাগিরি আপনাদের কাজ নয়; কাজেই এ থেকে সরে থাকারও অনুরোধ জানাচ্ছি।'

'তোমাদের কথা কেন শুনব আমরা?' রেগে উঠল নিক।

'শোনা না শোনা আপনাদের ইচ্ছে,' নিরাসক্ত ভঙ্গিতে হাত ওল্টাল কিশোর। 'তবে আপনাদের কিছু কিছু অপকর্ম আমরা দেখে ফেলেছি, এই যেমন গুদামের দরজায় বোমা মারা···এই একটা খবর পুলিশের কানে দিলেই···' কথাটা শেষ করল না সে।

স্তব্ধ হয়ে থাকা দুই ওয়ালগ্রুপের দিকে আর একটিবারের জন্যেও না তাকিয়ে গাড়িতে চড়ল কিশোর। মুসাকে উঠতে বলল।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়ি পিছাতে শুরু করল মুসা। হেসে বলল, 'নিয়েছ এক হাত। মুখের অবস্থা দেখেছ? বেচারাদের জন্যে মায়াই লাগছে আমার।'

'এটা ওদের প্রাপ্য ছিল। ভাগ্যিস তখন ওদের রেখে যাওয়া সাপটা রবিনের হাত কামড়ে দেয়নি।' গলি থেকে বেরিয়ে এলে কিশোর বলল, 'হুমকি তো দিয়ে এলাম। এতেও যদি কাজ না হয়, বাড়াবাড়ি করে, দেব ডুবয়কে সব কথা জানিয়ে। ওদের কথা থাক এখন,' ফোনটা তুলে নিল সে। 'রবিনকে ফোন করা দরকার। মেরিনায় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে বলি।'

'যাব কি করে দ্বীপে?' সামনের দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'বোট ভাড়া করব।'

ষোলো

দুই ঘণ্টা পর একটা পাওয়ার বোট এগিয়ে চলল প্রশান্ত মহাসাগরের জল কেটে। মুসা ধরেছে হুইল, একটা হাত স্টিয়ারিংয়ে রাখা, আরেক হাতে পীনাট বাটার আর জেলির পুর দেয়া আধখাওয়া স্যান্ডউইচ। ধীরে ধীরে চিবুচ্ছে। চোখ সামনে সাগরের দিকে। পাশে বসা কিশোর। কোলের ওপর একটা ম্যাপ বিছানো। পেছন থেকে তার কাঁধের ওপর দিয়ে টর্চ ধরে রেখেছে রবিন।

'দশ ডিগ্রি ডানে কাটো,' মুসাকে বলল কিশোর। 'আমার হিসেব ঠিক হলে আর বিশ মিনিটের মধ্যে দ্বীপে পৌঁছে যাব আমরা।'

দুই কামড়ে বাকি স্যান্ডউইচটুকু মুখে পুরে দুহাতে স্টিয়ারিং ধরল মুসা। ডানে

ঘোরাল। বোটের ছাত থেকে জোরাল একটা আলো গিয়ে পড়েছে পানিতে। বাকি সমুদ্র অন্ধকার। চাঁদ নেই, তারার আলোও নেই। ম্যাপ আর যন্ত্রপাতির ওপর নির্ভর করে বোট চালাতে হচ্ছে। হিসেবে ভুল হলে দ্বীপটা খুঁজে পাবে না।

চোখে দূরবীন ঠেকিয়ে দেখতে লাগল। সামনে কালোমত কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। আরও এগোনোর পর বোঝা গেল, হিসেব ভুল হয়নি, দ্বীপটাই।

নিঃসঙ্গ একটা দ্বীপ মাথা তুলে রেখেছে সাগরের পানি থেকে। আরও কাছে গেলে দেখা গেল দ্বীপ ঘিরে রাখা বালির সৈকত, মাঝে মাঝে পাথর। এত বেশি গাছপালা, জঙ্গলের মত লাগছে।

দ্বীপের চারপাশে একবার চক্কর দিয়ে এল মুসা। ডক দেখতে পেল না। ভেড়াবে কোথায়? শেষে ছোট একটা পাথুরে খাঁড়িতে বোট ঢুকিয়ে দিল।

'আলো বা বাড়িঘর তো চোখে পড়ছে না,' ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে বলল সে। 'যাব কোনদিকে?'

'দ্বীপটা তেমন বড় নয়,' বোট থেকে লাফ দিয়ে একটা পাথরের ওপর নামল কিশোর। 'বেরিংটন থেকে থাকলে তাঁকে খুঁজে বের করা কঠিন হবে না।'

সৈকত ধরে এগোল তিনজনে। ঢুকল অন্ধকার জঙ্গলে। ঘন গাছপালা, ঝোপঝাড় যেন দুর্গ সৃষ্টি করে রেখেছে। হাঁটা মুশকিল। আগে আগে টর্চ হাতে এগোল রবিন। পেছনে কিশোর আর মুসা। মাঝে মাঝেই হোঁচট খাচ্ছে শিকড়ে, লতায় জড়িয়ে যাচ্ছে শরীর, বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ঝোপের ডাল। জন্তু বা মানুষ কিছুই চোখে পড়ল না। জীবন্ত প্রাণী বলতে একমাত্র মশার ঝাঁক, গুঞ্জন তুলছে আর্দ্রতায় ভরা বাতাসে।

'খাইছে! কি মশার মশারে!' ক্রমাগত হাত চালাচ্ছে মুসা। চটাস চটাস চাটি মারছে।

'গরমও বটে,' কপালের ঘাম মুছল রবিন। 'বাতাস বলতে নেই।'

কাছেই কোনখান থেকে শোনা গেল নেকড়ের ডাক।

'বেরিংটনের চিড়িয়াখানার কাছে পৌঁছে গেছি মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল।

'আটকে রেখেছে ওটাকে, না ছাড়া?' মুসার প্রশ্ন। 'অনেকে তো আবার বুনো জানোয়ার দিয়ে পাহারা দেয়ায়।'

'ভাল কথা মনে করেছ,' চতুর্দিকে দ্রুত একবার টর্চের আলো ঘুরিয়ে আনল রবিন। গাছের মাঝের অন্ধকার ফাঁক-ফোকরগুলো দেখে নিল। নেকড়ে জাতীয় কোন প্রাণীকে চোখে পড়ল না।

কয়েক মিনিট পর বেরিংটনের ব্যক্তিগত অসাধারণ চিড়িয়াখানাটা দেখা গেল। এক জায়গায় গাছপালা কেটে সাফ করে ফেলা হয়েছে। তার মাঝে তিরিশটা বড় বড় খাঁচা। প্রতিটিতে কোন না কোন জানোয়ার রয়েছে। বেশির ভাগই ঘুমন্ত। ছেলেদের সাড়া পেয়ে নড়েচড়ে উঠল কোন কোনটা।

'সংগ্রহ বটে!' বিস্ময় চাপা দিতে পারল না রবিন।

লোহার শিকের ওপাশে রয়েছে সাংঘাতিক সব জানোয়ার: লাল নেকড়ে, চিতাবাঘ, জাগুয়ার, চিতা, ওশেলট, জেব্রা, অরিক্স, কেপ বাফেলো, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের একটা পুরো পরিবার—ছানাগুলো গুটিসুটি হয়ে শুয়ে আছে মায়ের কোলের

কাছে।

দুটো চিতাকে লম্বা হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল মাটিতে।

'পৃথিবীর দ্রুততম প্রাণী,' ফিসফিস করে বলল মুসা।

একটা খাঁচায় প্রায় সাদা রঙের একটা বাঘ দেখে রবিন বলল, 'এ রকম বাঘ জীবনে দেখিনি।'

'আর আমি দেখিনি এই প্রাণী,' সাদা একটা গণ্ডার দেখিয়ে বলল কিশোর। ঘুমন্ত গণ্ডারটা হাতির বাচ্চার সমান।

পরিচিত, তীক্ষ্ণ একটা ডাক চিরে দিল যেন রাতের বাতাস।

'কি ওটা?' বিড়বিড় করল কিশোর।

'মনে তো হচ্ছে তুষার চিতা,' রবিন বলল। 'কি ভাবে ডাকে ওরা, চন্দ্রাবতী কি বলেছিল, মনে আছে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। পা টিপে টিপে সেদিকে এগোল ওরা। চিড়িয়াখানার অন্য প্রান্ত থেকে শোনা গেছে ডাকটা।

একটা খাঁচার ওপর রবিনের টর্চের আলো পড়তেই বলে উঠল মুসা, 'রাখো, রাখো; ধরো দেখি আলোটা!'

ধোঁয়াটে চামড়ার ওপর কালো ফুটকি। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল জানোয়ার দুটোকে কিশোর। অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

একটা জানোয়ার শান্ত ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। আরেকটা দাঁড়ানো। সবুজ চোখ মেলে দেখছে। কয়েক মুহূর্ত একভাবে চেয়ে থেকে বসে পড়ল ওটা। মাটিতে পড়ে থাকা কিসে যেন নাক ঘষতে লাগল। ভালমত না দেখেও বলে দিতে পারল কিশোর, কিসে ঘষছে। চন্দ্রাবতীর লাল শাড়ির টুকরো।

'কান্তা!' মুসাও চিনে ফেলেছে।

'তাহলে তোমার কথাই ঠিক, কিশোর; বেরিংটনই সব কিছুর মূলে,' টর্চটা নিভিয়ে দিল রবিন। 'কেউ দেখে ফেললে বিপদে পড়ব।'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'চলো, বোটে ফিরে গিয়ে রেডিওতে কোস্ট গার্ডকে খবর দিই।'

'কিন্তু রাজকুমারী...' বলতে গিয়ে থেমে গেল মুসা। 'ওটা কি...'

এবারও কথা শেষ হলো না তার। আলো এসে পড়ল মুখে।

এক এক করে আলোটা ঘুরে গেল মুসা, কিশোর, রবিনের মুখে। পাথরের মত স্থির হয়ে গেছে তিনজনেই।

'নড়বে না!' আদেশ দিল খসখসে একটা কণ্ঠ। 'বন্দুক আছে আমাদের হাতে।'

ধীরে ধীরে আলো সয়ে এল চোখে। তিনটে আবছা ছায়ামূর্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। মিথ্যে বলেনি ওরা, প্রত্যেকের হাতেই একটা করে হান্টিং রাইফেল। তাক করে রেখেছে তিন গোয়েন্দার দিকে।

'তাই তো বলি,' একটা রাইফেলের ব্যারেলের ওপর দিয়ে সামনে ঠেলে এল বেরিংটনের মুখ, 'রাত দুপুরে বোট নিয়ে আমার দ্বীপে নামার সাহস হয় কার! আরেকটু সাবধান হলে পারতে। পাহারা থাকতে পারে, ভাবা উচিত ছিল।'

'আ-আ-আমরা...' তোতলাতে শুরু করল মুসা, 'আমরা চলেই যাচ্ছিলাম...'

'এত তাড়া কিসের,' শব্দ করে হাসলেন বেরিংটন। 'এসেছ যখন, ঘরে এসো, বসো, চা খাও, তারপর ভেবে দেখা যাবে কি করা যায়।'

সতেরো

'মিস্টার বেরিংটন, রাইফেল তাক করে রেখেছেন কেন আমাদের দিকে?' মুসা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার পার্টি শুরু হচ্ছে কখন?'

'বাঘের জন্মদিন,' কিশোর বলল, 'কি করে কেক কাটে, মজা দেখার লোভটা সামলাতে পারলাম না। তাই চলে এসেছি। আপনার ফোন নম্বর নেই আমাদের কাছে, তাহলে ফোন করেই আসতাম। আশা করি কিছু মনে করেননি।'

এগিয়ে গিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিল সে।

'সরি,' হাতটা ধরলেন না বেরিংটন, 'আমার মত বুড়ো শকুনকে বোকা বানাতে পারবে না। আমি জানি, তুষার চিতাটাকে তোমরা দেখে ফেলেছ। লাল শাড়ির টুকরোটাও দেখেছ। তোমাদের বোকা ভাবার কোন কারণ নেই।'

চালাকির মধ্যে গেল না আর কিশোর। 'আসলে আমরা বোকাই। আপনার কথা বিশ্বাস করেছিলাম। ভাল মানুষ ভেবেছিলাম আপনাকে...'

চাপা গর্জন শুনে ফিরে তাকিয়ে কিশোর দেখল, বাদামী রঙের একটা ওশেলট জ্বলন্ত চোখে বেরিংটনের দিকে তাকিয়ে আছে। কথাবার্তার শব্দে বেশির ভাগ জানোয়ার জেগে গেছে। অস্বস্তিভরে তাকিয়ে আছে মানুষগুলোর দিকে।

'রাজকুমারী কোথায়?' জানতে চাইল কিশোর।

'আছে, কাছাকাছিই,' জবাব দিলেন বেরিংটন।

'কাছাকাছি কোনখানে?' এক পা এগিয়ে গেল মুসা।

মুহূর্তে রাইফেল কক করে ফেলল বেরিংটনের দুই সহকারী।

'বোকামি কোরো না, মুসা!' সাবধান করে দিল কিশোর।

বেরিংটনের মত তাঁর সঙ্গীরাও খাকি প্যান্ট আর সাফারি শার্ট পরেছে। বয়েস চল্লিশের কোঠায়। একজন শ্বেতাঙ্গ, অন্যজনের রঙ কালো। আফ্রিকান হবে।

'বুদ্ধিমান ছেলে,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন বেরিংটন। 'ফাঁকা বুলি যে ঝাড়ছি না আমরা, বুঝতে পেরেছ। এসো আমার সঙ্গে।'

রাইফেল কাঁধে ফেলে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। হাঁটতে শুরু করলেন। অনুসরণ করল তিন গোয়েন্দা। পেছন থেকে তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল দুই প্রহরী। পেছনে ডেকে উঠল কোন একটা জানোয়ার। টানা, লম্বিত কান্নার মত স্বর। নেকড়েই হবে।

'আপনি অ্যালিগেটরের চামড়ার অবৈধ ব্যবসা করেন, তাই না?' হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'আজ বিকেলে যে মাংস কিনে এনেছেন, সেটা বাঘের জন্মদিনে পার্টি দিতে নয়। বাক্সগুলো প্রয়োজন ছিল আপনার। কুমিরের চামড়া ভরে ফ্রান্সে পাঠানোর জন্যে।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করলেন বেরিংটন। বিস্ময় চাপা দিতে পারলেন না। 'বহু বছর ধরেই এ ব্যবসা করছি। তুমি জানলে কি করে?'

'জেনেছি। জানোয়ারগুলোকে খাঁচায় আটকে রেখেছেন কেন? চামড়ার জন্যে? সময় হলে মেরে চামড়াগুলো জায়গামত পাঠিয়ে দেবেন?'

'না। একটা হান্টিং ক্লাব চালাই আমি। খাঁচায় ভরা জানোয়ারগুলোকে দেখলে তো, সব বিপন্ন প্রজাতির তালিকায় পড়ে। আমার দ্বীপে আসে শিকারীরা। টাকা দেয়। পছন্দ মত জানোয়ার শিকার করে। মাথাটা ট্রফি হিসেবে দিয়ে দেয়া হয় তাকে।'

'জানোয়ার আনেন কোত্থেকে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'প্রচুর যোগাযোগ আছে আমার। আইনের লোকদের ঘুষ দিয়ে নরম করে রাখি। নানা দেশ থেকে দুর্লভ জানোয়ার নিয়ে আসি। আকাশ ছোঁয়া দাম দিয়ে কিনতে হয়। তবে আমার লস নেই। কিছু কিছু লোক আছে, দামের পরোয়া করে না, তারা চায় একটা অতি দুর্লভ প্রাণীর মাথা। এই যেমন, সাদা গণ্ডারটাকে মারার জন্যে আশি হাজার ডলার খরচ করতে হবে তোমাকে।'

'আপনাকে এখনও জেলে ঢোকানো হয়নি কেন বুঝতে পারছি না!' রাগ সামলাতে পারল না মুসা।

'উইলি, গুলি করে শেষ করে দিলেই তো ঝামেলা চুকে যায়,' শ্বেতাঙ্গ লোকটা বলে উঠল, কথায় ব্রিটিশ টান। জাতে ইংরেজ।

'না!' থাবা দিয়ে ঘাড় থেকে একটা মশা মারলেন বেরিংটন।

সামনে আবার খোলা জায়গা। গাছপালা পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। একটা সুন্দর দোতলা বাড়ি আছে ওখানে। পাথরে তৈরি। একশো বছরের কম হবে না বয়েস। সামনে একটা কাঠের ডেক। চারপাশ ঘিরে আলো জ্বলছে। উজ্জ্বল ফ্লাডলাইটের আলোয় আশপাশটা দিনের মত পরিষ্কার।

তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে 'এসো' বলে ডেকের ওপর উঠে গেলেন বেরিংটন। ওক কাঠের একটা দরজা খুলে দিলেন। ভেতরে ঢুকল সবাই। বিরাট একটা হলঘর। কাঠের প্যানেলিং করা। একধারে পাথরের মস্ত ফায়ারপ্লেস।

চতুর্দিকে, ঘরের দেয়ালে সাজানো শিকার করা জন্তু-জানোয়ারের মাথা। খাঁচায় যত রকম প্রাণী দেখে এসেছে তিন গোয়েন্দা, সব রকম আছে এখানেও; তফাৎটা হলো ওগুলো জীবন্ত, এগুলোর কেবল মাথা। এ ছাড়া বাড়তি রয়েছে একটা নর্থ আমেরিকান বাইসনের বিশাল মাথা।

রবিন জানে, চোখগুলো কাঁচের তৈরি। তবু ওগুলোর দিকে তাকিয়ে কেমন গা ছমছম করতে লাগল। তার হাঁটাচলা, কথা বলা, সব লক্ষ করছে যেন প্রাণীগুলো।

সবাইকে বসতে ইশারা করলেন বেরিংটন।

প্রায় বুড়ো একজন লোক আর একজন মহিলা ঘরে ঢুকল। নরম স্বরে অনুরোধের মত করে মহিলাকে বললেন বেরিংটন, 'ইভিলিন, আমাদের একটু চা দেবে? আইস্‌ড্‌ টী।' লোকটাকে বললেন, 'লিওনার্ড, এয়ার কন্ডিশনারটা চালু করে দাও।'

সবাই বসলে মুসা বলল, 'কান্তাকে চুরি করে এনেছেন আপনি, যাতে

মাথামোটা কোন শিকারী এসে খুন করতে পারে ওকে।'

'না, এরচেয়ে বড় কিছু আশা করছি আমি কান্তার কাছ থেকে,' একটা কফি টেবিলে দুই পা তুলে দিলেন বেরিংটন। একটা সেলুলার ফোন রাখা আছে টেবিলে। 'বোম্যান যখন আমার কাছে আমার তুষার চিতাটা ধার চাইল, মনে হলো, ওকে দিতে যাব কেন? আমিই এনে প্রজনন করাতে পারি। বাচ্চাগুলো আমার নিজের হয়ে যাবে। চারটা বাচ্চা পেলে, প্রতিটার দাম পঁচিশ হাজার করে লাখ টাকা। কম কি। অনেক শিকারী আছে বাচ্চার মাথা পেলেও লুফে নেবে।'

ঘৃণায় তেতো হয়ে গেল রবিনের মন। লোকটা মানুষ না। টাকার জন্যে পিশাচে পরিণত হয়েছে। যে সব কোটিপতি জানোয়ারগুলোকে খুন করতে আসে, ওরাও মানুষ না।

'হুঁ!' হাঁটু খামচে ধরল কিশোর। আগে বুঝতে পারেনি বলে নিজের ওপর রাগ হচ্ছে। 'এই সহজ চিন্তাটা আমার মাথায় আসেনি। কি করে আসবে? আপনাকে তো আর চোর ভাবতে পারিনি প্রথম থেকে।'

'চিড়িয়াখানা থেকে বের করলেন কি করে চিতাটাকে?' জানতে চাইল রবিন।

আফ্রিকান লোকটার দিকে তাকালেন বেরিংটন। চোখের ইশারা করে বললেন, 'বলো?'

'বেড়া কেটে ভেতরে ঢুকে প্রথমে পাখিগুলোকে ছেড়ে দিলাম,' লোকটা বলল। 'গোলমালের মধ্যে চিতাটার খাঁচার তালা খুলে ওটাকে ট্র্যাংকুইলাইজার দিয়ে ঘুম পাড়ালাম। বের করার পর আবার তালাটা লাগিয়ে দিলাম। যাতে ধাঁধায় পড়ে যায় পুলিশ।'

'তারপর, বোকা গার্ডগুলো যখন পাখি ধরায় ব্যস্ত,' শ্বেতাঙ্গ লোকটা বলল, 'বেড়ার ফোকর দিয়ে বের করে নিয়ে এলাম চিতাটাকে। অতি সহজ।'

'কিন্তু আনার পর পড়লেন ঝামেলায়,' কিশোর বলল, 'তাই না? খেতে চাইল না চিতাটা।'

'না, চাইল না,' বেরিংটন বললেন। 'পরদিন তাই আবার গেলাম চিড়িয়াখানায়। বোম্যানের কাছে জানলাম, রাজকুমারীর গন্ধ না পেলে খায় না চিতাটা। শাড়ির টুকরো ব্যবহারের কথা ভাবলাম। বোম্যানের অফিসে তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, মনে আছে? সেদিন বিকেলেই চন্দ্রাবতীর ডরমিটরির ঘরে শাড়ি চুরি করতে ঢুকলাম। রাজকুমারী যে ঢুকে পড়বে আমি থাকতে থাকতে, ভাবিনি। আমাকে দেখে ফেলল। বাধ্য হয়ে তুলে নিয়ে আসতে হলো ওকে।'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে মুসা। আহত বাঘের মত ফুঁসছে সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে বেরিংটনের ঘাড়ে।

চা নিয়ে ঘরে ঢুকল ইভিলিন। পিশাচ বেরিংটনের চা খেতে ঘৃণা হচ্ছে রবিনের, কিন্তু গলাটা শুকিয়ে এমন খসখসে হয়ে গেছে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুলে নিল একটা গ্লাস।

'আমার ট্রফিগুলো কেমন লাগছে?' গর্বিত ভঙ্গিতে দেয়ালে সাজানো মাথাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন বেরিংটন। 'পৃথিবীর সমস্ত দেশ ঘুরেছি আমি। শিকার করেছি। আফ্রিকায় সেরেঙ্গেটির বিশাল প্রান্তর থেকে শুরু করে মেরুর

বরফে ঢাকা দুর্গম পাহাড়, সবখানে গেছি। আমার এই সঙ্গী দুজনও খুব বড় শিকারী।'

বাইসনের মাথাটার দিকে নজর গেল রবিনের। কাঁচের চোখ মেলে যেন ব্যঙ্গ করছে শিকারীকে।

'আপনার মত নিষ্ঠুর লোক জীবনে দেখিনি আমি, মিস্টার বেরিংটন,' আগুনের গনগনে তাপ বেরিয়ে এল মুসার কণ্ঠ থেকে।

'হয়তো,' মুসার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন বেরিংটন।

'নিজেকে আবার নেচারালিস্ট বলেন আপনি,' লোকটার কথা সহ্য করতে পারছে না রবিন।

'খোকা, সত্যি আমি নেচারালিস্ট,' চায়ের গ্লাসে চুমুক দিলেন বেরিংটন। 'প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম-কানুনে বিশ্বাসী। প্রকৃতি যে ভাবে চালাতে চায়–সবল দুর্বলের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকবে, সেটাকেই সঠিক বলে মানি আমি। প্রকৃতি নিয়ম করে দিয়েছে হরিণ ঘাস খাবে, হরিণকে খাবে বাঘ; সেটাই হয়, হওয়া উচিত। অন্য কিছু করতে গেলেই প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হবে।'

'সেটা নাহয় মেনে নিলাম,' কিশোর বলল। 'কিন্তু অহেতুক মেরে মেরে প্রাণীকুলকে সাফ করে দিতে বলেনি প্রকৃতি। আপনি যে বিপন্ন প্রজাতি মেরে ফেলছেন, এর কি ব্যাখ্যা দেবেন?'

'প্রকৃতির নিয়মকে যদি একটা শেকল ধরা হয়,' গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন বেরিংটন, 'মানুষ রয়েছে শেকলের একেবারে মাথায়। হরিণের মাংস খেয়ে বাঘ যেমন বেঁচে থাকে, আমিও তেমনি বাঘ মেরে বেঁচে থাকার পয়সা রোজগার করি। এটা আমার প্রাকৃতিক অধিকার।'

'আমরা তো শুনেছিলাম,' রবিন বলল, 'আপনি মস্ত ধনী। জানোয়ার মেরে টাকা রোজগারের প্রয়োজন হওয়ার কথা নয়।'

'আমার দাদার বাবা, যিনি এই দ্বীপটা কিনেছিলেন, তিনি ছিলেন বড়লোক। উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক টাকা পেয়েছিলাম আমি। কিন্তু এমন জীবন বেছে নিলাম, দেখতে দেখতে সব টাকা ফতুর হয়ে গেল। শিকার ভালবাসি, তাই শেষ পর্যন্ত শিকারের ব্যবসাই বেছে নিলাম। স্বীকার করতেই হয়, অ্যালিগেটররা আমার মস্ত উপকার করেছে।'

চুমুক দিয়ে গ্লাসের চা শেষ করে ফেলল কিশোর। 'আপত্তি না থাকলে বলুন না শুনি আপনার ব্যবসার কথা।'

'ঠিক আছে, বলছি। এ ভাবে সব তোমাদের বলে দেয়াটা বোকামিই হয়ে যেত,' বেরিংটন বললেন, 'যদি ছেড়ে দিতাম। দিলে নিজের পায়ে কুড়াল মারতে হয়। কে আর চায় সেধে জেলে যেতে। তারচেয়ে তোমাদের শেষ করে দিলেই ঝামেলা চুকে যায়।'

'ভয় দেখাচ্ছেন?' ফুঁসে উঠল মুসা।

'না,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন বেরিংটন, 'না, ভয় দেখানো না, সত্যি বলছি। আমি স্পোর্টসম্যান, তাই পালানোর সুযোগ দেব তোমাদের। যারা এখানে শিকার করতে আসে, তাদের সঙ্গে একটা খেলা খেলি আমি। জানোয়ার পছন্দ করে

শিকারী, দামদর ঠিক হলে সেটাকে বের করে জঙ্গলে ছেড়ে দিই। আট ঘণ্টা সময় দেয়া হয় শিকারীকে। এই সময়ের মধ্যে যদি মারতে পারে, ভাল, নইলে বেঁচে যাবে জানোয়ারটা। আমার জিনিস আমার কাছেই থাকবে। কিন্তু পুরো টাকা শোধ করতে হবে শিকারীকে। তার জন্যে এটা জুয়া, আর জানোয়ারটার জন্যে বাঁচার সুযোগ। তোমাদেরও সে-সুযোগ দিতে চাই।'

'তারমানে জানোয়ারের মত জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আমাদের শিকার করতে যাচ্ছেন আপনি?' ভুরু কুঁচকে গেল মুসার। মনে পড়ল, ঠিক এ রকম আরেক উন্মাদের পাল্লায় পড়েছিল ওরা। একই কাজ করেছিল সেই লোকটাও। তবে সে-ও বোধহয় এত বিপজ্জনক আর নিষ্ঠুর ছিল না।

'ঠিক ধরেছ,' বেরিংটন বললেন। 'আমি যে অন্যায় করি না, তার প্রমাণ হিসেবে তোমাদের কথা দিচ্ছি, রাইফেল নেব না। তীর-ধনুক ব্যবহার করব। আর লুকানোর জন্যে আধঘণ্টা সময় দেয়া হবে তোমাদের। কেমন লাগছে?'

'আপনার যা ইচ্ছে আপনি করতে পারেন!' উঠে দাঁড়াল মুসা। রাগে জ্বলছে চোখ। 'আমার খুন করতে ইচ্ছে হলে তাই করুন। কিন্তু ভীতু শিকারের মত ছুটে বেড়িয়ে কুৎসিত মজা পেতে আপনাকে দেব না।'

'ওর কথা বাদ দিন,' শীতল কণ্ঠে বেরিংটনকে বলল কিশোর, 'আপনার চ্যালেঞ্জ আমরা গ্রহণ করলাম। কখন শুরু হবে?'

'এই তো সাহসী মানুষের মত কথা।' ঘড়ি দেখল বেরিংটন। 'এখনই তো সবচেয়ে ভাল সময়। রওনা হয়ে যাও। ঠিক বারোটার আগে তোমাদের পিছু নিচ্ছি না আমরা। আরেকটা কথা, দ্বীপ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা মনেও এনো না। তাতে অহেতুক মূল্যবান সময় নষ্ট করবে। তোমাদের বোট নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সাঁতরে পেরোনোর চেষ্টা করে লাভ নেই, সবচে' কাছের দ্বীপটা তিরিশ মাইল দক্ষিণে। যেতে পারবে না ওখানে।'

ঢোক গিলল কিশোর। মাথা ঝাঁকাল। বুঝতে পারছে, মিথ্যে বলছেন না বেরিংটন।

সামনের দরজার কাছে ছেলেদের এগিয়ে দিলেন বেরিংটন। দরজা খুলে দিলেন। ওরা বাইরে বেরোতে বললেন, 'তোমাদের সৌভাগ্য কামনা করছি। চমৎকার একটা অভিজ্ঞতার সুযোগ দিলে আমাকে। মানুষ প্রজাতিকে কখনও শিকার করিনি।' দরজাটা লাগিয়ে দিলেন তিনি।

ছুটে ডেক থেকে নেমে সামনের গাছপালার দিকে এগিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

ঘুরে দাঁড়াল মুসা। 'কাজটা ঠিক করলে না, কিশোর। কেন মজা পেতে দিলে শয়তানটাকে? তোমার ইচ্ছেটা কি?'

'বাঁচার সুযোগ করে নেয়া। তুমি যে ভাবে রাগ দেখাচ্ছিলে, তাতে লাভ হত না; মেরে আমাদের ফেলতই।'

'এখনও মরব। আমাদের ঠিকই ধরে ফেলবে,' থাবা দিয়ে মশার ঝাঁক তাড়ানোর চেষ্টা করল রবিন। 'দুর্ধর্ষ শিকারী ওরা। আর এ ধরনের শিকারীরা যা হয়, দুর্দান্ত ট্র্যাকার। সহজেই খুঁজে বের করে ফেলবে। আমাদের কাছে কোন অস্ত্রও

নেই যে বাধা দেব।'

'কে বলল নেই?' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটাই আছে, মগজ। এটা দিয়েই ওদের হারিয়ে দে। কথা বলে সময় নষ্ট হচ্ছে। বাড়ি থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যাওয়া দরকার।'

ফ্লাডলাইটের উজ্জ্বলতা থেকে দ্রুত সরে গেল ওরা। ঢুকে পড়ল অন্ধকার গাছের জঙ্গলের গোলক-ধাঁধায়। এই গাছপালা আর ঝোপ কতখানি আড়াল দিতে পারবে. ভাবছে কিশোর।

কিশোরের কথা সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে রবিন আর মুসার। ওর মগজের ক্ষমতার ওপর অগাধ বিশ্বাস ওদের। মনে হচ্ছে, শিকারীদের ফাঁকি দিতে পারবে ওরা।

'প্ল্যান করে এগোনো উচিত আমাদের,' রবিন বলল।

'হ্যাঁ,' একমত হলো কিশোর, 'ভাল একটা প্ল্যান।'

'সেই প্ল্যানটা কি?' জানতে চাইল মুসা।

'ভাবো, ভাবতে থাকো,' কিশোর বলল। 'যার যা মাথায় আসে, বলব। তারপর সব মিলিয়ে একটা বুদ্ধি ঠিক করে নেব। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই। হাঁটতে হাঁটতে বলো।'

স্যাঁতসেঁতে, ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রচণ্ড গরম। ঘাড়ের কাছ থেকে সড়সড় করে ঘামের ফোঁটা নেমে গেল কিশোরের মেরুদণ্ড বেয়ে।

'এখন থেকে পঁচিশ মিনিট পর,' রবিন বলল, 'রওনা হবে ওরা। ঘুরে তখন বাড়িটায় ফিরে যাব আমরা। হলঘরে সেলুলার ফোন দেখেছি। পুলিশকে ফোন করব।'

'কিন্তু বাড়িতে লোক আছে,' মনে করিয়ে দিল মুসা। 'বুড়ো-বুড়ি দুটো। ওগুলোকেও কম হারামী মনে হয়নি আমার।'

'ওদের ঠেকানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে,' কিশোর বলল। 'নিশ্চয় ওদের কাছে বন্দুক থাকবে না।'

'কিন্তু শিকারীরা সহজেই আমাদের পিছু নিয়ে বাড়িটায় গিয়ে উঠবে। পুলিশ আসার আগেই খুন করবে আমাদের।'

'আরেক কাজ করা যেতে পারে,' রবিন বলল। 'পানিতে নেমে সাঁতরে গিয়ে উঠব বাড়ির কাছে। তাতে আমাদের চিহ্ন খুব কম দেখতে পাবে ওরা।'

'হ্যাঁ, এ বুদ্ধিটা মন্দ নয়,' কিশোর বলল। 'তবে...'

কথা শেষ হলো না ওর। পায়ের নিচে মাটি ধসে পড়ল। হঠাৎ করে দেবে যেতে শুরু করল সে।

আঠারো

বালির মেঝেতে আছড়ে পড়ল কিশোর। তার পর পরই পড়ল রবিন। ওপর দিকে

তাকিয়ে অনুমান করল, নয় ফুট গভীর একটা গর্তে পড়েছে। গর্তের মুখটা লতাপাতা দিয়ে ঢাকা ছিল।

গর্তের মুখের কাছে কিনার খামচে ধরে ঝুলে থেকে প্রাণপণে পতন রোধ করার চেষ্টা করছে মুসা।

'পড়ো না, মুসা, পড়ো না! ওঠার চেষ্টা করো,' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'তুমি পড়ে গেলে আশা-ভরসা সব শেষ। কোনমতেই আর বেরোতে পারব না আমরা।'

'চেষ্টা তো করছি,' গোঁ-গোঁ করে বলল মুসা। পিছলে গেল একটা হাত। নেমে এল কয়েক ইঞ্চি। মরিয়া হয়ে হাতটা সরিয়ে এনে থাবা মারল। জুতোর ডগা গর্তের দেয়ালে বসিয়ে দিয়ে আটকে থাকার চেষ্টা করল। ভাগ্য ভাল, হাতে ঠেকল একটা শিকড়। আঁকড়ে ধরল ওটা। বেয়ে উঠে গেল ওপরে। গর্তের বাইরে বসে একটা মুহূর্ত হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে রইল নিচের দিকে।

'ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছিল,' জোরে জোরে বলল সে। 'জানোয়ারের জন্যে। যেন বন্দুকের শক্তিতে কুলাচ্ছিল না, নিরীহ জানোয়ারগুলোকে আটকানোর জন্যে ফাঁদেরও দরকার...মরুক ব্যাটারা! তোমাদের তুলে আনার ব্যবস্থা করছি।'

লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল মুসা। হাত বাড়িয়ে দিল নিচে। অনেক কায়দা কসরত করে প্রথমে রবিনকে তুলে আনল। দুজনে মিলে তখন কিশোরকে তুলতে আর তেমন অসুবিধে হলো না।

গর্তে পড়ে অনেক সময় নষ্ট হলো ওদের। হাঁটতে শুরু করল আবার। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে রবিন। অবশেষে বলল, 'বারোটা বাজল। বেরিয়ে পড়েছে বোধহয় তিন পিশাচ। জলদি চলো, পানিতে গিয়ে নামি।'

'প্ল্যানটার সামান্য পরিবর্তন করছি আমি,' কিশোর বলল। 'তোমরা চলে যাও।'

'কি বলছ?' প্রায় চিৎকার করে উঠল মুসা। 'কেন?'

'শ্‌শ্‌শ্‌! আস্তে! টোপ হিসেবে একজন থাকলে সুবিধে হবে। চিহ্ন রেখে রেখে এগোব আমি। শিকারীরা আমার পিছু নেবে। এই সুযোগে সহজেই বাড়িতে পৌঁছে যেতে পারবে তোমরা। পুলিশের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাবে।'

'সুযোগের দরকার নেই,' মানা করে দিল রবিন। 'তোমাকে টোপ বানিয়ে গুলির মুখে ফেলে সময় নিতে চাই না আমরা।'

'নিতে হবে!' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'এটাই সবচেয়ে ভাল বুদ্ধি। তোমরা কিছু একটা না করা পর্যন্ত যে ভাবেই হোক টিকে থাকব আমি। যাও, সময় নেই।' রবিনের কাঁধ চেপে ধরে এক ঝটকায় তাকে পানির দিকে ঘুরিয়ে দিল সে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রওনা হতে হলো রবিন আর মুসাকে। বুঝতে পারছে, কিশোরের বুদ্ধিটাই ভাল।

ঘুরে তাকিয়ে বলল রবিন, 'গুড লাক, কিশোর।'

হাসল কিশোর, 'তোমাদের জন্যেও একই কথা। বলা যায় না, শয়তানগুলো আমার পিছু না নিয়ে তোমাদেরও নিতে পারে।'

আর কিছু না বলে হাঁটতে শুরু করল রবিন আর মুসা। দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল গাছের দেয়ালের আড়ালে।

হঠাৎ, বড় একা লাগল কিশোরের। ও জানে, ওর এই পরিকল্পনায় মুসা আর রবিন অনেকটা সুযোগ পাবে; কিন্তু সে নিজে পড়ে গেল ভয়ানক বিপদের মধ্যে। তিনজন সশস্ত্র শিকারী ধেয়ে আসবে ওর দিকে, নিরস্ত্র অবস্থায় শুধু বুদ্ধির জোরে ওদের হাত থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। আজ রাতে মগজের যতখানি ক্ষমতা আছে ওর, সবটুকুকে কাজে লাগাতে হবে।

কান পেতে রইল সে। শোনার চেষ্টা করছে। কিন্তু জু আইল্যান্ডের নিজস্ব শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। খুব দুর্বল কোন রেডিও স্টেশন ধরার জন্যে টিউনিং করছে যেন।

কয়েক মিনিট পর দূর থেকে ভেসে এল কথার শব্দ।

মুহূর্তে বুকের দুরুদুরু তিন গুণ বেড়ে গেল ওর। খেলা শুরু। পরাজিত হলে নিশ্চিত মৃত্যু।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেক কাছে চলে এল কথার শব্দ। অনেক স্পষ্ট।

'একেবারেই সহজ,' একজনকে বলতে শুনল কিশোর। 'রাখঢাকের চেষ্টা করে নি। চিহ্ন ফেলে গেছে। সোজা গর্তের দিকে এগিয়েছে মনে হয়।'

'গর্তেই পড়েছে কিনা কে জানে,' হতাশ হলো যেন ইংরেজ লোকটা। 'তাহলে মজাটাই মাটি।'

ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে কিশোরের মগজে। ভাবছে, কি করবে? গাছে চড়বে, যাতে নিচে দিয়ে চলে যায় শিকারীরা?

উঁহু, বাতিল করে দিল ভাবনাটা। ওপরে তাকিয়ে দেখে ফেললে আর পালানোর উপায় থাকবে না।

'যদি দেখা যায়,' বেরিংটন বলল, 'ভাগাভাগি হয়ে গেছে, তাহলে আমাদেরও ভাগ হয়ে যেতে হবে।'

হালকা পায়ে হাঁটতে শুরু করল কিশোর। চলতে থাকাটাই ওর কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হলো। মুসা আর রবিন গিয়ে পুলিশকে ফোন না করা পর্যন্ত টিকে থাকতেই হবে আমাকে, মনকে বোঝাল সে।

মাটির দিকে নজর রাখা দরকার। আবার কোন গর্তে পড়লে, শেষ। কিন্তু অন্ধকারে কি করে নজর রাখবে? টর্চ জ্বালানোটা হয়ে যাবে মস্ত বড় ভুল।

'গর্তেই পড়েছিল,' কালো লোকটাকে বলতে শুনল কিশোর। 'দুজন। অন্য একজন টেনে তুলেছে ওদের।'

উঁচু মানের ট্র্যাকারের পাল্লায় পড়েছে, লোকটার কথায় নিশ্চিত হয়ে গেল কিশোর। কোন কিছুই চোখ এড়ায় না। ওর জন্যে তাকে ধরে ফেলাটা কোন ব্যাপারই না। শিকারীর তাড়া খেয়ে বুনো জানোয়ারের পালাতে কেমন লাগে হাড়ে হাড়ে অনুভব করল সে। পালানোর জন্যে আতঙ্কিত, মরিয়া।

'এদিকে,' কালো লোকটা বলল।

ঠিক আমার পেছনে লেগেছে, ভাবল কিশোর। ফাঁকি দেয়ার জন্যে কিছু একটা করা দরকার। জলদি।

তীক্ষ্ণ চিৎকার চিরে দিল রাতের নীরবতা।

তুষার চিতা। তার সঙ্গীটাও হতে পারে। তোদের মত আমারও অবস্থা হয়েছে

রে—মনে মনে বলল কিশোর।

হঠাৎ করেই বুদ্ধিটা এল মাথায়।

আবার ডেকে উঠল চিতাটা। ঘুরে গেল কিশোর। দ্রুত এগিয়ে চলল ডাক লক্ষ্য করে। কয়েকটা জানোয়ারকে ছেড়ে দেবে। তাতে পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠবে শিকারীদের জন্যে। একা কিশোরের দিক থেকে মনোযোগ সরাতেও বাধ্য হবে। তাতে টিকে থাকার সময় পাবে সে।

জানোয়ারের খাঁচার কাছে পৌঁছে গেল সে। জেগে যাওয়া জানোয়ারগুলো শিকের ফাঁক দিয়ে তাকাতে লাগল ওর দিকে। ওগুলোকে ছেড়ে দেয়াটা তার নিজের জন্যেও বিপজ্জনক। কিন্তু সে এখন মরিয়া। ঝুঁকি নিতেই হবে।

প্রথমে এসে দাঁড়াল তুষার চিতার খাঁচার সামনে। পকেট থেকে মাস্টার কী বের করে তালায় ঢুকিয়ে দিল। কয়েক সেকেন্ডের চেষ্টাতেই খুলে ফেলল। মেঝেতে পড়ে থাকা রক্তমাখা একটা হাড় দেখে আশা করল, পেট ভরে খেয়েছে চিতা দুটো, তার দিকে আর নজর দেবে না।

খুলে দিল খাঁচার দরজা।

পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দরজার দিকে এগোল চিতা দুটো। ধীরে সুস্থে বেরিয়ে এল। গভীর কৌতূহলে মাটিতে নাক নামিয়ে শুঁকতে শুরু করল।

'পালিয়ে যা!' খুব আস্তে, নরম স্বরে বলল কিশোর। 'কোন অসুবিধে নেই, কেউ কিছু বলবে না, চলে যা!'

ওর কথা বুঝল কিনা চিতা দুটো, বোঝা গেল না। কিন্তু কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন দিকে আর না তাকিয়ে দুই লাফে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

খুশিতে আরেকটু হলেই চিৎকার দিয়ে ফেলেছিল কিশোর। সামলে নিল। চিতা দুটোর আচরণ বুঝিয়ে দিল, তাকে আক্রমণের চেয়ে পালানোর দিকেই আগ্রহ বেশি ওদের। বাকি জানোয়ারগুলো কি করবে কে জানে! বন্দি করে রাখার কারণে মানুষের প্রতি তীব্র ঘৃণা জন্মেছে হয়তো ওদের। থাকগে, অত ভাবার সময় নেই।

সাদা বাঘের তালা খোলায় মন দিল সে। নীলা পাথরের মত হালকা নীল চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে বাঘটা।

'হাই, সুন্দরী,' মোলায়েম স্বরে কথা বলে ওটার সঙ্গে আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করল কিশোর. 'তোমার খালাত ভাই-বোন দুটোকে এইমাত্র ছেড়ে দিলাম। দেখেছ নিশ্চয়। তুমিও যাও।'

খাঁচার দরজাটা মেলে ধরল সে।

উনিশ

পানি থেকে উঠে এল মুসা আর রবিন। একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রইল।

'বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছি নিশ্চয়,' হাত দিয়ে মাথার পানি ঝেড়ে ফেলল রবিন।

'বিশ্রামের কি আর দরকার আছে?' মুসা বলল।
'উফ্, যা স্রোত ঠেলে এলাম। এক সেকেন্ড।'
দ্বীপের আরেক প্রান্ত থেকে একটা চিৎকার কানে এল ওদের। মানুষের বলে মনে হলো। তারপর আর কিছু না। কেবল পায়ের কাছে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ।
অন্ধকারে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। কেউ কারও চোখ দেখতে পেল না।
'কিশোর না তো?' গলা কেঁপে উঠল মুসার।
'কি করে বলব!' স্বর বেরোচ্ছে না রবিনের গলা দিয়ে। 'হতে পারে…'
'না, পারে না,' জোর দিয়ে বলল মুসা। 'এত সহজে মরবে না কিশোর। চলো, বসে না থেকে আমাদের কাজটা সেরে ফেলি।'
সৈকতের বালি মাড়িয়ে গেলে পায়ের ছাপ পড়বে, তাই যতটা সম্ভব পাথরের ওপর থাকার চেষ্টা করল। সৈকত পেরিয়ে এসে ঢুকে পড়ল জঙ্গলে। কালো ছায়া গিলে নিল ওদের। ঘন গাছপালা আর ঝোপে ভরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ভেজা শরীর ও খালি পায়ে এগোতে গিয়ে এখন টের পেল কাজটা কত কঠিন।
তবে যত কঠিনই হোক, বাড়ির কাছে পৌঁছে গেল শেষ পর্যন্ত। নিঃশব্দে উঠে এল ডেকে। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, হলঘরে টেলিভিশন দেখছে বুড়ো-বুড়ি। কফি টেবিলে রাখা সেলুলার ফোনটার পাশে রাখা এখন একটা অটোম্যাটিক পিস্তল।
'ফোনটা দেখে ভালই লাগছে,' মুসা বলল, 'পিস্তলটা দেখে লাগছে খারাপ।'
দেয়ালে বসানো বিশাল বাইসনের মাথাটার দিকে তাকিয়ে রবিনের মনে হলো, ওটা যেন তাকে নীরবে বলছে: 'শিকারীগুলোকে কাছে আসতে দিয়ো না, খোকা; তাহলে আমার অবস্থা হবে তোমার মাথাটারও।'
'পেছনটা দেখে এলে কেমন হয়?' মুসা বলল। 'জানালা খোলা পেলে ঢুকতে সুবিধে হবে। বাড়িতে কোথাও না কোথাও নিশ্চয় আরও ফোন আছে।'
বাড়ির পেছনে এসে দেখা গেল, গ্রাউন্ড ফ্লোরে আরও জানালা আছে বটে, কিন্তু একটাও খোলা নেই।
'কাঁচ ভেঙে ঢোকা যায়,' রবিন বলল। 'কিন্তু শব্দ শুনে পিস্তল নিয়ে দৌড়ে আসবে বুড়োটা।'
দোতলার দু'একটা জানালার পাল্লা খোলা মনে হলো। অন্ধকার জানালাগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে মুসা বলল, 'ওসব ঘরের কোথাও রাজকুমারীকে রাখেনি তো?'
জবাব না দিয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল রবিন। কি করা যায়, ভাবছে। খানিক দূরে একটা ছাউনি দেখা গেল, বোধহয় মালপত্র রাখা হয় ওটাতে। 'চলো তো দেখি, দড়িটড়ি কিছু পাওয়া যায় নাকি।'
নিঃশব্দে ছাউনির কাছে এসে দাঁড়াল দুজনে। দরজায় তালা। তৈরি হয়েই দ্বীপে এসেছে ওরা। পকেট থেকে আরেকটা মাস্টার কী বের করল রবিন। তালা খুলতে কয়েক সেকেন্ডের বেশি লাগল না। প্রথমে ভেতরে ঢুকল রবিন। গাঢ় অন্ধকার।
পেছন থেকে ওকে জাপটে ধরল কেউ। দাঁত বসিয়ে দিল কব্জিতে। উহ্ করে উঠল সে। ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সরতে গেল। পড়ে গেল একটা ধাতব খাঁচার ওপর।

'কি হলো?' ঘরে ঢুকল মুসা।

'কে? মুসা নাকি? রবিন?' ফিসফিস করে বলল একটা কণ্ঠ।

মিটমিটে একটা আলো জ্বলছিল, এতক্ষণে লক্ষ করল রবিন। চাবি ঘুরিয়ে বাড়ানো হলো আলোটা। বাক্সের ওপর রাখা একটা লণ্ঠন। রাজকুমারী ঘুরে দাঁড়াল ওদের মুখোমুখি। চুল এলোমেলো, পোশাক দোমড়ানো–এ ছাড়া আর কোন পরিবর্তন নেই তার। সুস্থই আছে মোটামুটি।

'তোমাদের দেখে কি যে খুশি হলাম,' বলল সে। 'সরি, রবিন। আমি ভাবলাম বুড়ো শয়তানটা, সেজন্যেই কামড়ে দিয়েছি। দেখো, কি জায়গায় এনে রেখেছে আমাকে।'

'তুমি ভাল আছ তো?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আছি। অন্তত যতটা খারাপ থাকার কথা ছিল, ততটা নেই।'

'শুনে খুশি হলাম।'

লণ্ঠনটা তুলে নিল রবিন। মুসা আর চন্দ্রাবতীকে বলল, 'তোমরা বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। আলোর কাছে যাবে না, ছায়ায় লুকিয়ে থাকবে। আমি দেখি, বাড়িতে ঢোকার জন্যে দড়িটড়ি পাওয়া যায় কিনা।'

বেরিয়ে গেল দুজনে। দরজাটা ভেজিয়ে দিল রবিন, খোলা দরজা দিয়ে আলো বেরোতে দেখলে কৌতূহলী হয়ে চলে আসতে পারে চাকরটা। মেঝেতে পড়ে আছে একটা স্লীপিং ব্যাগ। কিছু বাড়তি খাঁচা আছে। আর আছে ওগুলো মেরামতের কিছু যন্ত্রপাতি। একটা গোপন খুপরিতে এক বাক্স ট্র্যাঙ্কুইলাইযার ডার্ট পেয়ে গেল সে। সেদিন চিড়িয়াখানায় ছুটে যাওয়া বাঘটাকে কাবু করতে এ ধরনের ডার্ট ব্যবহার করা হয়েছিল, মনে আছে তার। ডার্ট ভরে ছোঁড়ার জন্যে তৈরি তামার নলও পেয়ে গেল। ডার্টগুলোর কথা নিশ্চয় ভুলে গিয়েছিলেন বেরিংটন, নইলে কোনমতেই রাজকুমারীকে যে ঘরে বন্দি করা হয়েছে, সেখানে রাখা হতো না। কিংবা হয়তো কেয়ারই করেনি।

চন্দ্রাবতীর চিৎকার শোনা গেল।

ধড়াস করে উঠল রবিনের বুক।

মাথা গরম করল না। এ সব পরিস্থিতিতে সাধারণত যা করার কথা, জোরে টান দিয়ে দরজা খুলে দেখতে গেল না কি হয়েছে। বরং আস্তে করে পাল্লাটা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিল।

একটা গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে মুসা। ওর পাশে দাঁড়ানো চন্দ্রাবতী। একটা হাত চেপে ধরে রেখেছে মুসা। শান্ত হতে বলছে।

কি দেখে চিৎকার করেছে রাজকুমারী, বুঝতে পারল না রবিন। আরেকটু ফাঁক করল পাল্লা। গাছের সীমানার বাইরে, আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে চোখে পড়ল এতক্ষণে। শিকারীদের একজন, কালো লোকটা। হাতে একটা ধনুক। ইনডিয়ানদের ধনুকের মত, তবে অনেক ছোট। ক্রসবো বলে এগুলোকে। তাতে পালকের পুচ্ছ পরানো একটা ছোট তীর। তুলে ধরে রেখেছে ছোঁড়ার ভঙ্গিতে।

'চালাকিটা ভালই করেছিলে,' শয়তানি হাসি হেসে বলল লোকটা। 'তোমার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে পানির কিনারে চলে গেলাম। তারপর আর কিছু নেই।

অনুমান করে নিলাম, কোথায় গিয়েছ। দেখলে তো, ভাল ট্র্যাকার শুধু শিকারের চিহ্ন দেখে বুঝতে পারে না সে কোনদিকে গেছে, চিহ্ন না দেখেও বলে দিতে পারে তার মনে কোন ভাবনা খেলা করছে। যাকগে, আমি আমার শিকার খুঁজে পেয়েছি।'

ধনুকটা আরেকটু তুলল শিকারী। মুসার হৃৎপিণ্ড নিশানা করল। ধীরে ধীরে ছিলায় টান দিয়ে বাঁকা করতে শুরু করল ধনুকটা।

দেখছে রবিন। এক্ষুণি কিছু করা দরকার। দেরি করলে মারা পড়বে মুসা।

বিশ

এক দৌড়ে গিয়ে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে এল রবিন। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে লোকটাকে সই ক'রে ছুঁড়ে মারল।

উড়ে আসা আগুন থেকে বাঁচাতে মাথা নিচু করে ফেলল লোকটা। ওর কাছেই মাটিতে পড়ল লণ্ঠন। নিভে গেল।

লাফ দিয়ে গাছের কাছ থেকে সরে গেল মুসা। তীর ছেড়ে দিয়েছে লোকটা। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। শাঁ করে মুসার কানের পাশ দিয়ে চলে গেল তীরটা। থ্যাক করে গিয়ে বিঁধল একটা গাছে। তূণ থেকে নিয়ে চোখের পলকে আরেকটা তীর ধনুকে পরিয়ে ফেলল শিকারী। চন্দ্রাবতীও বসে নেই। ছুটে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। হাতে কামড় মারল।

উহ্ করে উঠে তীর ফেলে দিয়ে হাত ছাড়ানোর জন্যে ঝাড়া মারল লোকটা।

মাথা নিচু করে ছুটে যাচ্ছে মুসা। লোকটা সবে হাত ছাড়িয়েছে, পেটে খেল গুঁতো। স্বদেশী মানুষের খুলির স্বাদ আগে আর পায়নি বোধহয় কোনদিন, আজ পেল। গাঁক করে বাতাস সহ শব্দ বেরিয়ে এল মরা মাছের মত হাঁ হয়ে যাওয়া মুখ দিয়ে। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল শরীর।

তামার নলে ডার্ট পরিয়ে ফেলেছে রবিন। ঠোঁটে লাগিয়ে শিকারীকে লক্ষ্য করে জোরে এক ফুঁ মারল। মুসার মাথার গুঁতোর ব্যথা সামলে উঠতে পারেনি তখনও লোকটা। এক হাতে পেট চেপে ধরে রেখেছে। বাহুর মাংসে এসে বিঁধল রবিনের ছোঁড়া ডার্ট। হাঁ করা মুখটা কয়েক সেকেন্ড হাঁ হয়েই রইল। তারপর জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল সে। ছাউনি থেকে দড়ি এনে গাছের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধল তাকে মুসা আর রবিন।

'গেল একটা।' মাটি থেকে ধনুকটা কুড়িয়ে নিল মুসা। শিকারীর তূণটা খুলে নিয়ে কাঁধে পরল।

মূল বাড়ির সামনের দরজা খোলার শব্দ হলো। পিস্তল হাতে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে লিওনার্ড। কিসের শব্দ দেখার চেষ্টা করছে। ছুটে গাছের আড়ালে চলে এল তিনজনে।

'তীর লাগাতে পারবে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'চেষ্টা করে দেখতে পারি,' জবাব দিল মুসা। 'মিস করলে বিপদে পড়ব।

পিস্তল হাতে ছুটে আসবে সে। কিন্তু ওকে কাবু করতে না পারলে ফোনটাও ব্যবহার করা যাবে না।'

'অ্যাই, আরেক কাজ করতে পারি,' চন্দ্রাবতী বলল। 'বোটহাউসটা দেখেছি আমি। খুঁজে বের করতে পারব। বোটে রেডিও আছে।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। মুসাকে বলল, 'সেটাই বরং ভাল। চলো, চুপে চুপে কেটে পড়ি।'

গাছের আড়ালে আড়ালে নিঃশব্দে বাড়িটার কাছ থেকে সরে এল ওরা। যখন বুঝল, লিওনার্ডের কানে শব্দ যাবে না, তখন দৌড়ানো শুরু করল। জঙ্গলের মধ্যে দৌড়ানো খুব কঠিন। শিকড়ে পা বেধে যাচ্ছে, লতা জড়িয়ে ধরছে শরীর, হাতে-মুখে ডালের খোঁচা খাচ্ছে; উপরন্তু মুসা আর রবিনের খালি পায়ে বিঁধছে বেরিয়ে থাকা শিকড়ের চোখা মাথা। তার ওপর গরম। মুহূর্তে ঘেমে, নেয়ে গেল। কিন্তু কোন কিছুই দমাতে পারল না ওদের।

'বেশি দূরে নেই আর,' রাজকুমারী বলল।

'হুঁ,' হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিল মুসা।

হঠাৎ যেন দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল রবিন। কয়েক কদম দূরে মাটিতে কি যেন শুঁকছে একটা জাগুয়ার।

'এল কোত্থেকে?' ফিসফিস করে বলল সে।

'কি জানি!' তীর-ধনুক রেডি করল মুসা। 'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। যতদূর জানি, চিতাবাঘ পরিবারের সবচেয়ে বদমেজাজী জানোয়ার এই জাগুয়ার। তা ছাড়া এখানে নিশ্চয় খুব দুর্ব্যবহার চলে ওদের ওপর। মেজাজ অনেক বেশি তিরিক্ষি হয়ে থাকার কথা।'

'কি শুঁকছে?' রাজকুমারী বলল।

'চুপ! চুপ!' থামানোর চেষ্টা করল মুসা।

দেরি হয়ে গেছে। শব্দ শুনে মুখ তুলল জাগুয়ারটা। সবুজ চোখ জোড়া স্থির হলো ওদের ওপর। ভয়ঙ্কর এক গর্জন করে উঠল।

আর কোন উপায় না দেখে ধনুক তুলল মুসা। কিন্তু তীর ছোঁড়ার সময় পেল না। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জানোয়ারটা। কাঁধে নখের চাপ অনুভব করল মুসা। মুখে লাগছে দুর্গন্ধে ভরা গরম নিঃশ্বাস। হাঁ করা ভয়ানক মুখের শ্বদন্তগুলো বেরিয়ে পড়েছে।

দুই হাতে মাথা চেপে ধরে জানোয়ারটাকে ঠেলে সরানোর চেষ্টা করতে লাগল মুসা।

আবার গর্জে উঠল ওটা। গরম নিঃশ্বাসের হলকা এসে মুসার মুখে লাগল। মনে হলো কানের পর্দা ফেটে গেছে। কিন্তু হাল ছাড়ল না সে। কিছুতেই নাকে-মুখে কামড় বসাতে দিল না।

কয়েক মুহূর্ত পরেই তার গায়ের ওপর ঢলে পড়ল জাগুয়ারটা। কারণটা বুঝতে সময় লাগল মুসার। নিশ্চয় ডার্ট বিঁধিয়ে দিয়েছে রবিন।

'আরে সরাও না!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'একা পারছি না তো। এত ওজন, বাপরে বাপ!'

'তোমার চেয়েও বেশি?' হাসতে হাসতে জাগুয়ারটাকে সরানোর জন্যে উবু হলো রবিন।

টেনেহিঁচড়ে মুসার গা থেকে নামানো হলো ওটাকে।

নিজের কাঁধ ছুঁয়ে দেখল মুসা। নখের আঁচড়ে সামান্য কেটে গেছে মাত্র। রক্ত পড়ছে, তবে বেশি না। এ ছাড়া আর তেমন ক্ষতি হয়নি।

একটু আগে জাগুয়ারটা কি শুঁকেছিল, দেখে, মাথার শিরায় রক্ত ঝলকে উঠল রবিনের। কিশোরের শার্ট ছেঁড়া কাপড়। হাতে নিয়ে বুঝল, রক্তমাখা। মানুষের চিৎকারটার কথা মনে পড়ল তার। অবশ হয়ে আসতে চাইল শরীর। আপনাআপনি ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে হাঁটু দুটো।

কিন্তু মুসা এবারও মেনে নিতে পারল না–বুনো জানোয়ারের হাতে মারা পড়েছে কিশোর। তাগাদা দিল, 'চলো, চলো, বোটহাউসটা খুঁজে বের করি আগে। তারপর দেখা যাবে।'

আবার ছুটল তিনজনে। পৌঁছে গেল একটা ছোটখাট পাহাড়ের সমান পাথুরে টিলার কাছে। তার পাশে এক চিলতে সৈকত।

'এখানেই কোথাও আছে বোটহাউসটা,' চন্দ্রাবতী বলল।

এক এক করে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠল ওরা। চূড়া থেকে ঢাল বেয়ে আবার নেমে এল অন্যপাশে, সৈকতে। পানিকে একপাশে রেখে সৈকত ধরে এগোল।

অবশেষে পাওয়া গেল ওটা।

'ওই যে, বোটহাউস,' রাজকুমারী বলল।

হাঁক শোনা গেল এই সময়, 'ওদিকে যাবার আর দরকার নেই। থামো!'

ফিরে তাকাল তিনজনে। টিলার চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন বেরিংটন। ধনুকটা তোলা। ওদের দিকে।

'দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে লাভ নেই,' বেরিংটন বললেন। 'একেবারে খোলা জায়গায় রয়েছ তোমরা। আমার নিশানা মিস হবে না, বিশ্বাস করতে পারো।'

চারপাশে তাকাল রবিন। বুঝল, মিথ্যে বলছেন না বেরিংটন। ডাইভ দিয়ে পানিতে গিয়ে পড়ার বা পাথরের আড়ালে লুকানোর আগেই তাকে বিঁধে ফেলবে তীর। মুসা আর চন্দ্রাবতীও তার মতই অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'তামার পাইপটা ফেলে দাও!' আদেশ দিলেন বেরিংটন। 'মুসা, তোমার হাতের তীরও ফেলো।'

আর কোন উপায় না দেখে বেরিংটন যা করতে বললেন, করল দুজনে।

'ভালই দেখালে,' বেরিংটন বললেন। 'কিশোরের চেয়ে তোমাদের খুঁজে বের করতে দেরি হয়েছে।'

কিশোরকে পেয়ে গেছে! হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হলো রবিনের। 'মেরে ফেলেছেন নাকি ওকে?'

'বেশি চালাকি করেছিল,' জবাব দিলেন বেরিংটন। 'আমাদের কাজ কঠিন করে তোলার জন্যে খাঁচার কয়েকটা জানোয়ার ছেড়ে দিয়েছিল। উল্টে ওগুলোই ওকে ধরে ছিঁড়ে খেয়েছে। চিহ্ন অনুসরণ করে গিয়ে কয়েক টুকরো রক্তাক্ত ছেঁড়া কাপড়

বাদে আর কিছুই পাইনি। ওকে বাদ দিয়ে তখন তোমাদের পিছু নিলাম। চন্দ্রাবতীকেও বের করে নিয়ে এসেছ দেখি। চালাক ছেলে। হাল্লো, ইয়োর রয়্যাল হাইনেস।'

'জাহান্নামে যা, শয়তানের বাচ্চা!' হিন্দিতে গালি দিল চন্দ্রাবতী।

'কি বলল ও?' বুঝতে পারলেন না বেরিংটন। 'এ কোন্ জাতের ভাষা!'

'ও আর বুঝে কি করবেন,' রবিন বলল। 'অতি সাধারণ একটা গালি দিল।'

'শুধু শুধু আমার ওপর রাগ করছ তোমরা,' শান্তকণ্ঠে বললেন বেরিংটন। 'সারভাইভাল অভ দা ফিটেস্ট কথাটা শোনোনি কখনও? পৃথিবীটা হলো টিকে থাকার জায়গা। দুর্বলের ঠাঁই নেই এখানে। একজন আরেকজনের ওপর কর্তৃত্ব করে বেঁচে থাকবে, এটাই হলো নিয়ম। তোমাদের চেয়ে আমি শক্তিমান, আমার সঙ্গে পারোনি, কাজেই তোমাদের মরতে হবে।'

'কাউকে যদি মরতেই হয়, মিস্টার বেরিংটন,' অন্ধকারে শোনা গেল আরেকটা কণ্ঠ, 'সেটা আপনাকে।'

হা হা করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল রবিনের। ওই কণ্ঠ দুনিয়ার যে কোনখানে চিনতে পারবে সে। পাথরের টিলার ওপাশে অন্ধকার বনের দিকে তাকিয়ে রইল। কিশোরকে দেখতে পেল না, তবে জানে ওখানেই আছে।

'আমি জানতাম, কিশোর মরবে না,' আবেগে বুজে আসতে চাইল মুসার গলা। এত সহজে মরতে পারে না ও। কিশোর পাশাকে ঠকানোর বুদ্ধি এই উন্মাদটার নেই।'

'কেউ আমাকে খায়নি, বেরিংটন,' কিশোর বলল। 'জানোয়ারগুলোকে ছেড়ে দেয়ার পর গাছে উঠে বসে ছিলাম। তারপর আপনার ইংরেজ বন্ধুর চিৎকার শুনলাম। মনে হয় বাঘে তাড়া করেছিল, একটা গর্তে লাফিয়ে পড়ে প্রাণে বেঁচেছে। হয়তো এখনও ওখানেই আছে। এতবড় শিকারী, আহা! প্রাণের ভয়ে বসে বসে ইঁদুরের মতই কাঁপছে নিশ্চয় এখন।'

কার চিৎকার শুনেছিল, বুঝল এখন রবিন।

চন্দ্রাবতীর দিকে তাকাল। রাজকুমারী তাকিয়ে আছে অন্ধকার বনের দিকে। চিৎকার করে কি যেন বলল। হিন্দিতে নয়। দুর্বোধ্য ভাষা। বুঝল না কেউ।

'আরেক বুদ্ধি করলাম তখন, বেরিংটন,' কিশোর বলল। 'একজন গর্তে পড়েছে, বাকি রয়ে গেছেন দুজন। গাছ থেকে নেমে বাঘের খালি খাঁচার মধ্যে ঢুকলাম। রক্তমাখা কিছু হাড়ের টুকরো পড়ে ছিল তখনও। শার্ট ছিঁড়ে ডলে ডলে রক্ত লাগালাম। তারপর পথের ওপর ফেলে রেখে আবার গিয়ে উঠলাম গাছে। আপনি ওগুলো দেখে ভাবলেন আমাকে বাঘে খেয়েছে। অথচ ওপর দিকে তাকালেই আমাকে দেখতে পেতেন। বুঝলাম, মুখে যতটা ফটর-ফটর করেন, তত বড় শিকারী আপনি নন। খাঁচায় আটকানো জানোয়ার মারতে মারতে শিকারীর সতর্কতা একেবারেই গেছে আপনার। নইলে অনেক আগেই খতম করে দিতে পারতেন আমাকে। যাই হোক, মুসা আর জাগুয়ারের চিৎকার শুনে সেদিকে দৌড় দিলাম। রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখলাম একটা ধনুক, তাতে তীর পরানো আছে তখনও। মনে হয় আপনার ওই ইংরেজ বন্ধুর অস্ত্রই হবে ওটা। বাঘের তাড়া খেয়ে

বেচারার পেসাব করে দেয়ার অবস্থা হয়েছিল, বোঝা গেছে এ থেকেই। ওটা এখন আমার হাতে, বেরিংটন।'

চিৎকার করে আবার কিছু বলল চন্দ্রাবতী।

'কি বলছ?' তীরটা রবিনের দিকে তাক করে রেখে চন্দ্রাবতীকে জিজ্ঞেস করলেন বেরিংটন।

ইংরেজীতে জবাব দিল রাজকুমারী, 'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, শীঘ্রিই তো আমার মৃত্যু হবে, আমাকে যেন নরকে না পাঠায়।'

'তা বোধহয় পাঠাবে না। অত খারাপ তো তোমরা নও। তোমাদের জন্যে সত্যি দুঃখ হচ্ছে আমার, চালাক মানুষদের আমার ভাল লাগে। কিন্তু কিছুই করার নেই। মরতেই হবে। তোমাদের ছেড়ে দিলে জেলে যেতে হবে আমাকে।'

'আমি বলেছি, বেরিংটন,' চিৎকার করে বলল কিশোর, 'আমার হাতে তীর-ধনুক আছে। আপনার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছি আমি। নিশানাও আমার খারাপ না।'

হাসিতে ফেটে পড়ল বেরিংটন। 'মিথ্যে বলে আর ভোলাতে পারবে না আমাকে, খোকা। জীবনে একবারও ক্রসবো ব্যবহার করেছ কিনা সন্দেহ আছে আমার। এ জিনিসে হাত ঠিক করতে বছরের পর বছর প্র্যাকটিস করতে হয়। তুমি একটা ছোঁড়ার আগেই সৈকতে দাঁড়ানো তিনজনকে মেরে ফেলতে পারব আমি। প্রমাণ চাও? বেশ, প্রথমে রবিনকে নিশানা করছি আমি। তুমি একটা তীর ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওকে মেরে ফেলব।'

ধনুকটা আরও ওপরে তুললেন বেরিংটন। রবিনের দিকে তাক করেই রেখেছিলেন, সেটাকে নিখুঁত করলেন আরও।

কিশোর জানে, সত্যি কথাই বলেছেন বেরিংটন। একশো বার ছুঁড়েও একবার লাগাতে পারবে কিনা সে, সন্দেহ।

চোখ বুজে ফেলেছে রবিন। বেরিংটনের ঘরের দেয়ালে বসানো বাইসনের মাথাটার কথা মনে পড়ল ওর। ভাবল, জানোয়ারটার নিষ্প্রাণ চোখের সতর্কবাণী কোন কাজে লাগল না। মরতে চলেছে সে।

দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করে উঠল চন্দ্রাবতী। আঙুল তুলল বেরিংটনের দিকে।

যেন পাথর ফুঁড়ে উদয় হলো একটা ছায়া। চোখের পলকে ঝাঁপিয়ে পড়ল বেরিংটনের ওপর। হাত থেকে ক্রসবো ছুটে গেল তাঁর। তাঁকে নিয়ে পাথরের ঢাল বেয়ে সৈকতের ওপর গড়িয়ে পড়ল তুষার চিতাটা। ভয়ঙ্কর গর্জন করে উঠল। বিকট হাঁ। বেরিংটনের টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেলার জন্যে রাজকুমারীর অনুমতি চাইছে।

সেই একই রকম দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলল চন্দ্রাবতী।

কামড় দিল না আর চিতাটা। বেরিংটনের গায়ের ওপর চেপে বসে রইল। ঝাড়া দিয়ে ওটাকে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলেন বেরিংটন। নিচু হয়ে মাটি থেকে তামার নলটা কুড়িয়ে নিয়েছে ততক্ষণে রবিন। ছুটে গিয়ে একেবারে বেরিংটনের উরুতে নলের মুখ ঠেকিয়ে ফুঁ দিয়ে ডার্ট ঢুকিয়ে দিল।

ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলেন বেরিংটন। কয়েক সেকেন্ড নড়াচড়া করল হাত-পাগুলো। তারপর নিথর হয়ে গেল।

মস্ত জিভ বের করে চন্দ্রাবতীর দিকে তাকিয়ে আছে কান্তা। নীরবে যেন প্রশ্ন করছে, এবার কি করব?

'নেমে আয়, কান্তা।'

চিতাটার দিকে এগিয়ে গেল রাজকুমারী।

চিতাটাও এগিয়ে এল তার দিকে। গলা জড়িয়ে ধরল চন্দ্রাবতী।

বন থেকে বেরিয়ে এসেছে কিশোর। ক্রসবো হাতে এসে দাঁড়াল টিলার চূড়ায়। ঢাল বেয়ে নেমে এল ধীরে সুস্থে।

চন্দ্রাবতীর দিকে তাকাল মুসা, 'মোটেও প্রার্থনা করোনি তুমি, তাই না? দুর্বোধ্য ভাষায় চিতাটাকে ডেকেছ।'

'কিশোর যখন বলল, কয়েকটা জানোয়ারকে ছেড়ে দিয়েছে,' রাজকুমারী বলল, 'শিওর হলাম, যে কান্তাকে অবশ্যই ছেড়েছে সে। মুক্ত থাকলে আমার ডাকে সাড়া দেবেই। চিৎকার করে ডাকতে শুরু করলাম তখন।'

'হুঁ,' রবিন বলল। 'তিনটা শয়তানই কাবু হয়েছে। এখন পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'আরও দুটো ছাড়া রয়ে গেছে এখনও,' মনে করিয়ে দিল মুসা। 'ইভিলিন আর লিওনার্ড। গাছের সঙ্গে যেটাকে বেঁধে রেখে এসেছি, সেটাকে দেখতে পেলে বাঁধন খুলে দিয়ে জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করতে পারে। ওর জ্ঞান ফিরে এলে আবার বেকায়দায় ফেলে দিতে পারে আমাদের।'

'তা বটে, শত্রুর শেষ রাখতে নেই, যত ছোটই হোক,' কিশোর বলল। 'রবিন যাও, বোটহাউসে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করো। মুসা, তুমি এসো আমার সঙ্গে। চন্দ্রাবতী, কান্তাকে নিয়ে তুমিও এসো। ও সাথে থাকলে অন্য কোন জানোয়ার সহজে কাছে ঘেঁষবে না আমাদের।'

পাঁচ রাত পর আবার রকি বীচ চিড়িয়াখানায় ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। একটা নাচের পার্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দাওয়াত করা হয়েছে, ফান্ড জোগাড়ের জন্যে। জু প্লাজাকে সাজানো হয়েছে। গাছগুলো জড়ানো আলোকমালায়। হাজার হাজার নানা বর্ণের আলো মিটমিট করে জ্বলছে। ব্যান্ড বাজছে। সীল-ফোয়ারাকে ঘিরে তালে তালে নাচছে সুবেশী নারী-পুরুষ।

রবিন আর কিশোর দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। স্কুলের কয়েকজন পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে। মুসা গিয়ে যোগ দিয়েছে নাচে। সঙ্গী হিসেবে পাকড়াও করেছে চন্দ্রাবতীকে। তার হবু বর ভানুস্বামীর বাদামী মুখটাকে কালো করে দিয়ে রাজকুমারীর সঙ্গে নাচা শুরু করেছে মুসা। ঈর্ষার আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরছে বেচারা ভানু। ফোঁস ফোঁস করছে, আর সুযোগ পেলেই শুনিয়ে দিচ্ছে আমেরিকায় আসাটা উচিত হয়নি মোটেও। বেশি কিছু বলতেও পারছে না পাছে চন্দ্রাবতী রেগে যায় সে ভয়ে।

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কিশোর ও রবিনের সামনে দাঁড়ালেন পরিচালক রিচার্ড বোম্যান। হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি, কেমন লাগছে পার্টি?' তাঁর টাইতে আঁকা রয়েছে একটা তুষার চিতার ছবি।

'দারুণ,' জবাব দিল রবিন। 'আপনার নতুন মেহমানরা কেমন আছে?'

'খুব ভাল আছে,' গর্বিত পিতার ভঙ্গিতে জবাব দিলেন পরিচালক। জু আইল্যান্ডের সমস্ত জানোয়ার নিয়ে আসা হয়েছে তাঁর চিড়িয়াখানায়। বেরিংটন ও তাঁর দোস্তদের নিয়ে গিয়ে জেলে ভরেছে পুলিশ। জু আইল্যান্ডে অবৈধ ভাবে শিকার করে ট্রফি হিসেবে বিপন্ন প্রাণীর মাথা নিয়ে গেছে যে সব নির্দয় শিকারী, পুলিশ তাদেরও খোঁজ করছে।

'ওই দেখো, কে আসছেন,' রবিনকে বলল কিশোর।

ফিরে তাকাল রবিন। দেখল, রিফ্রেশমেন্ট টেবিলের দিকে চলেছেন ডক্টর হেমিং। তাঁর পেছনে এক সারিতে মার্চ করতে করতে চলেছে ববি, টপ আর বেবি জুপিটার। তিনটের মাথায়ই রঙিন হ্যাট। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কিশোরদের দিকে হাত নাড়ল টপ আর বেবি জুপিটার। সাইন ল্যাংগুয়েজে ববি বলল, 'চিড়িয়াখানার বন্ধু!'

বিচিত্র দৃশ্য দেখে নাচ থামিয়ে ছুটতে ছুটতে এল মুসা আর চন্দ্রাবতী শিম্পাঞ্জিগুলোর কাণ্ড দেখে হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেল একেকজনের।

চন্দ্রাবতী বলল, 'এই চলো না তোমরা, কান্তাকে একবার দেখে আসি।'

'চলো,' সঙ্গে সঙ্গে রাজি মুসা।

তিন গোয়েন্দার পাশে পাশে হেঁটে চলল রাজকুমারী। পেছনে মুখ গোমড়া করে আসতে লাগল ভানুস্বামী।

আজ রাতে দিনের খাঁচাতেই রাখা হয়েছে জানোয়ারগুলোকে, পার্টির লোকজনের ইচ্ছে হলে যাতে গিয়ে দেখতে পারে।

তুষারে ঢাকা কৃত্রিম হিমালয়ের পাদদেশে এসে দাঁড়াল দলটা। আধশোয়া হয়ে আছে পুরুষ চিতাটা। কান্তা ওটার কোলের কাছে কুঁকড়িসুকড়ি হয়ে শুয়ে আছে। আদর করে তার গা চেটে দিচ্ছে পুরুষটা।

'কি বুঝলে?' চন্দ্রাবতীর দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। 'তোমার দিকে তো আর ফিরেও তাকাচ্ছে না তোমার কান্তা।'

হাসল চন্দ্রাবতী। 'আমার চেয়ে বেশি পছন্দের একজনকে পেয়ে গেছে, তাকাবে কেন।'

'খুব সুখী মনে হচ্ছে ওদের,' মুসা বলল।

'হ্যাঁ। তবে তার জন্যে আমি দুঃখিত নই, বরং ভাল লাগছে, পুরোপুরি আপন জগতে ফিরে যেতে না পারলেও আপনার একজনকে পেয়ে গেছে কান্তা। এটাই চেয়েছিলাম আমি।' রাজকুমারীর মুখে হাসি, চোখে জল। অবশ্যই আনন্দের।

'অনেক তো দেখা হলো,' রবিন বলল, 'চলো, ফিরে যাই। তাড়াতাড়ি না গেলে আজ না খেয়ে থাকতে হবে। খাবার সব সাফ করে দেবে। খুব খিদে পেয়েছে আমার।'

'আমারও,' কিশোর বলে উঠল। 'চলো, চলো।'

'খাইছে!' মুসার চোখ কপালে। 'আজ দেখি আমার রোগে সবাইকে ধরল, আমিই বাদ। খাই খাই করি বলে না আমার খালি বদনাম।'

'বদনাম কি আর ঘুচেছে মনে করো,' হাসল রবিন। 'তোমার হলো খাবার দেখলেই পেটে মোচড় দেয়, আমাদের তো আর তা না। হাজার হোক প্রাণী তো,

খিদে পাবেই। সময়মত খাওয়াও লাগবে।'

'থাক, আর লেকচারের দরকার নেই,' বাধা দিল মুসা। 'বহু আগে থেকেই পেটের মধ্যে ছুঁচো নাচছে আমার। রাজকুমারীর সামনে লজ্জায় বলতে পারছিলাম না।'

হাসাহাসি শুরু করল সবাই, ভানুস্বামী বাদে। তিন গোয়েন্দার সঙ্গে চন্দ্রাবতীকে হাসতে দেখে গোমড়া মুখটা শ্রাবণের মেঘে ঢাকা আকাশ হয়ে গেল তার।

—ঃ শেষ ঃ—

ভলিউম ৪০

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা-
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস আঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে।
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি,
নাম **তিন গোয়েন্দা**।
আমি বাঙ্গালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।
তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি-
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০